গোপাল হালদার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৪৯
তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫২
চতুর্থ সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৬
পঞ্চম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১
ষষ্ঠ সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/১ বলাই সিংহ লেন
৷—৯

প্রচ্ছদপট শিল্পী
সুমুখনাথ মিত্র

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

প্রাণের উন্মাদনা যাহাদের
কর্মের উন্মত্ততায় নিঃশেষ হইয়াছে—
পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা যাহাদের
জীবনকে নিষ্প্রভ করে নাই—

এই স্তবকের অন্য দুইখানি বই—

অন্যদিন (৩য় সংস্করণ)

আর একদিন (৩য় সংস্করণ)

লেখকের একখানি লঘু রচনার বই

আড্ডা (২য় সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বইখানি সম্বন্ধে গুটি তিনেক কথা বলিবার রহিয়াছে।

গ্রন্থখানি লেখা হইয়াছিল রোগশয্যায় প্রেসিডেন্সি জেলে, ১৯৩৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

সমগ্র গ্রন্থখানি তিন স্তবকে সমাপ্য—কিন্তু প্রত্যেকটি স্তবকই স্বসম্পূর্ণ।

গ্রন্থখানির ঘটনাবলী সত্য—উপন্যাসের ঘটনামাত্রই যে অর্থে সত্য।

১৭ আশ্বিন, ১৩৪৬ লেখক

পঞ্চম সংস্করণের তথা বর্তমান সংস্করণের নিবেদন

'একদার' ইহা পঞ্চম সংস্করণ। ইতিমধ্যে 'একদার' পরিকল্পিত অন্যান্য পর্ব্ব,—'অন্য দিন,' ও 'আর একদিন'ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে এ গ্রন্থের পরিবর্তন কিছুই করা হয় নাই। তবে পুনরায় পড়িতে গিয়া শব্দগত সংশোধন কিছু কিছু করিয়াছি। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যেই পাঠক-সাধারণ এ গ্রন্থকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ।

তিন পর্বের শেষে এখন আর বলা বোধ হয় অনাবশ্যক 'একদা' গ্রন্থের লেখক জয়েস-প্রুস্ত-ভার্জিনিয়া উলফ-ধর্মী কেহ নহেন। প্রায় বিশ বৎসরের দুর্বার গতিময় ইতিহাস একটি প্রাণবান্ মানুষের কর্ম ও চেতনার মধ্যে দিয়া তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বে উদ্‌ঘাটিত করাই ছিল তাহার প্রয়াস। বৎসর আট দশ পরে-পরে সেই ব্যক্তি-জীবনের এক-একটি দিনই আমি গ্রহণ করিয়াছি; এক-এক পর্বের সেই এক-একটি দিনের দিনলিপি ইতিহাসের এই পর্ব থেকে পর্বান্তরের এবং পৃথিবীর রূপান্তরেরও আভাস। এই আঙ্গিকে ত্রুটি অনিবার্য; ইহা যেন অনেকখানি ছেদের পরে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে দুই জোড়া চক্ষু দিয়া এই পৃথিবীকে এক-একবার দেখা। পরিবর্তমান পৃথিবী বিকাশমান মানুষের রূপ এই তিন পর্বের জীবন-চিত্রে তথাপি কিছুটা আভাসিত হইয়াছে জানিলে, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি—

১লা মে, ১৯৫৪ লেখক

দূর—বহুদূর-প্রসারিত—জীবনের বিচিত্র দৃশ্যপথ। আঁধারের পর্দ্দা সরাইয়া প্রতি প্রভাত তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেয় এক-একটি নূতন দিনের বাতায়ন। দিন-রজনীর পথে মানুষের প্রতিদিন চলিয়াছে সেই চির-নূতন চির-রহস্যের পরিচয়—জানায় ও অজানায়। এক-একটি দিন—তুচ্ছতায় ভরা সামান্যতম এক-একটি দিনও—এই রহস্যের ভারে সমৃদ্ধ—চিরদিনের সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল ক্ষণিক বুদ্বুদ। আবার এমনই দিনের মধ্যেই সমকালের কোলাহল-আয়োজনও রাখিয়া যাইতেছে তাহার মুখর ধ্বনি। এক-একটি দিন যেন তীব্র, রূঢ়, ছন্দোহীন খণ্ড খণ্ড ধ্বনির টুকরা। দিনে দিনে মিলাইলে তাহাই রূপ-পরিগ্রহ করিয়া ইতিহাসের মধ্যে বাণীমূর্ত্তি লাভ করে—সমগ্রতার মধ্যে তখন চোখে পড়ে অর্থহীন এক-একটি সেই ছন্দোহীন দিনের ছন্দ ও অর্থ! মানুষের জীবনের এক-একটি দিনও যেন কালের এই যাত্রাপথের উপরে এক-একটি মুক্ত বাতায়ন।

চিরকালের প্রাণলীলার, সমকালের আবর্ত্ত-প্রবাহের আলোড়িত বুদ্বুদ এক-একটি দিন। এমনই একটি দিনের কথা॥

১

আটাশে অগ্রহায়ণ; তেরোশো সাঁইত্রিশ সাল। মহাকালের পথের উপরে, সমকালের যাত্রাপথের ধারে, সবে একটি দিনের বাতায়ন খুলিয়া যাইতেছে।

বেশ শীত পড়িয়াছে—হিমালয়-অঞ্চলে কোথাও তুষারপাত হইয়া থাকিবে, কলিকাতাতেও তাহা টের পাওয়া যায়। দিনের বেলা শহরের উপরে কালো ধোঁয়ার ভার জমিয়া থাকে, সন্ধ্যা না হইতেই মাথার উপরকার ধোঁয়ার জটা শহরের বুকের উপর ছড়াইয়া পড়ে। পাতলা কুয়াশার বসন তখন মাথায় তুলিয়া দিয়া আজব শহর কলিকাতা পথ-ঘাট, পার্ক-ময়দান, গাড়ি-বাড়ি সকলের উপর সেই সাদা আঁচল বিছাইয়া দেয়। ট্রাম, বাস, পথের আলোর রূপ তাহার অন্তরালে মাতালের ঘোলাটে চোখের মত দীপ্তিহীন হইয়া উঠে। একটু রাত্রি হইতেই জনস্রোতে মন্দা পড়ে, যানবাহনের কোলাহল স্তব্ধ হইয়া আসে, রকের উপরের চিরদিনকার সভাগুলি ও চায়ের দোকানের জমাট আসর কয়টি ভাঙিয়া যায়—বোঝা যায়, শীতের তাড়ায় তাহাদের তপ্ত পলিটিক্‌সও আর তাহাদের গরম করিয়া রাখিতে পারে না। অনেক পরে-পরে, ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ি এক-একবার শীতের জড়তা ও নিঃশব্দতা ভাঙিয়া বাহির হয়—মনে হয় যে, তাহারা হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিতেছে। জনবিরল ফুটপাথে পদধ্বনি তুলিয়া সিনেমা-থিয়েটারের ফেরতা পথিক চলিতেছে—কিন্তু তাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোচনা আজ শীতের চাপে মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে না। তাহাদের পায়ের শব্দের দ্রুত তালে বোঝা যায় যে, শীতের কুয়াশা তাহাদিগকে

জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। তাহারই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারা ছুটিতেছে—সম্মুখের তরঙ্গায়িত কুয়াশা ভেদ করিয়া গৃহে না পৌছিলে আর ভরসা নাই।

মোটের উপর শীত এবার কলিকাতায় বেশ জমাইয়া বসিয়াছে। সকালবেলা লেপ আর ছাড়িতে ইচ্ছা যায় না; রাত্রিতে আহারের পরে লেপ টানিয়া লইতেও দেরি সহে না। উপভোগ করিবার মতই এ শীত—হিমেল, কনকনে বাতাস; পৃথিবী ও আকাশ-জোড়া কুয়াশা; তুপুরের রৌদ্রের গায়েও যেন একটা ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস লাগিয়াই থাকে।

কাঁধের কাছে লেপটা বোধহয় একটু সরিয়া গিয়াছিল, সেখানটায় বেশ খানিকক্ষণ .ধরিয়াই কেমন শীত-শীত ঠেকিতেছে—আধঘুমে অমিত লেপটা টানিয়া লইতে গেল। টানিয়া লইয়া বেশ আরামে একবার পাশ ফিরিয়াও শুইল। কিন্তু আধঘুমের আধখানাও এই আরামের প্রয়াসে নিঃশেষ হইয়া গেল। চোখ মেলিতেই অমিত দেখিল, সম্মুখের নিচু বাড়িখানার ওপারে তেতলা বাড়িটির উপরকার পূর্ব্ব আকাশ বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যাসমত সে বালিশের নিচে হাত বাড়াইয়া দিল—ঘড়িটি বাহির করিয়া বেলা দেখিবে। কিন্তু হাতে ঘড়ি ঠেকিল না। মনে পড়িয়া গেল, ঘড়ি এখানে নাই। চোখের কোণে যে ঘুমটুকু যাই-যাই করিয়াও যায় নাই, এবার তাহা ছুটিয়া পালাইল।

লেপটা খানিকটা সরাইয়া হাত তুইখানা বাহিরে টানিয়া লইয়া অমিত শুইয়া রহিল। ঘড়িটা কাল শেষ হইয়া গিয়াছে; তাহার মূল্য তেত্রিশ টাকা—নোটে ও টাকায় পাশের আলনায় পাঞ্জাবির পকেটে এখনও ঝুলিতেছে। সুনীলের একটা ব্যবস্থা হইবে—অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে। ঘড়িটির নূতন দাম বেশিই ছিল; বোধহয় পঞ্চাশ

কি পঞ্চান্ন, ঠিক জানা নাই। যেবার অমিত এম. এ. পরীক্ষায় বাড়ির সকলকার আশঙ্কা ব্যর্থ করিয়া সত্যি-সত্যি ভালো পাস করিল,—অবশ্য সোনার মেডেল পাইল না—সেবার তাহার সম্পর্কিতা বউদি ইন্দ্রাণী এই সোনার ঘড়িটা তাহাকে দিয়া নিজের ভালবাসা জানাইয়াছিল।

ঘড়িটার দাম সে কিছুতেই বলে নাই। অমিত জিজ্ঞাসা করিলেই চপল ইন্দ্রাণী বলিত, কেন? আপনার সোনার মেডেলটার থেকে এটাতে সোনা ওজনে কম আছে বুঝি?

অমিতের কৌতূহল নিবৃত্ত হইত না: বলিত, নিশ্চয়ই।

তা হ'লে শিগগিরই বিয়ের আসরে বাটখারা নিয়ে তৈরি থাকবেন, সোনাটা ওজন ক'রে তখন বুঝে নেবেন।

অমিত তথাপি হটিত না: মানুষটার অপেক্ষাও যে তার গায়ের গয়নার মূল্য বেশি, স্বজাতি সম্বন্ধে এমন সত্য-বিচার আপনি ছাড়া কে করতে পারত? যাক, এখন কত পড়েছে বলুন তো?—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড যখন, তখন আর কতই বা পড়বে? টাকা পনেরো, না?

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড! চমৎকার! চোরাবাজারে বুঝি ওরকম দাম পড়ে? নতুন জিনিস তো আপনি কখনও কেনেন নি! কিন্তু অমিতবাবু, তা হ'লে বড্ড ঠকেছি।

কতটা ঠকেছেন শুনি? কোন্ দোকানে গেছলেন?

ইন্দ্রাণী মাথা দোলাইয়া বলিল, তা হচ্ছে না, ওটি আর বলছি না। অচল ঘড়িটা আপনাকে দিয়ে যে কতটা আপনাকে ঠকালুম, সেটি আর আপনি জানতে পারছেন না।

বেশ, কত জিতেছেন, তাই বলুন। দামটা কত, শুনি না?

দাম নেইক, দাম নেই। আমার হাত থেকে ঘড়িটা যে পেয়েছেন, তাতেই তো ধন্য হলেন, আবার দাম?

অর্থাৎ ও অমূল্য—এই বলতে চান?

বলতে চাইব আবার কি? ও তা'ই, তা'ই।

কথাগুলি কালই অমিতের বার বার মনে পড়িয়াছে। ঘড়িটা তুচ্ছ নয়—অমূল্য।

বৎসর ছয় পূর্ব্বে ইন্দ্রাণী তাহাকে সাদরে উপহার দিয়াছিল ঘড়িটা। তারপর সে চলিয়া গেল টাটানগরে তাহার নিকটে তারপরে কত অধ্যায় তাহার জীবনেই না ঘটিল। বৎসর তিন পরে চৌধুরী অকস্মাৎ জীবিকান্বেষণে চলিয়া গেলেন সিঙ্গাপুর। লোকে বলে, সেখানে আসিল তাহার সহচরী তাহার বিলাত-প্রবাসের গৃহিণী। ইন্দ্রাণী ফিরিল কলিকাতায় শিশুপুত্র লইয়া। সংসারে অভাব তাহার নাই,—সেদিকে মিস্টার চৌধুরী কার্পণ্য করেন নাই। বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে ইন্দ্রাণী রহিল স্বগৃহে। কিন্তু সংসারের চোখে ইন্দ্রাণী সম্মানের দৃষ্টি পাইল না। অর্দ্ধেক সংসার তাহাকে কৃপা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে সহানুভূতি জানাইতে আসে;—অসহ্য তাহা ইন্দ্রাণীর। বাকী অর্দ্ধেক ইন্দ্রাণীর দর্পিত, স্বাধীন জীবন-যাত্রার পিছনে দুই-একটা নিগূঢ় কলঙ্ক কল্পনা করিয়া লইল;—মিস্টার চৌধুরীর কার্য্যের কারণসূত্র তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, এই তাহাদের সগর্ব্ব বিশ্বাস। ইন্দ্রাণীর উদ্দীপ্ত উপেক্ষায় তাহাদের আক্রোশ আরও বাড়িয়া যায়। ইন্দ্রাণী এই অ-সহজ অবস্থাটাই সহজ বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়—পৃথিবীকে সে জয় করিবেই, এই তাহার সঙ্কল্প। বরাবরই অমিতকে সে খুঁজিয়া লইত জোর করিয়া। টাটানগরে থাকিতেও অমিতের খোঁজ পড়িত, কলিকাতায় আসিয়াও অমিতকে সে নানা কাজে চাহিত। কিন্তু অমিতের দেখা পাওয়া ভার,—তাহার ছিল ইতিহাসের গবেষণা, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আড্ডা, তাহা ছাড়া পলিটিক্সের নানা নেশা। এদিকে মেয়ে-ইস্কুলের আয়োজনে, সঙ্গীত-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায়, মহিলা-সমিতির পরিচালনায়, সব খানে ইন্দ্রাণীও আপনার অর্থ

ও শক্তি লইয়া উপস্থিত যয়। তাহার প্রাণবেগ কোথাও স্থির হইতে চায় না। সব সে ধরিল, সব সে ছাড়িল;—ঝড়ের মত আবেগ লইয়া ইন্দ্রাণী এখন আসিয়া পড়িয়াছে এই যুগের বিপুল আলোড়নের মধ্যে। সেই উন্মাদনার পথে অমিতকে সে এক রকম জোর করিয়াই ধরিতেছে আপনার পথ-সহায়ক রূপে।

ইন্দ্রাণী রাষ্ট্রীয় আবর্ত্তনের পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছে। আজ আছে তাহার বে-আইনী শোভাযাত্রা। কাল অফিসে আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, তোমাকে দেখতে যেতে হবে, অমিত! যেতেই হবে।

অমিতের মনে হইল—যাইতেই হইবে, না হইলে ইন্দ্রাণীর ভয়ানক অভিমান হইবে। কিন্তু ঘড়িটার কথা ইন্দ্রাণী যদি জানে কি কাণ্ডই না বাধাইবে—"তুমি আমাকে কেন গোপন করলে?" ইন্দ্রাণী ভাবিবে, অমিত তাহার শক্তিকে অবিশ্বাস করে। তাহা ইন্দ্রাণীর অপমান। অমিত জানে, ইন্দ্রাণী ঐকান্তিক প্রয়াসে আপনার অর্থ, সামর্থ্য, দেহের স্বাস্থ্য, মনের আকাঙ্ক্ষা সব বিলাইয়া দিতে চায় দেশের জন্য—ঘড়ি আর কি?

কিন্তু ইন্দ্রাণী যদি জানে, অমিত তাহাকে এভাবে গোপন করিয়াছে, তাহাকে স্নুনীলদের সহায়তা করিতে দিল না, তাহা হইলে অভিমান ও অপমানে সে এমন কাণ্ড করিয়া বসিবে যে, ভাবিতে অমিতের ভয় হয়। তবু উপায় কি? এক দিকে একটা বিপুল প্রয়াসে ইন্দ্রাণী তো আপনার সর্ব্বস্বই প্রায় বিলাইয়া দিতেছে। তাহার উপরে আর এই দিককার বোঝা চাপানো সম্ভব কি? না, অমিত কিছুতেই ইন্দ্রাণীকে আর এই ভারে ভারাক্রান্ত করিবে না। করুক ইন্দ্রাণী রাগ।

অমিত ভাবিতে লাগিল, তেত্রিশ টাকায় আপাতত স্নুনীলের কিছুদিন চলিবে। টাকাটার যা দরকার পড়িয়াছিল! ভাগ্যিস ঘড়িটা ছিল!

যেমন করিয়াই হোক, আজ সকালে সুনীল টাকা পাইবে, এইরূপ কথা অমিত তাহাকে দিয়াছে। অমিত ছাড়া তো আজ আর তাহার কেহ নাই। অথচ তাহার কেই বা না আছে? বাবা মা, দাদারা ভাতৃবধূরা—তাহাদের সকলকার হাতেই অমন সোনার ঘড়ি ঢের আছে। কিন্তু উপায় নাই, সেখানে তাহার ফিরিবার উপায় নাই, সেখানে তাহার কথা তুলিবারও পথ বন্ধ। না হইলে—

কিন্তু এবার উঠিতে হয়, টাকাটা সকালেই পৌছাইয়া দেওয়া ভালো। অন্তত চা ও টোস্টও তো সুনীল আজ চার দিন পরে খাইতে পাইবে।

অমিত উঠিতে যাইতেছিল, মনে পড়িল, এত সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইরার পথে বাধা আছে। বাধা তাহার মা, বাধা তাহার পিসীমা, বাধা তাহাদের পুরাতন ঝি। ইহা ছাড়াও বাধা আছে—পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নী। তাহাদের বাধাটা নির্ব্বাক, কিন্তু তেমনিই সবল। তথাপি উহারা মুখ ফুটিয়া কথা বলে না বলিয়া এমন ভাব দেখানো চলে যে, যেন উহাদের মতামত ও সেই সব বাধার অস্তিত্বই অমিতের জানা নাই। কিন্তু মা ও পিসীমা বড়ই গোল বাধান। উঁহাদের উদ্বেগ-চিহ্ন এতই স্পষ্ট যে, তাহা 'দেখি নাই' বলা অসম্ভব। তাহার উপর যখন আবার তাহা সজল ও সবাক হইয়া দেখা দেয়, তখন অসম্ভবরূপে বিব্রত বোধ করিতে হয়—যে ফাঁকিটুকু কোনরূপে পিতা ও ভ্রাতাভগ্নীদের সম্পর্কে বজায় রাখিবার চেষ্টা সম্ভব, তাহাও তখন যেন আয় অক্ষুন্ন থাকে না। বড়ই বিপদ।

অমিত ফিরিয়াছেও কাল বেশ রাত্রিতে—প্রায় বারোটায়। তখনও মা জাগিয়া ছিলেন ; পিসীমা ও পুরাতন ঝিও উঠিয়া আসিয়াছে। খুব সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি সে খাওয়া চুকাইয়া শুইয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু যে কারণে চুপেচুপে এই আয়োজন করিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইল—পাশের ঘর হইতে পিতা খাবার জল চাহিয়া জানাইয়া

দিলেন, তিনি জাগিয়াছেন অথবা ঘুমাইতে পারেন নাই। শীতের রাত্রি যে কতটা হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অবিদিত নাই। অবশ্য ইহা নূতন নয়—অনেকদিন এইরূপ হইয়াছে। তবে আজ কয়মাস যাবৎ এইরূপ দেরি অমিতের প্রায় নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই যত গোল। বোধহয় আর কিছুদিন পরে ইহাও বাড়িতে সকলের গা-সহা হইয়া যাইবে। তবে এখনও মাঝে মাঝে ইহা লইয়া মা ও পিসীমা স্পষ্টত বাধা সৃষ্টি করিতে চাহেন। অনেক সময় অমিতকে নিজে অভিমান করিয়া মা ও পিসীমাদের সেই নির্ব্বাক অশ্রু-সজল বাধা ভাঙিতে হয়। এবারকার বাধাটা এখনও স্পষ্ট হয় নাই, হয়তো শীঘ্রই হইবে। এইবেলা উহা এড়াইবার চেষ্টা করা চলে।

অমিত এইবার লেপটা টানিয়া লইল—চা খাইয়াই বরং বাহির হইবে। অত তাড়াতাড়ি সুনীলের কাছে না পৌছাইলেও চলিবে। তাহা ছাড়া এই শীত,—লেপ যে ছাড়িতে ইচ্ছা যায় না। করুকই না সে একটু আরাম—সারাদিন তো এক নিমিষের জন্যও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পায় না।

অমিতের মনে পড়িল, সুনীলের লেপ নাই। একটা 'রাগে'র উপর নিজের দামী কাশ্মীরী শালখানা বিছাইয়া সে তাহা গায়ে দিত। 'রাগ'টাও জুটিয়াছে অল্পদিন, তাহাও ঘটনাক্রমে। কেমন করিয়া ইন্দ্রাণী শুনিল—'সে ছেলেটির' রাত্রিতে গায়ে দিবার মত কিছু নাই। তৎক্ষণাৎ সে অস্থির হইয়া উঠিল—তাকে আমার বাড়ি নিয়ে এসো অমিত। অনেক বলাতে বদিবা এ জিদ ছাড়িল, ছুটিতে চাহিল সুনীলের সঙ্গে দেখা করিতে রাত-দুপুরে সে পাড়ায়। শেষে গোপনে অমিতকে দিল এই 'রাগ' আর পঁচিশটা টাকা।

'রাগ'টা ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সুনীলের হাতে পৌছিল। সুনীল

খুশি হইল না—এই সময়ে এই খরচটা না করিলেও চলিত, ত্রিশ টাকা নিতান্ত কমই বা কি? অমি'দা'র বড় বাজে চিন্তা—সুনীলের শালখানাই যথেষ্ট। কাশ্মীরের শাল, ভাল শাল; মাত্র গত বৎসর তাহার বড় বউদি' তাহাকে শখ করিয়া কিনিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার শীতে ইহাই যথেষ্ট। বিশেষত এখানকার এই দর্জীর দোকানের কাপড়ের গাদা পাতিয়া রাত্রিতে শুইতে পারা যায়, মোটেই শীত সহিতে হয় না।

অমিত স্বীকার করিল ভুল হইয়াছে। তবে দাম তো দিতে হয় নাই। আর যদি ইতিমধ্যে সুনীল তেমন নিঃসহায় হইয়া পড়ে, তবে 'র‍্যাগ'টা বিক্রয় করিয়া দিলেও দুই-চার টাকা পাওয়া যাইবে তো—ক্ষতি কি?

অমিত জানিত, দর্জীর দোকানে আর বেশীদিন সুনীলের থাকা চলিবে না। দর্জী লোকটার সন্দেহ পূর্ব্বেই হইয়াছিল; নিতান্ত বাধ্য লোক বলিয়াই অন্যায় কিছু করে নাই। কিন্তু এবার সে পীড়াপীড়ি করিতেছিল, সুনীল দর্জীর কাজ যখন শিখিতেছে না, তখন অন্য কাজ দেখুক। তাহা ছাড়া দোকানে রাত্রিতে অন্য লোক রাখিতেও তাহার অমত। অতএব রাত্রিতে কাপড়ের গাদা পাতিয়া আরামে শয়ন সুনীলের পক্ষে আর বেশিদিন সম্ভব হইত না। কার্ত্তিক মাসও শেষ হইতে চলিয়াছে। ইহার পরে সুনীলের অবস্থাটা কি হইবে? ইন্দ্রাণী জানিলে আবার তখন এত ব্যস্ত হইবে যে, তাহাতে সে সহায় না হইয়া সুনীলের পক্ষে নিজের অজ্ঞাতেও বিপদের কারণ হইয়া পড়িত। সুনীলও তাহা বেশ জানে, তাই ইন্দ্রাণীকে যতই শ্রদ্ধা করুক, তাহার নিকট সেও যাইতে চায় না, সে দর্জীর এখানেই থাকিবে। অথচ দর্জীও আর তাহাকে স্থান দিবে না।—এই সব যুক্তি সুনীলকে শোনানো ভাল হইত না। সে বুঝিত না, মানিত না, আরও গোল বাধাইয়া বসিত।

তারপর অগ্রহায়ণ মাসেই সুনীলকে আনিতে হইয়াছে তাহার

বর্ত্তমান আশ্রয়ে। এখনও সুনীলের মতে 'রাগ'ই যথেষ্ট, শালটার দরকার নাই। অমিত লোক পাইলেই যেন বিক্রয় করিয়া দেয়। যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে! অমিতও বলিত, লোক সে খুঁজিতেছে, কিন্তু পুরাতন শাল কাহার নিকট বিক্রয় করিবে? অসুবিধা ঢের, সকলেই নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। তবে সুযোগ অমিত ছাড়িবে না। দুই-একটি পরিচিত শালকরের সঙ্গে কথাও বলিতেছে।

অমিত জানে, কোন্ শয্যায়, কোন্ গৃহে, কি কি শীতবস্ত্রের আচ্ছাদনে সুনীল দত্তের এই উনিশ বছর পর্য্যন্ত জীবন বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেই তুলনায় আজিকার 'রাগ'টা মোটেই বাহুল্য নয়, শালটাও নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং ইহার সঙ্গে থাকা উচিত তার বিলাতী ফ্লানেলের পাঞ্জাবি, ডোরাকাটা পুলওভার, আর—

কিন্তু থাক, সুনীলকে ইহা বলা চলে না। বলিলে এখনই 'রাগ' ও শাল যার-তার কাছে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া খাঁটি হইয়া বসিবে; জানাইয়া দিবে, সে আর অনিল দত্তের ভাই নয়, বোসপুকুরের দত্তদের কেহ নয়।

অমিত ভুলিতে পারে না যে, সুনীল সাত মাস পূর্ব্বেও দত্তদের ছেলে ছিল, অনিল দত্তের ভাই ছিল, শহরের ছেলেদের মধ্যে তাহার না ছিল অর্থের অভাব, না ছিল প্রতিষ্ঠার অভাব। আজ সুনীল বলিলেই কি সে পরিচয় মিথ্যা হইয়া যাইবে? না, তাহার মা আর তাহার মা থাকিবেন না? সরকারী চাকুরে মিস্টার অনিল দত্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব এক্‌সাইজ, সুনীলের পর হইয়া উঠিবে? সুনীলের সঙ্গে তর্ক না করিলেও অমিতের এই সব কথা মনে গাঁথা রহিয়াছে। তাই শীতের ভোরে লেপ টানিয়া আরাম করিতে গিয়াই তাহার মনে পড়িল, সুনীলের লেপ নাই, আছে একটা 'রাগ' ও পুরাতন শাল। এই শীতে তাহা যথেষ্ট নয়—মোটেই যথেষ্ট নয়। সুনীল শুনিবে না। ইহার অপেক্ষাও অনেক কম

সুবিধায় তাহারই অনেক বন্ধু রহিয়াছে। সে বলিবে, এতক্ষণে তাহাদের মোটা কম্বল গায়ে পরিয়া তাহারা সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরে কনকনে হাওয়ায় প্রথম গিয়াছে ল্যাট্রিন প্যারেড্—কুৎসিত, বীভৎস এ রকম গ্লানি মানব-জীবনের।...তারপর এখন লপ্‌সির অপেক্ষায় থালা-বাটি হাতে দাঁড়াইয়া আছে—লোহার থালা, লোহার বাটি—কালো মিশমিশে লোহা—কতদিনকার কে জানে! কতজনের ব্যবহৃত! বিজয় চৌধুরীর মতো বিলাসী, সৌন্দর্য্যপিপাসু, সুন্দর যুবকও সেখানে আছে।...বিজয়... তারপর আসিবে লপ্‌সি। সার বাঁধিয়া আবার দাঁড়ানো, সার বাঁধিয়া চলা কারখানায়—গায়ে কম্বলের জামা, খালি পা। বুনিয়া চলো তাঁত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিংবা পাকাও দড়ি।...অসম্ভব, অসম্ভব এই গ্লানি। এই অবমাননা-লাভের জন্য সুনীল বাড়ি ছাড়ে নাই। অন্তত যেন তাহার ভাগ্যে ইহা না মেলে—শুধু এই কষ্টটুকু, এই একঘেয়ে, প্রাণহীন জাঁতা-কল যেন তাহাকে পেষণ করিতে না পায়।...

শুইয়া শুইয়া সুনীলের মুখের ছবি অমিতের মনে পড়িল। সত্যই এইরূপ চিন্তায় সুনীল ত্রস্ত অস্থির হইয়া উঠে।...বিজয়....বিজয়... বিজয়কে অমিতও দেখিয়াছে। ফূর্ত্তি ও আনন্দের ফোয়ারা সে ছেলে। কি করিয়া সে আজ সময় কাটাইতেছে ওরকম কম্বলের জামা পরিয়া, সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া?

অমিতেরই মনে হয়, না, লেপ একটা বিষম বাহুল্য, গঞ্জনা। তবু লেপ গায়ে রহিল। অমিত মনে মনে বলিল, লেপটাকে টানিয়া ফেলিয়া দিলেই কি চরম আত্মত্যাগ হইবে? কি সব ছেলেমানুষি ভাবনা! ইহা মেয়েদের শোভা পায়। ইন্দ্রাণীর নাকি এমনই অসহ্য হইয়াছিল দিনরাত্রি। কিন্তু এ ছেলেমানুষি। মনে কর, তুমি লেপ ফেলিয়াই দিলে। দিলে মন্দ হয় না,—খানিকক্ষণ একটা দারুণ দুঃখভোগের ও আত্মত্যাগের নামে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে। তারপর, শীত আছে;

সেই তাড়না সহ্য হইলেও এই শীত কি সুখভোগ্য হইবে? যদিই বা মনের আত্মমর্য্যাদায় আবার লেপ গায়ে তুলিতে ইচ্ছা না হয়, হয়তো মা, পিসীমা বা বুড়ী ঝি কানাইয়ের মা আসিয়া পড়িবে! আর তাঁহারা দেখিলে একটা ছোটখাট কাণ্ড বাধাইবেন। অমিত, তুমি নিজেও তখন লজ্জাবোধ করিবে। না, এই সব সেন্টিমেণ্টাল হাস্যকরতার ও চিন্তা-বিলাসের প্রয়োজন নাই। যথেষ্ট কাজ আছে, অনন্ত কর্ত্তব্য সম্মুখে পড়িয়া। তাহার ক্ষুদ্র এক কণা শেষ করিয়া তুলিতে পারিলেও, অমিত, মনে কম আত্মপ্রসাদ পাইবে না। কিন্তু সত্যই পাইবে কি?…'কাজ' 'কর্ত্তব্য'…। কিন্তু এই শীতের সকালে,—শীত কি, তাহা বুঝিবারও যাহারা সুযোগ পাইতেছে না, শীতের তীব্রতা যাহাদের ভুগিতে হইতেছে অথচ সেই তীব্রতাকে স্থিররূপে বুঝিবার মতো অবকাশটুকু যাহাদের নাই,—সমস্ত বিলাস ছাড়িয়া ফেলিয়া অমিতের যে তাহাদের মতো একবার পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে ওই মেঝের উপর—শীতল সিমেণ্ট-করা মেঝের উপর, বরফের মতো ঠাণ্ডা মেঝের উপর, অমিত সারারাত নিদ্রাহীন চোখে এইরূপে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন খুশি হয়। অথচ তাহাতে লাভ নাই—অত্যন্ত অর্থহীন, নির্ব্বোধ, ভাববিলাস—বিড়ম্বনাকর, হাস্যকর।…লাভ কিছুই নাই। কিন্তু, অমিত, তবু বোধ হয় তুমি তাহাতে খুশি হইতে।—অমিতের সঙ্গেই আর-এক অমিত কথা বলিয়া চলে।…

সকালে রৌদ্রালোক চোখে আসিয়া পড়িল। অমিত শুনিতে পাইল, পাশের ঘরে চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ উঠিতেছে। পিতার চটির শব্দও কানে গেল। সাবধানে, দৃঢ়ভাবে তিনি পা ফেলেন—চাঞ্চল্য নাই, অযত্ন বা বিশৃঙ্খলা নাই, সাবধান সতর্ক অথচ স্থির পদস্থাপনা। তাই চটি চটপট শব্দ করে না, মেঝে ঘষিয়া ঘষিয়া ঝড়াৎ ঝড়াৎ শব্দও

সৃষ্টি করে না; বেশ স্থির অনুচ্চ ঠুকঠুক শব্দ। কি আশ্চর্য্য! শুধু পদশব্দের মধ্য দিয়াও একটা গোটা মানুষ প্রকাশিত হয়।···ভাইবোনেরা কথা বলিতেছে—অনু ও মনু; মাও সম্ভবত সেখানে আছেন, চা ও খাবার বাঁটিয়া দিতেছেন। খানিক পরে মা নিজেই চা লইয়া আসিবেন। পূর্ব্বে চাকরই লইয়া আসিত, অথবা কে লইয়া আসিবে তাহা ঠিক ছিল না। প্রায়ই অমিত নিজে ওই ঘরে গিয়া বসিত। ঘরে মা না থাকিলে তাঁহাকে ডাকিয়া লইত, চা ও খাবার দিতে দেরি হইলে অমিতের যেন তাহা সহ্য হয় না। কিন্তু এখন আর সে সব নাই। অমিতের আর চা লইয়া গোলমাল করিতে ইচ্ছা যায় না। কোনও রকমে হইলেই হইল, না হইলেও ক্ষতি নাই। চা এমনই বা কি একটা ভয়ানক জিনিস? তাহা ছাড়া এখন চা মা নিজেই লইয়া আসেন এই ঘরে, একেবারে বিছানার কাছে। উহা দেখিতে কিন্তু এখন বড়ই বিশ্রী ঠেকে। মায়ের মুখ থাকে ঈষৎ বিষণ্ণ ও গম্ভীর—কি যেন তাঁহার বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। না বলিলেও অমিত তাহা বুঝিতে পারে; তাই তাহার কেমন ভয়-ভয় করে, মা চা লইয়া না আসিলেই যেন সে স্বস্তি বোধ করে। আবার ভাবে—হয়তো মা শেষ পর্যন্ত আজ কিছু বলিয়া ফেলিবেন। একেবারে কিছু না বলিলেও এই স্তব্ধতা যেন ঘরের মধ্যে চাপিয়া বসিয়া থাকে। ভার নামাইবার জন্য অমিত নিজেই বলে, তুমি কেন? নিবারণ আনতে পারলে না? অথচ পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুধুমাত্র নিবারণ চা আনিলে সে মাকে ডাকাডাকি করিয়া অস্থির করিত; তখন এরূপ দরদবোধের কোনও প্রমাণই অমিত দিত না। তাই এই প্রশ্নটা আজ তাহার নিজের কানেও নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত ঠেকে, সৃষ্টিছাড়া শোনায়। কিন্তু ইহা ছাড়া সে আর কি বলিবে?

চা লইয়া অমিত তবু পিতার ঘরে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসে। অনু মনু সেখানে পূর্ব্বেই জুটিয়া থাকে! কিন্তু এখন আর তাহাদের

গল্প জমে না। পূর্ব্বেকার কত গরম, স্বচ্ছন্দ চা আর তাহারা পান করে না। বৃথাই অমিত সাধারণ কথা বলে, তুই-চারিটি খবরের কাগজের প্রশ্ন উত্থাপন করে—সেই পূর্ব্বেকার পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ তাহাদের মধ্যে আর ফিরিয়া আসে না। চা শেষ করিয়া খানিকটা অপেক্ষা করিয়া অমিত নিজের ঘরে পলাইয়া বাঁচে—পিতার ঘরে আর বসিয়া থাকিতে সাহস হয় না। কি জানি, আবার কি কথা উঠিয়া পড়িবে? ছোট বোন অনুর তো কিছুই ঠিক নাই। বিশেষত পিতার হাতে রহিয়াছে খবরের কাগজ। খবরের কাগজ তাঁহার হাতে দেখিলেই অমিতের মন পালাইবার জন্য ছটফট করে—কি জানি, কি সংবাদ আছে, পাঠ করিয়া পিতা তাহার উদ্দেশ্যে কি কথা পাড়িবেন। অমিত জানে, তিনি রাগ করিবেন না, বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না; তাঁহার কথার সুরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইবে না। চির-জীবনের অভ্যস্ত সংযম ও শান্ত চিন্তাশীলতা তাঁহার কথায়, কাজে, চলাফেরায় এখনও তেমনই সুন্দরভাবে ফুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু এই সৌম্য মুখের গাম্ভীর্য্য যে কতটা উদ্বেগে ক্লিষ্ট, শান্ত স্বরের মধ্যে যে কতটা অশান্ত দুশ্চিন্তার প্রচ্ছন্ন সুর বাজিতেছে, সহজ সাধারণ কথাটিও তিনি পড়িতেছেন অমিতের কি দুরূহ কাজকর্ম্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া, তাহা অমিত বেশ বুঝিতে পারে। না বুঝিবার ভান করিলেও কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না—অনু হয়তো বলিয়াই ফেলিবে। তাই, অমিত চা শেষ করিয়া খানিকটা দেরি করে, কিংবা এ-কথা ও-কথা বলিয়া নিজ ঘরে পালাইয়া আসে।

পেয়ালার টুংটাং শব্দ হইতেছে, চা বুঝিবা আসিয়া পড়ে। মা আজ কিছু বলিতেও পারেন। কাল অমিত অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরিয়াছে। আজ তাড়াতাড়ি চায়ের ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইবার চেষ্টা করাটাই ভালো হইবে।

অমিত বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। নিচে নামিয়া তাড়াতাড়ি দাঁতন সারিয়া মুখ ধুইয়া আসিল। তারপর বেশ সস্মিত মুখে চায়ের ঘরে ঢুকিল।

দাও দিকিন। হয় নি বাপু তোমাদের।

হচ্ছে।—মা মুখ না তুলিয়া শুধু এই একটি কথা বলিলেন। অমিতের বহু চেষ্টার সৃষ্টি সেই স্ফূর্তি সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিবিয়া গেল। তবু সে বলিল, যে শীত, দাও না শিগগির।

শীত তো বেশিই। তুমি রাত্রিতেও বাইরে যেমন ঘুরছ, আমার ভয় হয়, আবার অসুখ বাধিয়ে বসবে।

বাইরে কোথায়? সুহৃদের ঘরটা কি বাইরে? তোমাদের বাড়ির চেয়ে তাদের ঘরে হিমও ঢোকে কম. উত্তুরে হাওয়া ও ধোঁয়াও সেখানে নেই।

সুহৃদের বাড়ি তো ভালই।

অমিত বেশ বুঝিল, তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই। না করিয়া তাঁহারা যে ভুল করিতেছেন, তাহাও নয়। 'সুহৃদের বাড়ি', 'সিনেমায় ন'টার অভিনয়', 'বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধরিয়া বসিল একটা এজুকেশনাল স্কীম তৈয়ারী করিতে', 'বিকাশের ছবি লইয়া আলোচনা হইতেছিল, অনেক আর্টিস্ট ছিলেন',—এই সব কথা ইঁহাদের এতবার শোনা হইয়া গিয়াছে যে, উহাতে আর তাঁহারা আস্থা রাখিতে পারেন না। অমিত তাহা বেশ বুঝিয়াছে; তবু স্পষ্ট করিয়া যতক্ষণ কেহ বলিতেছেন না—'তোমার কথা মিথ্যা', ততক্ষণ সেইবা কেন তাঁহাদের অনাস্থা যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা ভাবে দেখাইবে? দেখাইলেই তো বিপদ। অমিত কি করিবে? সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হওয়া সম্ভব হইবে না। তাই মিথ্যা না চলিলেও অমিত শঙ্কিত হয় না; মিথ্যাকে ইঁহারা মানিয়া লইলেই হইল। এই শেষ ছলনাটুকুও এই পরিমণ্ডলে নিজেদের মধ্যে যদি রক্ষিত হয়, তাহাই ঢের। আর কথা বাড়ে না, গোলমাল

চাপ পড়িয়া থাকে, এক রকমে দিনটা চলিয়া যায়। অনুর কথা সে হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়—যেন কিছুই নয়। কিন্তু যখন মাঝে মাঝে এই ছলনা মা বা পিসীমা কেহ ভাঙিয়া ফেলেন, তখন অমিতের একমাত্র উপায় থাকে হঠাৎ একটা ক্ষুব্ধ অভিমানের অভিনয় করা—যেন সে লাঞ্ছিত হইতেছে, অত্যন্ত অন্যায়রূপে তাহাকে সন্দেহ করা হইয়াছে, অন্যায় অত্যাচারে সে পীড়িত হইল। এমনই একটা ড্রামাটিক ভাব ও ভঙ্গি করিয়া অমিত অর্দ্ধসমাপ্ত চা ফেলিয়া রাখে, জামা পরিয়া বাহির হইয়া যায়, কিংবা রাত্রি হইলে, শুইয়া পড়ে। ব্যাপারটা ছলনা—একটা গ্লানিকর ছলনা, ইহাতে সত্যই তাহার মনে কালিমা স্পর্শ লাগে। কিন্তু তাহা ছাড়া আর পথ কি আছে? এই ছলনার বলে কিছুদিনের মত বাড়ির অভিযোগগুলিকে অমিত চাপা দিয়া দিতে পারে—তাহা অবশ্য বিনষ্ট হয় না, শুধুই চাপা থাকে। কিছুদিনের মত আর ওইরূপ কথা উঠে না। কিন্তু এইরূপ 'সীন' অভিনয় করিয়া অমিতও যথেষ্ট আত্মগ্লানি বোধ করে।

অমিত যেন বুঝিল না, মায়ের কথায় কোন ইঙ্গিত আছে, সে যেন সাদা মনে সাদা কথাই শুনিল। সে বলিয়া চলিল, সুহৃদ একটা গ্যাস-স্টোভ এনেছে। এখন সুহৃদের ওখানে চমৎকার আড্ডা জমে। বাইরে হিম, ঘরের মধ্যে পেয়ালার পর পেয়ালা শেষ করলেও অসুবিধা নেই। দু-মিনিটেই চা গরম। আর শীতের রাত্রিতে চা যেমন জমে, এমন আর কিছু নয়। ক্ষিদেই পায় না—

অমিত আর থামিবার নাম করে না। কিন্তু কেহই তাহার কথার প্রতিবাদ করিল না। সবাই তাহার কথা যেন শুনিয়া মানিয়া লইল। অথচ নিচেকার ঘরের টেবিলের উপর তখনও সুহৃদের লেখার টুকরাটা পাথর-চাপা রহিয়াছে—অমিত সাত দিনের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, আজ যেন অতি অবশ্য একবার বিকালে আসে—সিনেমায়

'অল কোয়ায়েট', টিকেট কেনা হইয়া গিয়াছে।—কাল অমিত বেশি রাত্রিতে বাড়ি ফেরায় কেহই সুহৃদের কথা অমিতকে বলে নাই, অমিতও নিচেকার ঘরে আর প্রবেশ করে নাই। তাই এই খবরটা অমিত জানিত না—এখনও বুঝিল না। অবলীলাক্রমে বলিয়া চলিল, সুহৃদের বাড়ি কাল ব্রিজ কেমন জমিয়াছিল! মা চা ঢালিয়া চলিলেন, অনু ও মনু মুখ নিচু করিয়া রহিল।

অমিত চা লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল। ভাইবোনও সেখানে জুটিল। অমিত একটা বসিবার মোড়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, উত্তরের জানালাটা খোলা যে! বিশ্রী হাওয়া আসছে। বন্ধ ক'রে দিই?

না। একটু হাওয়া দিনের বেলাতে ভালই। রাত্রেই বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে ভয়, নইলে এমন কিছু নয়।—পিতা ধীরভাবে বলিলেন।

কথা বলিতে গেলেই বিপদ। অমিত চুপ করিল। পরে নিজ হইতেই বলিয়া চলিল, যা শীত! আর যেন পা বাড়াতে ইচ্ছা করে না। বিকাশ ব'সে থাকবে। যেতেই হবে। ওর সঙ্গে আজ আর্ট-এক্‌জিবিশনে যাওয়ার সময়টা ঠিক ক'রে আসতে হবে।

আজই যদি যাবে, তবে আবার এখন যাবে কেন?

একবার পাকাপাকি সময় স্থির না করলে কি বিকাশকে বিশ্বাস আছে? যে খেয়ালী লোক; হয়তো বলবে—ভুলে গেছলুম।

কিন্তু পিতা আর প্রশ্ন করিলেন না। অমিত খানিকটা স্বস্তি পাইল। তবু তাঁহার সহিত একটা কথা তো বলা হইল! এবার তাহা হইলে উঠিয়া পড়া যাক। এখন বাহির হইতে গেলেও আর কেহই বাধা দিবে না। ওদিকে সুনীল রহিয়াছে···এই শীত—একটি আধলা তাহার পকেটে নাই—চা খাওয়ার পয়সাটা পর্য্যন্ত নাই—ঘর-ভাড়াও এবার না দিলে আবার আজই কোথাও উধাও হইতে হইবে।—কোথায়?

কোথায়? কোথায়?—টাকা আপাতত আছে। পাঞ্জাবির পকেটেই রহিয়াছে ঘড়ির দামটা। আর বেলা করা নয়।

অমিত পিতার ঘর হইতে নিজের ঘরে গেল। খানিক বই লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এ-বই ও-বই নাড়াচাড়া করিল, খবরের কাগজটায় একবার তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া লইল। কাশী হইতে সুরোর দুইখানা চিঠি আসিয়া জমিয়াছে—সে আজকাল আর চিঠি লিখিয়াও কোন উত্তর পায় না। এবার অমিত উত্তর দিবে। আজই; না, আজ থাক। সুনীলের একটা ব্যবস্থা আজ শেষ করিতেই হইবে। চিঠির উত্তর কাল দিলেও চলিবে।

আলনা হইতে জামা লইয়া অমিত পরিল। বুক-পকেটটা টিপিয়া দেখিল—নোট তিনখানা ভিতরে রহিয়াছে! জামা পরিতে পরিতে অমিতের ভয় হইতেছিল—কেহ আবার জিজ্ঞাসা করে নাকি, কোথায় বাহির হইতেছে? মুখে যথাসম্ভব সেই ভাব গোপন করিয়া সে ফুর্তি ফুটাইয়া তুলিল—বিকাশের বাড়ি যাওয়া দরকার, একবার দ্বিপ্রহরের জন্য ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করিয়া আসিবে।

ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখা হইল—মায়ের সঙ্গে।

কোথায় আবার বেরুচ্ছ? এখনই—এত সকালে?

বিকাশের ওখানে একবার যেতে হবে—ওর সঙ্গে দুপুরে যেতে হবে আর্ট-এক্‌জিবিশনে। এবেলা বন্দোবস্ত না করলে তাকে পাওয়া যাবে না।

অমিত সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে বলিয়া গেল। মা মুখ না ফিরাইয়া উপর হইতে একটু জোরে ডাকিয়া বলিলেন, নিচেকার ঘরে সুহৃদ কাল একটা চিঠি তোমাকে লিখে রেখে গেছে। অনেকক্ষণ কাল রাত্তিরে ব'সে ছিল তোমার জন্যে।

সুহৃদ! অমিত থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইলে সুহৃদ কাল সন্ধ্যায়

আসিয়াছিল নাকি ? অমিত বুঝিল, এতক্ষণ সে যে গল্পটা মায়ের কাছে ফাঁদিয়াছিল, মা তাহার একবর্ণও বিশ্বাস করেন নাই। হাতেনাতে মিথ্যাটা ধরা পড়িয়া গেল। তা যাক, সে এখন নিচের ঘরে আসিয়া গিয়াছে ; এখন যে মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইতেছে না, ইহাই যথেষ্ট। একবার বাহির হইতে পাইলেই সে বাঁচে।

নিচেকার ঘরে ঢুকিয়া অমিত সুহৃদের চিঠি দেখিল—'অল কোয়ায়েট' দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ। সিনেমায় নিমন্ত্রণ! অমিতের হাসি পাইল—সুহৃদ জানে, অমিত যাইবে না, যাইবার সময় নাই ; তবু তাহাকে কেন এমন বিব্রত করা? সিনেমা মন্দ নয় ; এক সময়ে অমিতেরও অপছন্দ ছিল না। কিন্তু সব আমোদেরই সময় আছে। এখন তো আর সিনেমায় ঘুরিবার সময় নাই। এই সুখ, আমোদ, ফুর্তি—এই সব লইয়া সুহৃদের জীবন গড়াইয়া চলিয়াছে। এতদিন এই সব নিশ্চিন্ত বিলাসিতাতে অমিতেরও আনন্দ ছিল। কিন্তু বড়ই লঘু, বড়ই হাল্কা, বড়ই অসার—এই বিলাসিতা। ইহাই কি শুধু জীবন? এই কি মানুষের প্রাণলীলা? এমন আয়াসহীন, প্রয়াসহীন দিন কাটাইয়া যাওয়া? চুরুট ফুঁকিয়া দিন শেষ করা, আড্ডায় সন্ধ্যা মাতাইয়া তোলা, সিনেমা দেখিয়া বা মোটরে হাওয়া খাইয়া দিনগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া—এই কি শুধু জীবন? বড় জোর দুইখানি কবিতা পড়া, কিংবা ইতিহাসের দুইটি অধ্যায় ; কিংবা শিল্পানুশীলনে মনকে হিল্লোলিত করিয়া দেওয়া—ইহাই দুর্লভ মানবজন্মের শেষ স্বপ্ন? ভাগ্যবান সুহৃদ! তাহার জীবনে ইহার বেশি কঠোর আদর্শ আসিয়া আঘাত করে না। তাহার মনপ্রাণ আলোড়িত হয় না, মথিত হয় না ; তীক্ষ্ণ ধী ও সৌন্দর্যবোধের সহজ আনন্দে দিনগুলিকে সে ভাসাইয়া দিতে পারে। তাহাতে তিক্ততা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, কোলাহল নাই। ভাগ্যবান সুহৃদ! সুন্দর প্রভাতের সুন্দর

আলোকের মতো তাহার মন। কিন্তু সুহৃদ বড় লঘুচিত্ত, বড় অগভীর তাহার আত্মা, বড় অসার তাহার ইনটেলেকচুয়ালিস্‌ম্‌, বুদ্ধি-বিলাস। অসার নয় কি? সুধীরাও তাহার অপেক্ষা স্থিরমতি, গভীরচিত্তা। অবশ্য সুধীরার না আছে স্বামীর মতো ধীশক্তি, না আছে তেমন সৌন্দর্যবোধ। তবু তাহার জীবনে একটা গভীরতা আছে—বেশ খানিকটা গভীরতা। তাই সুধীরার স্বচ্ছ মন মাঝে মাঝে স্তব্ধ, জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে; তাহার প্রাণ কখনও কখনও দ্বিধায় খানিকটা থমকিয়া দাঁড়ায়।

'অমিতবাবু, আমাদের কি কিছু করবার নেই? শুধুই এমনভাবে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে?'—সুধীরা একদিন অমিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যায় সুহৃদের বাড়িতে বসিয়াছিল গানের মজলিস। অমিতের আসিবার কথা, ঠিক সময়ে আসিতে পারে নাই। কিন্তু রাত্রিতে খাওয়ার কথাও ছিল বলিয়া তাহার আসিতেই হইল। তখন রাত্রি দশটা, মজলিস ভাঙিয়া গিয়াছে। শুধু বিরক্তিপূর্ণ চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল সুহৃদ—'অমিত এমন বেয়াড়া, কথা দিয়েও কথা রাখে না। এল না গান শুনতে।' সুধীরাও অমিতের আচরণে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল। অনেক দেরীতে অমিত আসিল। তখন সুহৃদ খুব রাগ করিল। অমিত তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিল, বুঝাইতে চেষ্টা করিল—সমস্ত সন্ধ্যায় তাহার এক মিনিটও সময় ছিল না, হাওড়া স্টেশন হইতে বেলেঘাটা পর্য্যন্ত তাহার ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে।

তোমার কাজ?—সুহৃদ ক্ষুব্ধ অভিমানে কহিতে লাগিল, যে কাজ তোমার নয়—তুমিও মানো, তোমার অভিপ্রেত নয়—তোমার মনপ্রাণ-আদর্শের বিরোধী, তাকেই ফের বলছ—তোমার কাজ? কোথাকার যত অর্থহীন, আয়ুহীন ক্ষিপ্ততা,—তাই হ'ল তোমার কাজ? কেন তোমার এই আত্মদ্রোহ? নিজের আদর্শের এই অপমান কেন করছ তুমি, অমিত?

সুহৃদকে অমিত থামাইতে চেষ্টা করিল, তুমি তো সব জানো, সুহৃদ।

অকাজের ডাক পড়লে আমি কোন দিন স্থির থাকতে পারি না। এখন এস, কি খেতে দেবে? কি আয়োজন করেছ তুমি, সুধীরা? ঘুরে ঘুরে বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। তোমার সেই ফাউল-কাটলেট চাই কিন্তু।

সুধীরাকে শান্ত করা গেল। কিন্তু সুহৃদ খুব সহজে শান্ত হইল না। যাহা বলিয়া ফেলিল, তাহা অনেকটাই কাল্পনিক, কিন্তু একেবারেই ভুল বলে নাই। সুধীরার পক্ষে তাহা হইতেও অমিতের কাজগুলির সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করা অসম্ভব ছিল না। সে একটু গম্ভীর হইয়া উঠিয়া পড়িল—দুই বন্ধুর খাবার আয়োজন করিতে গেল। নিজের হাতে সে রাঁধিয়াছে।

তারপর আহার চলিল—একটু স্নিগ্ধ অথচ গভীর আনন্দের মধ্যে। বিদায়ের পূর্বে সুহৃদ গেল গাড়ি বাহির করিতে—ড্রাইভার তখন বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

সেই সময়ে দুই একটি কথার পর সুধীরা হঠাৎ বলিল, আমাদের কি কিছু করবার নেই? শুধুই ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে?

অমিত একটু চমৎকৃত হইল। তাহার পরেই সহাস্যে কহিল, একেও বলো বন্ধ থাকা? একদিন তো মোটে হাওয়া খেতে বেরুতে পাও নি, তাতেই এমন ফেমিনিজ্‌মের উত্তাপ।

কিন্তু কথাটা সুধীরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে না, অথচ অমিত হাসিয়াই উড়াইতে দৃঢ়সংকল্প। আর তাহা ছাড়া সময়ও তখন কোথায়? সুধীরার কথা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সুধীরা কি আহত হইয়াছে—অমিতের আচরণে?

অমিত অবশ্য ইন্দ্রাণীকে এই কথা বলিতে পারিত। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সুধীরার পরিচয় আছে। কিন্তু কি জানি কেন, ইন্দ্রাণী মনে করে, সুধীরা সত্তা-বিবর্জিতা; অবার সুধীরা মনে করে, ইন্দ্রাণী আত্মপরায়ণা। অমিত জানে, দুইটিই ভুল ধারণা। কিন্তু উভয়ের এই ভুল সে দূর

করিতে পারে না, পারিবে না। সুরোও পারে নাই। অমিতের খুড়তুতো বোন সুরো তুইজনেরই বন্ধু—আজ সে বেনারসে ;—তুইজনেই তাহাকে ভালবাসে। সুরো বলে, 'ইন্দ্রাণীদির প্রাণের তুলনা নেই।' আবার,—'কিন্তু সুধীরার প্রাণ যে কত গভীর, সুন্দর, তা কেউ বাইরে থেকে জানতেও পারে না।'

সেদিন অমিতও তাহাই জানিয়া ফেলিয়াছে। বুঝিল, সুধীরার মনের গভীর তলদেশে জিজ্ঞাসা জমে, সুধীরা নিতান্ত লঘুচিত্তা নয়, রঙিন শাড়ী ও ব্লাউজের একটি আধার নয়। কিন্তু এই আবেগ যে খুব প্রকাণ্ড বড় কিছু নয়, তাহাও অমিত বুঝিতে পারে ; সাধারণ মানুষের আন্তরিক বেদনা ও অনুভূতি যতটুকু ততটুকুই—তাহার বেশি নয়। তবে, এই সাধারণসুলভ সেন্টিমেন্টটুকুও সুহৃদের নাই। তাহার মন মোটেই ভাবাবেগে দোল খায় না—সে শোভন স্বচ্ছন্দ জীবন ভালবাসে, কালচার-এর কুড়েমি তাহার মজ্জাগত। সে দ্বিধায় জড়াইয়া পড়ে না, জীবনকে উপভোগ করে। সে হাসি চায়, গল্প চায়, গান চায় ; সিনেমা-থিয়েটার, বন্ধুবান্ধব, মার্জিত রুচি, ভাল বই, ভাল আড্ডা—এই সবই জীবনকে সৌন্দর্যে লালিত্যে শোভনতায় মণ্ডিত করে। সে বলে, ভালো ফিল্‌ম্‌ মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিতে পারে।

সুহৃদ সিনেমার টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছে। পয়সা নষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিলে কে রোধ করিতে পারে? অথচ পয়সা কি দুর্লভ! সুনীল এখন পর্যন্ত চা খাইতেও পায় নাই।

চিঠিটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অমিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দেখা হইল কানাইয়ের মায়ের সঙ্গে।

এত সকালেই আবার বেরুনো? ফেরো বলছি, যেও না। রাত জেগে বসে বসে বাপু, পিঠ ধ'রে গেল। তোমার না হয় কোন মহাকাজ হচ্ছে। আমরা যে আর পারি না, বাপু।

অনেকদিন পরিবারে আছে কানাইয়ের মা, থামিতে চাহে না।

আবার ভাত কোলে ক'রে বসে থাকতে হবে মা-ঠাকরুনকে। খেয়েই বেরিও, কাজ ব'য়ে যাবে না।

অমিতের মনে পড়িল।

হ্যাঁ, দেখ কানাইয়ের মা, আমি বিকাশের ওখানে যাচ্ছি। জানই তো, সে যেমন লক্ষ্মীছাড়া—উঠতে উঠতেই ক'রে দেবে বেলা একটা। বেশি বেলা হ'লে তার ওখানেই খেতে হবে। বারোটার মধ্যে না ফিরলে তোমরা আমার জন্য দেরি ক'রো না। আমি একেবারে সন্ধ্যায় ফিরব—মাকে ব'লো।

কানাইয়ের মায়ের উত্তর শুনিবার জন্য অমিত অপেক্ষা করিল না। বাহির হইয়া পড়িল। পথের উপর হইতে আর একবার কানাইয়ের মায়ের উদ্দেশে বলিল, বাড়িতে তুমি ব'লো। এখন সদর দরজা বন্ধ কর।

২

তাড়াতাড়ি অমিত পথ বাহিয়া চলিল। দেরি হইয়া গিয়াছে। কয়টা বাজিল? হাতঘড়ির দিকে চাহিতে মনে পড়িল—হাতে ঘড়িটা আজ নাই। দেরি হইয়াছে বোধ হয়। সুনীল তো অপেক্ষা করিয়া আছে—এখনও কিছুই খায় নাই, খাইতে পায় নাই। একটি পাইও তাহার নাই। অথচ সার্কুলার রোডের 'বাস' আসিবে যে কখন, তাহাও বলা যায় না। আসিলেও আসিবে বোঝাই—গয়লা, মজুর, নানা জাতীয় বিচিত্র স্ত্রী-পুরুষের ভিড়, আরোহীর ভিড়, শিয়ালদহ ও হাবড়ার যাত্রীদের গাঁটরি বোঁচকা, পেটরা তোরঙ্গ, টিনের সুটকেস, বিছানা, মাছ, শাকসবজি, সব কিছু মিলিয়া গাড়ির ভিতরে প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। তারপর শেষ-হীন এক-একটি স্টপ্—গাড়ি আর ছাড়িবে না। পিছন হইতে তাড়া খাইয়াও কেহ কেহ চলিবে না, সাধা গালায় চীৎকার করিবে—"মানিকতলা, শিয়ালদহ, হাবড়া"; কিংবা "মানিকতলা, শিয়ালদহ, মৌলালি, ধর্ম্মতলা।" সেই বেলেঘাটা—কখন বাস পৌছাইবে? কয়টা বাজিল? সুনীল বোধহয় আজও হতাশ হইয়া উঠিতেছে।

শীতের সকাল। সার্কুলার রোডের পূর্ব দিককার বাড়িগুলির উপর দিয়া সূর্য উঠিয়া আসিতেছে, পশ্চিম দিককার বাড়িগুলির গায়ে রোদের আভা ফুটিতেছে। শীতের সকালের রোদ—কচি, ভীরু, সশঙ্কিত; তাহার স্পর্শ যেন ক্ষীণপ্রাণ শিশুর কোমল মোলায়েম স্পর্শ। কিন্তু বাজিল কয়টা? ঘড়ি নাই, আজ বেলা ঠিক পাওয়াই শক্ত।

অমিত বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া মিনিট গুণিতে লাগিল।

দূরের একটা মোড়ের মায়া কাটাইয়া অবশেষে একখানা বাস আসিয়া পড়িল—পিছনে তাহার আর একখানা বাস তাড়া করিয়াছিল, তাই। অমিত উঠিয়া বসিল। পূবের জানালার মধ্য দিয়া সকালের রোদ তাহার গায়ে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বড় মোলায়েম শীতের এই রৌদ্রঝলক। কোলের উপর হইতে হাতখানা তুলিয়া অমিত জানালার রোদের উপর ধরিল—রোদে তাহার চামড়া একটু একটু করিয়া সাড়া দিয়া উঠিতেছে। এই মোলায়েম উষ্ণতা অনুভব করিয়া অমিত তাহার হাতের চামড়ার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। মুখে একটু হাসির আভা ফুটিল—এই রক্তমাংসময় মানুষের ক্ষুদ্র কর, তাহার মধ্য দিয়া কি একটি সুকোমল স্নিগ্ধ অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে—অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে,—দূর, বহুদূরের সূর্যদেবতার স্নেহতাপময় করস্পর্শে। সত্য, সূর্যই প্রাণের আধার, সবিতাই মানুষের দেবতা। কিন্তু একটা অগ্নিপিণ্ডমাত্র এই সবিতা। হায়, নিশ্চেতন দেবতা!

বাড়িগুলির শিশির-ভেজা গায়ে সকালবেলাকার সূর্যালোক কি চমৎকারই না দেখাইতেছে! লাল বাড়িটার লাল আভা যেন গাঢ়তর হইয়াছে, সাদা বাড়িটার রূপ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। সকালবেলাকার আলোতে না হইলে ইহাদের এই রূপটি খোলে না। অমিত দিনে কতবার এই বাড়িগুলির পাশ দিয়া যাতাযাত করে;—পরিচিত, অতি-পরিচিত, তাহার কাছে এই বাড়িগুলি। চোখ বুজিয়াও সে শিয়ালদহ হইতে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাড়ির হিসাব বলিয়া যাইতে পারিবে। কোন কোন বাড়ির অধিবাসীদের পর্যন্ত সে মুখ চেনে। ওই যে বাড়িটা—এ বাড়িতে—হ্যাঁ, ওই যে দাঁড়াইয়া আছে। এ পাড়ায় এমনতর মুখ সত্যই আশ্চর্যজনক। এ মুখ যদি পোলক স্ট্রীটে, ক্যানিং স্ট্রীটে দেখা যাইত, তাহা হইলে বিস্ময়ের কিছুই থাকিত

না। বেশ সুশ্রী ভাটিয়া মুখ, মধ্যবয়স্ক কোনও গুজরাতী বেনে। কিন্তু এ পাড়ায় তাহারা আসিবে কেন? এই পার্শ্বে বাঙালী বাড়ি, ও পার্শ্বেও তাহাই—একজন বাঙালী ডাক্তারের বাস। অমিত কতবার ভাবিয়াছে, ইহারা কে—গুজরাতী, না বাঙালীই? বাসের জানালার ফাঁকে আজ আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া অমিত দেখিয়া লইল। কিছুই বুঝা গেল না। হিন্দুস্থানী নয়, মাদ্রাজীও নয়; বাঙ্গালীই বা কিরূপে হইবে?

বাস চলিয়াছে। পরিচিত বাড়ির সার—পরিচিত, খুবই তাহার পরিচিত, কিন্তু তবু কেন নূতন ঠেকিতেছে? না, কোথায় যেন একটা মায়াময় ঔজ্জ্বল্য রহিয়াছে, না হইলে এই বাড়িগুলির আবার রূপ কি? সে তো কতদিন ইহাদের দেখিয়াছে। আর শুধু কি ইহাদের? সেই ম্যাট্রিকের পরীক্ষা-শেষে যখন সে স্কটের জগৎ হইতে ডিকেন্স-থ্যাকারের জগতে ঢুকিতেছে, মনে পড়ে, তখন ওই ওখানকার ছোট্ট বাড়িটার বাহিরের ঘরে শুইয়া শুইয়া পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মধ্যাহ্নের দীপ্ত রৌদ্রে সে ওই ছোট্ট দেবদারু গাছগুলির রোপণ দেখিয়াছে। আজ সেই দেবদারু গাছগুলিও যে বেশ সুন্দর দেখাইতেছে; অথচ শীতের প্রকোপে উহাদের পাতার সেই সতেজ প্রাণদীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে কবে। তবু এখন ইহাদের ভাল লাগিল কেন? নিশ্চয়ই এই সূর্যের আলোকে। আচ্ছা, সূর্যালোকে এমন কি যাদু আছে? এই চেনা বাড়িঘর, চেনা গাছগুলা, এমন কি চেনা মুখগুলা পর্য্যন্ত কেন এমন তাজা, নূতন দেখায়! ···বিকাশ থাকিলে বলিত, সে খবর জানিতে হইলে ইম্প্রেশনিস্টদের শিল্পসূত্র জানিয়া লও; মোনে, রেনোয়া, দেগারের ছবি সামনে লইয়া ধ্যান কর। ····সত্যই, ধ্যান করিবার মতই তাহা।

কিন্তু থাক বিকাশ, থাক আজিকার আর্ট-একজিবিশন, থাক মোনে,

রেনোয়া, পিকাসো, মাতিস, নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ। এখন বাজিল কয়টা? সার্কুলার রোডের বাস হইতে ঘড়ি দেখিবার উপায় নাই। পথের উপর দোকান অল্প; যে কয়টা আছে, তাহারাও ঘড়িগুলি একেবারে ভিতরে লুকাইয়া রাখে—যেন পথের পথিক বা বাসের যাত্রীরা দেখিলে ঘড়িটা থমকিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে।

ক'টা বেজেছে বলতে পার?—অমিত বাস-কন্‌ডাক্টর 'পাইজীকে' জিজ্ঞাসা করিল।

'পাইজী' স্বকীয় হিন্দুস্থানীতে স্বকীয় পাঞ্জাবী সুর মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপকো কোন্ টাইম্‌মে যানে পড়তা?

অমিত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। 'পাইজী' বাংলা করিয়া দিল, আট-চব্বিশকা লোকালমে যাবেন তো? সে মিলবে।

অমিত বলিল, কিন্তু এখন ক'টা? গাড়ির সম্মুখের একটা ঘড়ি দেখাইয়া পাইজী বলিল, দেখিয়ে না ঘড়ি। কেয়া, ঘড়ি চিনতা নেই?

অমিত দেখিল, আটটা। তাহা হইলে বেশি দেরি হয় নাই। কিন্তু যে গতিতে গাড়ি চলিয়াছে, পৌঁছিতে পৌঁছিতে দেরি হইবে। সুকিয়া স্ট্রীটের মোড় রহিয়াছে; তারপর মেছুয়াবাজার, তারপর শিয়ালদহ, তারপরও অন্তত দশমিনিটকাল হাঁটিতে হইবে। সুনীল না জানি কি ভাবিতেছে!

সুকিয়া স্ট্রীট।...শৈলেন না? কলিকাতা আসিল কবে? বাসেই তো উঠিতেছে। দেখা হইলে কথা বলিতে হইবে, মুশকিল! কতদিন দেখা নাই, সহজে ছাড়িবেও না। পুরানো দিনের গবেষণার কথা জিজ্ঞাসা করিবে। চুপ করিয়া থাকা যাক, চোখ না পড়িতেও পারে; তাহা হইলে অনেক গোলমাল চুকিয়া যায়। মূকবধির বিদ্যালয়ের বাড়িটার এমন কি আকর্ষণ-শক্তি আছে? অমিতের চোখ কেন পূবের

জানালা দিয়া বাহিরে নিবদ্ধ আছে? হঠাৎ কে তাহার পার্শ্বের স্থানটায় বসিল? অমিত মাথা না ফিরাইয়াও বুঝিল, কে; কিন্তু কোনরূপ ভাব প্রকাশ পাইল না—সেই মূকবধির বিদ্যালয়ের বাড়িটাই দেখিতে লগিল। কিন্তু গাড়িও চলে না। অতিষ্ঠ হইলেও ড্রাইভারকে তাড়া দিতে তাহার ভয় হইল। কণ্ঠস্বরে এক মুহূর্তেই চিনিয়া ফেলিবে, আর তারপর, শৈলেন যেরূপ--

আরে, অমিত না?

অমিত বুঝিল, তবু চমকাইয়া উঠিবার ভান করিয়া মুখ ফিরাইল। এক নিমেষ পার্শ্ববর্তীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া—

শৈলেন! তুমি এখানে এখন? ছুটি নিয়েছ নাকি?—তারপর যেরূপ প্রত্যাশিত সেরূপ গতিতেই কথার ফোয়ারা খুলিয়া গেল। বাসের লোকের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, শৈলেনের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। দুই মিনিটে সে আসর জমাইয়া বসিতে পারে, যদিও আজ সে হইয়াছে মুন্সেফ।

শৈলেন ছুটি লইয়া আসিয়াছে—বড় দিনটা সস্ত্রীক এখানে কাটাইয়া যাইবে। উঠিয়াছে? উঠিয়াছে শ্বশুর-গৃহেই। শ্বশুর-মহাশয় হাই-কোর্টের উকিল, অমিত জানে না কি? অমিত ভুলিয়া গিয়াছিল।

শৈলেনের বিবাহ স্থির করিয়াছিল ইন্দ্রাণী আর স্বরো। ইন্দ্রাণীর সম্পর্কিতা বোন, মেয়েটি সুন্দরী; উচ্চ সম্পন্ন পদস্থ তাহার পরিবার; আর 'শৈলেনবাবুর মত লোক' ইন্দ্রাণী সংসারে দেখে নাই। শৈলেনও ইন্দ্রাণীর গুণে, স্নেহে, আত্মীয়তায় একেবারে 'ইন্দ্রাণীদি'র নামে বিমুগ্ধ হইত। বলিত, 'অমিত, তোকে যে উনি কি চোখে দেখেন, তুই বুঝবি না।' ইন্দ্রাণীর কথা উঠিলে সে আর থামিবে না। এখনই হয়তো উঠিবে সে কথা। কিন্তু শৈলেন বলিল, শ্বশুরমশায় কোথায় থাকেন, মনে আছে?

অমিত ভুলিয়া গিয়াছিল; এখন মনে পড়িতেছে—সেই গড়পাড়ে থাকেন তো এখনো?

না, বাদুড়বাগানে। শৈলেন বলিয়া চলিল, তারপর—খবর কি? বেরুচ্ছিস হাইকোর্টে? না, বেরুবি না? আর যা ক্রাউডেড ভাই, না বেরিয়ে ভালই করেছিস। কাল গেছলুম ভাই, একবার ওখানে। জাস্টিসদের সঙ্গে দেখা করেছিলুম পরশু—শ্বশুরমশায়ের বন্ধু কিনা, তাই। জাস্টিস্ বোস বললেন, এস কাল, আমার কোর্টে। একটা ট্র্যান্সফার অব প্রপার্টির জটিল মামলা আছে। বেশ ইণ্টারেস্টিং। এক দিকে ডক্টর ব্যানার্জি, আর দিকে মিস্টার ঘোষ কৌঁসুলী। কাল ছিল ডক্টর ব্যানার্জির সওয়াল। বেশ সাট্‌ল, চমৎকার পয়েণ্টটা তুলেছেন—ফার্স্ট মর্গেজ হোল্ডার হ'ল একটা ব্যাঙ্ক; এদিকে পার্টনারসিপে আছে একজন উইডো—এখন বোধ হয় ডক্টর ব্যানার্জি বেস্ট ল-ইয়ার, কি বলিস? শুনলুম কাল ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা। আমার আবার এসব মকদ্দমাই বেশি করতে হয় কিনা। দু'বছরের মুন্সেফদের তা সাধারণত দেয় না,—রেণ্ট স্যুট করেই পাঁচ বছর কাটাতে হয়। আমাকে একটু স্পেশ্যাল পাওয়ার দিয়েছে। সাবজজ রেবতীবাবু আমার শ্বশুরমশায়ের বন্ধু। জর্জ টেলরও মেরিট অ্যাপ্রিশিয়েট করেন। তাতেই আমাকে এসব কঠিন মকদ্দমা করবার অধিকার তিনি দিলেন। কাল ডক্টর ব্যানার্জির এক্সপোজিশন শুনে তাই মনে মনে তারিফ করছিলাম। আজও আবার যাব। শ্বশুরমশায় বলেন, ডক্টর ব্যানার্জি ওঁদের ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে ছিলেন বেস্ট স্টুডেণ্ট। বরাবরই যেমন এক্যুমেন, তেমনই ব্রিলিয়েন্স। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম—পরে গেলাম বার লাইব্রেরিতে। বেজা, হীরেন, যুগীন ওদের সঙ্গে দেখা। বেশ মুটিয়েছে সবগুলো। ভাবলুম মক্কেলের মুখ দেখেছে। খানিকক্ষণ গল্প হ'ল—অ্যাদ্দিন পর দেখা, খুব গল্প। কি করি, কি না-করি, মফঃস্বলের লাইফ কেমন, উকিলেরা কেমন জানে-শোনে, এমনই

সব কথা। পরে বললে, ভাই, আছ ভাল। এখানকার হাল'—সত্যি, ঘরটা কালো কোটে ও গাউনে গিজগিজ করছিল। শুনলাম সব—বেজো বলে চ'লে যায়, বাড়ির গাড়ি আছে, ভাড়ার টাকা আসে। কিন্তু যুগীনের হয়েছে বিপদ। মক্কেল নেই, মুরুব্বি নেই, ঘরের টাকাও বেশি নেই। বলে, এক-আধটা স্বদেশী কেশ পেলেও বিনা পয়সায় একবার হাজিরা দেবার সুযোগ পেতাম। শ্বশুরমশায়কে বললুম ওর কথা। শনিবার আসবে ও দেখা করতে। তা শ্বশুরমশায় বলেন, 'তিন-তিনটে জুনিয়র তো এখনই পুষতে হয়। আর আজকালকার ছেলেরা কি খাটতে চায়? সবাই চায় জন্ম থেকে সিনিয়র হ'তে। দেখি কতটা পারি কি করতে।'

শৈলেন কি 'বোর'? সাত বৎসর প্রতিদিনকার আলাপে যাহাকে মনে হইয়াছিল, সুন্দর চিন্তার, প্রাণময় স্বচ্ছন্দ আড্ডার একজন জন্ম-অধিকারী, দুই বৎসর অদর্শনের পরে আজ তাহাকে এইরূপ সন্দেহ হইল কেন? জাস্টিস দে....শ্বশুরমশয়...স্পেশ্যাল পাওয়ার...শ্বশুরমশায়...বার-লাইব্রেরি....ল অব মর্গেজ...শ্বশুরমশায়...

কি কুৎসিত! ইহার কারণ কি?

এম. এ. পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। সেনেটের মোটা থামগুলির ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হইতে হইতে অমিত বুক ভরিয়া একবার গোলদীঘির হাওয়া লইল।...এতদিনকার পরিচিত হাওয়া—কত রাত-জাগার সঙ্গে জড়িত, প্রত্যেকটি দমকে একজামিনের গন্ধ মেশানো—এই শেষ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ইহার পরে এই হাওয়ার গায়ে অমিত আর এই ঘ্রাণ পাইবে না, তাহার রাত-জাগার মূলে আর এই মোটা-থামওয়ালা বাড়িটার বিভীষিকা থাকিবে না,—সেই সব শেষ হইল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত বিষাদে অমিতের মন ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মনে পড়িল, 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল্ অব দি রোমান এম্পায়ার' লেখার শেষে গিবনের মনোভাব। তখনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অমিতের হাতে—যে পরীক্ষা চুকাইয়া দিতে তাহার এত আগ্রহ, এত অধীরতা, সেই পরীক্ষা শেষ হইল। কেন মনে হইল—একটু ভাল করিয়া পড়িয়া পরীক্ষাটা দিলেই হইত; এই তো এই বাড়িটার সঙ্গে শেষ পরিচয়। ফিরিয়া একবার অমিত শূন্য দৃষ্টিতে বাড়িটার দিকে তাকাইল—বহু-পরিচিত সেই সিনেট হল—সু-উচ্চ, গম্ভীর, অচঞ্চল।

পিছন হইতে কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কে বলিল, কি ভাবছিস?

শৈলেন। তাহারও হাতে প্রশ্নপত্র। অমিত একটু বিষণ্ণ হাস্যে কহিল, ভাবছিলুম, অ্যাডিউ।

মিছে কথা, ভাবছিলি, অরিভোয়া।

অমিত হাসিল। কি ক'রে জানলি?

শৈলেন উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ পরে বলিল, তবে ঠিক কর, এই উঁচু বাড়িটার উঁচু মাথাটা যেন আমরা হেঁট না করি।

অদ্ভুত কথা শৈলেনের। এম. এ. পরীক্ষার শেষ দিনটাও অদ্ভুত যে। তাহা না হইলে এরূপ কথায় অমিত ও শৈলেন দুই জনেরই হাসি পাইত—এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন বিশ্ববিদ্যালয়-স্তোত্র! ভাবিতেও হাসিয়া ফেলিত।

অমিতকে তখন সুহৃদও খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; এবার সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নানাবিধ খাবার তৈয়ারি করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। তাহা খাইয়াই তাহারা যাইবে সিনেমায়—সীট বুক করা আছে। তারপরে রাত্রির আহার যে সুহৃদের ঘরেই হইবে, তাহা না বলিলেও চলে।

শৈলেনকেও সুহৃদ বলিল, চল।

কিন্তু শৈলেন গেল না। সে এখন যাইবে আউটরাম ঘাট হইতে জাহাজে শিবপুর, সেখান হইতে ফিরিবে তাহার মাসীমার বাড়ি টালায়। তিনি শ্যামবাজার রেল-লাইনের একজন টিকেট-চেকারের স্ত্রী; অবস্থা সামান্য। কিন্তু আজ তিনি তাহাকে বার বার আসিবার জন্য বলিয়াছেন অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। শৈলেনের পক্ষে তাহা না মানা অসম্ভব।

একা অমিতকেই যাইতে হইল। কিন্তু যাইবার সময় মনে হইল যে, সুহৃদের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা আজ শৈলেনের সঙ্গে গঙ্গায় নৌকা করিয়া বেড়ানো বোধ হয় উপভোগ্য হইত। তাহার মন আজ গভীর স্বরে বাঁধা।

শৈলেনই হইল পরীক্ষায় ফার্স্ট। তারপর শৈলেনের বিবাহ—যে বিবাহ ইন্দ্রাণী ও সুরো স্থির করিয়াছিল....শৈলেন সেই ইন্দ্রাণীর নামও করিল না আজ! অমিতের হাসি পাইল...।

তখনো শৈলেন বলিত—অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ, এই হ'ল তোর,—পাল ও সেনযুগ; আর দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ, তুর্ক বিজয় ও পাঠান রাজত্ব, এই হ'ল আমার;—বাংলা দেশের এই সময়টার সামাজিক ইতিহাস লেখা আমরা শেষ করব। যে বাংলার ওপর বাঙালীর জীবন গড়া সেই বাংলা কি, আমরা তা জানব; বুঝব, পরীক্ষা ক'রে দেখব!—তারপর কত জল্পনা-কল্পনা, কত প্ল্যান আঁকা, বিভাগ ছ'কে ফেলা, রেফারেন্সের বই সন্ধান, তাম্রশাসনের সন্ধানে যশোহরের এক গাঁয়ে গিয়া বৃথা ঘোরা, গৌড়-পাণ্ডুয়া বিক্রমপুর; সোনার গাঁ ছোটা, এক পুরানো ধনী নেপালী পরিবারের কাগজপত্র দেখিতে যাওয়া। শৈলেন তখনও অমিতকে কত শাসন করিত। অমিত চিরদিন কুড়ে, চিরদিন ভবঘুরে; গানে, গল্পে, শিল্পের নামে, সঙ্গীতের হিড়িকে সময় অপব্যয় করিয়া ঘোরে—একটুও দায়িত্ববোধ তাহার নাই।

তারপর শ্বশুরমশায়ের ও শশুরকন্যার তাড়ায় শৈলেনের জীবনে

মুন্সেফির সম্ভাবনার উদয়। ধীরে ধীরে সেই চাকুরিস্বর্যের আবির্ভাব। এক গাদা নোট ফেলিয়া শৈলেন চলিল হাকিম জগতের উদয়াচল আলো করিতে। তাহাদের গবেষণা শেষ করিবার দায়িত্ব পড়িল অমিতের স্কন্ধে। অমিত কখনও করে কলেজের চাকরি, কখনও করে সাংবাদিকতা; আর ঘুরিয়া ফিরে অকাজের ভূত ঘাড়ে লইয়া। কোথায় গেল তাহার পাল ও সেন যুগের বাংলার ইতিহাস? পুরাতন অধ্যাপকেরা জিজ্ঞাসা করেন, 'কত দূর হ'ল?' বন্ধুবান্ধব তাহার ভবঘুরে বৃত্তিতে হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'হবে না?' আত্মীয়গণ অজ্ঞতাবশে সগর্ব্বে মনে করে—কাজের মত কাজ, তাই দেরী হইতেছে। অমিত তখনো ভাবিয়াছে, সময় পেলেই হয় একবার—হয়ে যাবে।

শৈলেনকে দেখিয়া অমিতের আজ মনে পড়িল সেই পুরাতন সঙ্কল্প। তাহার নিজের নিকট সে সঙ্কল্প আজ আর তেমন বড় নাই। উহার মূল্য হ্রাস হইয়া গিয়াছে—যশঃকাঙাল পণ্ডিত-সমাজের হ্যাংলাপনা তাহাকে পীড়িত করিয়াছে। সে বোঝে, মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে, এ নিতান্তই একটা ভ্যানিটি। অসার—অসার—অসার। কিন্তু, শৈলেনকে কি তাহা বলিবে? সে তো বুঝিবে না—পৃথিবীর অকাজ-গুলিই জীবনকে এখনও সার্থক করিবার অবসর দেয়। শৈলেন জিজ্ঞাসা করিবেই, আর তখন তাহাকে অমিত কি বলিবে?

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিবে, ধরিয়া ফেলিবে যে, সে কিছু করে নাই। শুধু কি তাহাই? হয়তো তাহাকে ছাড়িবে না, নিজের সঙ্গে বাড়ি লইয়া যাইবে, আবার পুরাতন প্ল্যানের খুঁটিনাটি লইয়া প্রশ্ন করিয়া নাকাল করিবে—কিছুতেই বুঝিবে না, অমিতের সময় নাই। শৈলেনকে বাসে উঠিতে দেখিয়া তাই অমিতের ভয় হইয়াছিল—আনন্দও হইয়াছিল—কত দিন পরে দেখা। একবার ইচ্ছা হইতেছিল কথা বলে, পুরানো দিনের মত মন খুলিয়া গল্প করিতে বসে। কিন্তু এখন অমিতের সময়

নাই, পরে বরং দেখা করিবে। কবে ?....একি অদ্ভুত অদৃষ্টের পরিহাস ? অমিত, যে শৈলেন একদিন ছিল তোমার জগতের একজন নিত্যসহচর, আজ তাহাকেই তুমি ফাঁকি দিয়া পলাইয়া ফিরিতে চাও ?....বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অমিত নিজের এই কপটাচরণে একটু গ্লানি বোধও করিতেছিল। এমন সময়েই শৈলেন হঠাৎ বলিল, আরে, অমিত না ?

অমিতের মন আনন্দ ও আশঙ্কায় সমভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। পুরান দিনের বন্ধুত্বের স্মৃতি মনে জাগিল। তাহার এই কর্ম্মত্রস্ত জীবনের উপরে সেই শান্ত দিনের ছায়া একটি মুহূর্ত্তের জন্য মোহ বিস্তার করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—সেই পুরানো দিন, সে চলিয়া গিয়াছে; আজিকার কর্ম্মপারাবারে তাহাকে টানিয়া আনা চলে না, টানিয়া আনিতে সে চাহেও না—হউক তাহা যত শান্ত, যত সুন্দর···সে লঘু স্বচ্ছ অনায়াস দিনের শৌখিন কথা ও কল্পনার মধ্যে অমিত আর ফিরিতে চায় না, ফিরিবে না, ফিরিতে পারিবে না।···

শৈলেন বলিয়া চলিল, শ্বশুরমহাশয়···ল অব মর্গেজ···হাইকোর্টের বন্ধুদের দেখলে 'পিটি' হয়···

একই সঙ্গে অমিতের মনের আনন্দ ও আশঙ্কা নিবিয়া যাইতে লাগিল ! সত্যই পুরানো দিন। পুরানো শুধু তাহার কাছে নয়, শৈলেনের কাছেও সে-দিন বিগত-আয়ু—বিগত-আলো।···কেন ? কেন এমন হইল ?

মুন্সেফির নথিপত্রের চাপে ? সরকারী চাকুরির যন্ত্রচাপে ? ভাল মাহিনা, মফস্বলের প্রাণহীন জীবনযাত্রা, হাকিমির বর্ব্বরতা, পরিণাম—সরকারী চাকুরের বৈকুণ্ঠলাভ—ডাইবেটিস ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ; জীবনের ক্রেডিট—মোটা পেন্‌শন ও হাকিম-গিন্নী।···

অথবা এমনই জীবন—ইহাই নিয়ম।

শিয়ালদহ আসিয়া গিয়াছে। অমিত উঠিয়া দাঁড়াইল। শৈলেন বলিল, আরে, উঠলি যে? নাববি? কোথায় যাচ্ছিস? কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। কি করছিস, তাও তো বললি না? ইউনিভার্সিটিতে গেলি, না সেই সিটি কলেজের চাকরিটাতেই আছিস? তা কেমন লাগে পড়ানোর কাজ?

নামিতে নামিতে অমিত উত্তর দিতেছিল, কেটে যাচ্ছে।

তোর ভাল লাগবারই কথা। তা, কাল একবার আসবি আমাদের ওখানে? না, কাল নয়। সেই শনিবার—যুগীনও আসবে। সব কথা হবে। দুপুরে কিন্তু। পরে ম্যাটিনিতে একবার 'কর্ণার্জ্জুন' দেখতে যাব। ভুলিস না। ঠিকানা মনে আছে কি তোর? ১৩।১,—হাঁ। অনেক কথা আছে, ভুলিস না।

শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া বাস-কণ্ডাক্টার হাঁকিতেছে 'মৌলালি, কালীঘাট'। তাঁহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া শৈলেন বলিয়া চলিয়াছে। অমিত যাইতে যাইতে মাথা নাড়িয়া তাহাকে জানাইয়া গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলিবে না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকপদের জন্য অমিত ছিল প্রার্থী। তখনই শৈলেন চাকুরি পাইয়া যায় কুড়িগ্রামে। তাহার পরে শৈলেন আর অমিতের খোঁজই লয় নাই। লইলে আজ জিজ্ঞাসা করিত না 'পড়ানো কেমন লাগে'? সেই সিটি কলেজের চাকুরি তাহার ভাগ্যে জুটে নাই। কপালগুণে একটি সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ. পাশ ব্রাহ্ম ছোকরা প্রার্থী পাইয়া সে যাত্রার মতো কর্ত্তৃপক্ষ অমিতকে বিদায় দিয়াছে। না হইলে ইউনিভার্সিটির অধ্যাপনার

দুয়ারও তখন খুলিত। অধ্যাপক নামের গালভরা গুরু-গৌরব অমিতের আয়ত্তের মধ্যে তখনও আবার আসিয়াছিল—যদি সে যাইত কণ্টাইয়ের কলেজে বা পাঞ্জাবের একটি সনাতন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে। কিন্তু সে গেল না। প্রফেসার নামের উচ্চ মহিমা দুই-দুইবার সে নিজের দোষে হারাইল। ইহার পরে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল—অনেক কিছু আসিয়া তাহার হাতে জুটিয়াছে। কলিকাতায় 'অধ্যাপক' নামও সে পাইয়াছে। তাহার জীবনের উপর দিয়া এখন দ্রুত শ্বাস-রোধকারী গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে একটা বিষম ঘূর্ণি।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগে পড়ানোর কাজ?' কি বলিবে অমিত? সত্য কথা বলিতে হইলে অনেকক্ষণ লাগিবে; তাহার দরকারই বা কি?···আশ্চর্য্য মানুষের জীবন! শৈলেন একবার জিজ্ঞাসাও করিল না, ইন্দ্রাণী কোথায়? সুরো কোথায়? নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস কতদূর?—কি বলিত অমিত তাহাকে? বিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস কতদূর? কি বলিত তাহাকে? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসের বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনার কথা?···

নবম শতাব্দীর বাংলা অতীতের চিতাধূমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আজ ১৯৩০-এর ডিসেম্বর। সেনেট হাউসের সম্মুখে ছয় বৎসর পূর্ব্বে যে কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে শৈলেন হারাইয়া গিয়াছে—সে অমিত নাই। এমনই জীবন···ইহাই নিয়ম।

কিন্তু ইহাই কি নিয়ম? অমিতের এখনও বিশ্বাস হয় না, ইহাই নিয়ম—এমনই জীবন।

জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়াছে বলিয়াই আজ জীবন শৈলেনকে ফাঁকি দিয়াছে—যেমন ফাঁকি দেয় সংসার সকলকে। তুচ্ছ চাকুরি, ক্ষুদ্র আরাম, মিথ্যা আত্মপ্রসাদ: জীবনের ডাক আর কানেই পৌঁছায় না।

সে ডাক শুনিলে এ সব ভাসিয়া যাইত, কোন্ অতলে ডুবিয়া যাইত। নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের মত, খড়ের মত, কুটার মত, নদীস্রোতের শ্যাওলার মত, ছিদ্রহীন, অবকাশহীন, অমিতের অনলস দিনরাতগুলির মত, কোথায় ভাসিয়া, তলাইয়া, মিলাইয়া যাইত তাহাদের সুখদুঃখ, তাহাদের সাক্‌সেস, তাহাদের সংসার।

দশ মিনিট আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া অমিত থমকিয়া দাঁড়াইল, তাই তো আসিয়া গিয়াছে যে। কেহ লক্ষ্য করে নাই তো? অপরিচিত দুই-চারিটি লোক সম্মুখে পিছনে চলিয়াছে। মোড়ে পানওয়ালীর দোকানে কে দাঁড়াইল, একটা পান কিনিতে লাগিল—ময়লা রঙ, গায়ে লম্বা শার্ট।

অমিত কোন দিকেই দৃষ্টি রাখে নাই, আপনার মনেই ভাবিয়া চলিতেছিল। একটু অগ্রসর হইয়া সেও একবার পানের দোকানের নিকট পৌঁছিল—এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনিয়া ধরাইয়া লইল। সে আসিবার পূর্ব্বেই লম্বা-শার্টপরা লোকটা একবার তাহার দিকে তাকাইয়া আবার পানওয়ালীকে কি একটা ইশারা করিয়া চলিয়া গেল।

অমিত বিড়িটা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে খানিকটা ভাবিল, তারপর নিজের মনেই বলিল, না, বাজে ভাবনা।

দুই পদ অগ্রসর হইয়া অমিত পাশের গলিতে একটা বস্তিতে ঢুকিয়া পড়িল। আর একবার ফিরিয়া পিছনে দেখিল, না, কেহ কোথাও নাই।

৩

সুনীল চা খাইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, দেরি হইবে না। নিকটেই একটা দোকান আছে, দুই পয়সা কাপ চা ও শুকনো টোস্ট মিলিবে, ডিমও পাওয়া যায়। বড় জোর দশ মিনিট লাগিবে। অমিত তাহার বিছানার উপর বসিয়া শূন্যমনে পুরাতন সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে লাগিল। সংবাদগুলি তাহার পড়া—যেগুলি কাজের কথা সবই জানা আছে, উহার অতিরিক্ত সংবাদ জানিবার সময় নাই, ইচ্ছাও নাই। আগামী রবিবার ক্যালকাটা ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে কে কে খেলিবে, কোথায় একটা হ্যাট্‌ট্রিক দেখাইয়া কোন্ খেলোয়াড় নাম করিয়াছে, নর্থ ক্লাব বা সাউথ ক্লাবের চ্যাম্পিয়ানশিপে এবার কাহার জিতিবার সম্ভাবনা—এই সব সংবাদ এখন আর পড়িতে মন যায় না। সংবাদপত্রগুলির পাতা তাই অনির্দ্দেশ্যভাবে অমিত দেখিয়া যাইতে লাগিল—মন জুড়িয়া রহিয়াছে আপনার ভাবনা।

...টাকা, টাকা, টাকা। ....ত্রিশ টাকা হাতে পাইতেই সুনীল বলিয়া বসিল, যদি শতখানেক টাকা পেতে অমি'দা'! শতখানেক টাকা—কি অবুঝই সুনীল! ত্রিশ টাকার জন্য হাত-ঘড়িটা বিক্রী করিতে হইয়াছে, তাহা সে জানে না। জানিলেই বা কি? চিরদিন আদরে লালিত-পালিত, সম্পন্ন ঘরের ছেলে, খরচ করিতেই সে অভ্যস্ত। কোথা হইতে টাকা আসিবে না-আসিবে তাহা ভাবিতে শিখে নাই। কিন্তু টাকা দিয়া তাহার এখন আবার কি প্রয়োজন? সুনীল সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিল না। কথাটা এড়াইয়া গিয়াছে। একবার বলিল, ধার আছে। আবার বলিল, হাতে থাকলে নিশ্চিন্ত

হওয়া যায়—যেরূপ অনিশ্চিত অবস্থা। কোন্ দিন কখন পাততাড়ি গুটিয়ে বেরুতে হবে ঠিক নেই। কিছু টাকা থাকলে তবু একটা ভরসা থাকে। সুনীলের এই কথাও খাঁটি উত্তর নয়। অমিত মনে মনে নানারূপ আশঙ্কা করিয়া জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। অমিতের উৎকণ্ঠা ও প্রশ্ন বাড়িয়া উঠিতেছে বুঝিয়া সুনীল বলিল, দাও দিকিন এখন আনা দু-চার পয়সা, চা-টা খেয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ একটু ব'স, কাগজগুলো উল্টোও।

অমিত কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে আপনার ভাবনায় ডুবিয়া পড়িল।

সুনীল খানিক পরে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি আসবার সময় কোনও লোক দেখেছিল—লম্বা শার্টপরা, ময়লা রঙ—?

কেন?

দেখেছিলে কি না, বলো? মনে হয়, লোকটা কদিন ধ'রেই এদিকে ঘুরছে। তাই বলছিলুম, বাড়িটা বদলাতে হবে, আর দেরি নয়।

বেশ, এখন তো টাকা আছেই। তোমার হোটেলের দেনা আর ঘরভাড়া চুকিয়ে দাও। আমি কাল তোমার অন্যত্র ব্যবস্থা করছি।

কোথায়?

বরানগরে। আমার এক বন্ধু, নিকুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, একটা ছোট দেশী তেল-সাবানের কারবারের ম্যানেজার হয়েছে, থাকে সে কলকাতায়। কিন্তু বরানগরের ফ্যাক্টরিতেও থাকবার ব্যবস্থা আছে—সামনের মাসেই সেখানে যাচ্ছে। তোমাকে থাকতে দেওয়া শক্ত হবে না। নিকুঞ্জকে একবার বলতে হবে; ওর স্ত্রী নিশ্চয়ই রাজি হবেন। তা হ'লে তাঁদের সঙ্গেই থাকবে—একটি ছেলে, মেয়েও আছে নিকুঞ্জের।

সুনীল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, বরানগর বড় দূর হবে। এখানে থাকা সম্ভব নয়—শহরের ওপর?

শহরের ওপর থাকা কি দরকার ?

দরকার ?—বলিয়া সুনীল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, দরকার নয়, তবে থাকাই উচিত। তাই আপাতত থাকতে হবে।

অমিত একটু সময় নিস্তব্ধ রহিয়া হঠাৎ সংবাদপত্রের উপর দৃষ্টি ফিরাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া চলিল, তুমি কি ভাবছ সুনীল, জানি না। কিন্তু আমার কথা না শুনলে আমি কি করব!

সুনীল উত্তর দিল, তুমি কি বলেছ, যা, শুনিনি ?

তোমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্যটা কি ? কি মতলব তোমার মনে আছে, তা স্পষ্ট ক'রে বলছ না কেন ? বলছ, 'আরও টাকা চাই।' কেন, তা বলবে না। কলকাতা শহরে থাকা এখন তোমার দরকার। কেন, জানতে চাইলে বোধ হয় সোজা উত্তর এড়িয়ে যাবে। কিন্তু তা জানলে বোধ হয় আমার পক্ষে সুবিধে হয়।

সুনীল বলিল, তা জানা না-জানা তোমার পক্ষে সমান। তুমি জেনে বিড়ম্বিত হবে; আরও তোমার প্রশ্ন বাড়বে, আবার তর্ক উঠবে। তাতে আমার একবিন্দুও মত বদলাবে না। কাজেই, না জেনেই তুমি ভাল আছ। আরও ভাল থাকতে পার, যদি এবার থেকে তুমি আমার খোঁজ-খবর নেওয়া ছেড়ে দাও।

অমিত শান্তস্বরে কহিল, এতদিন পরে আবার এই উপদেশ তুমি না দিলেও পারতে।

পারতাম, যদি জানতাম তোমার সর্ব্বনাশ হচ্ছে না। কিন্তু বেশ জানি, তুমি ডুবছ। অথচ সাধ করে মনের আনন্দে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়নি—তুমি শুধু 'কম্বলির মায়া' কাটাতে পারছ না বলেই তলিয়ে যাচ্ছ। কম্বলি হ'লেও তোমাকে ছাড়তে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

অমিত জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, রাখ’ ডেঁপোমি। খুব বাহাদুর হয়েছ। এখন বল তো, কি তোমার মতলব?

সুনীল হাসিয়া কহিল, সে জেনে তোমার কি হবে?

তবে চল নিকুঞ্জের ওখানে। আমি আজ গিয়ে নিকুঞ্জের কাছে কথাটা পাড়ব। ওর স্ত্রী সুরমা শুনলে নিশ্চয়ই রাজি হবেন। তাঁর এক খুড়তুতো ভাই এরকম অবস্থায় ঘুরে ঘুরে শেষটা টাইফয়েডে পড়ে। বাড়িতে ফেরা তো দূরের কথা, বিধবা মা দেওর-ভাসুরের ভয়ে খোঁজও নিতে পারে নি। ক্যাম্বেল হাসপাতালে শেষ দফায় তার স্থান হ’ল। মা খবর পেয়ে সুরমাকে নিয়ে গোপনে দেখতে গেলেন। কিন্তু তখন তার হয়ে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু কাঁদতেও তাঁর মানা। বাড়ির কর্ত্তারা বলেন, তুমি তাকে দেখতে গেছলে জানলে আমাদের চাকরি যাবে। সাবধান! সে হতভাগার জন্যে অনেকই তো সইতে হয়েছে, এখন পরিবারশুদ্ধ ভাসিয়ে দিও না।

সুনীল শুনিতেছিল। গল্পটা শেষ হইলে বলিল, তাই বুঝি তুমি এবার এই বন্ধুটিকে সপরিবারে ভাসিয়ে শোধ তোলবার চেষ্টা করছ? কিন্তু তার দরকার হবে না, আমি ওখানে যাব না।

কেন?

বলেছি, আমায় শহরে থাকতে হবে এখন।

কি তার কারণটা বল নি।

নাই বা শুনলে।

অমিত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তা হ’লে দু-চার দিন আমাদের বাড়িতে থাক; পরে অন্যত্র ব্যবস্থা ক’রে ফেলব।

তার চেয়ে বল না কেন তোমাকে শুদ্ধ হেঁটে গিয়ে থানায় উঠি? আরও সুব্যবস্থা হবে।

এ কথার মানে ?

সেই ময়লা-রঙ শার্ট-পরা লোকটা তোমাকেও লক্ষ্য করেছে। ইন্দ্রাণীদি যেদিন হঠাৎ এলেন, সেদিন থেকেই যেন কেমন ঠেকছে। ওঁকে সবাই চেনে, হয়তো খোঁজও রাখে। আমার এ পাড়ায়ও তাঁর আসা ওরা জেনেছে নিশ্চয়ই। তারপর বুঝছ! সব জানি না, কিন্তু এ সম্বন্ধে ভুল নেই যে, তিনিও সন্দেহভাজন হয়েছেন, আর তুমিও আমার সঙ্গে ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছ। মেসোমশায় মাসীমার কথা ছেড়ে দিলাম ; মনু-অনুর কথাও না ভাবলুম ;—আমাকে দেখলে তাঁরা কি মনে করবেন, কত বিব্রত হবেন, সে সব দুর্ভাবনা না হয় আমার পক্ষ থেকে বাজে জিনিস ; কিন্তু তোমার ওখানে যাওয়া মানে এখন বিপদকে জেনেশুনে বরণ করা। তুমি হয়তো তা বুঝছ না ; কিন্তু জেনো, তুমি নিজেও ততটা নিরাপদ নও।

আমার ভাবনা তো আমার—

আমার ভাবনাও তেমনই আমার। আর তোমার ওখানে যাওয়া তাই অসম্ভব।

অমিত কহিল, ইন্দ্রাণীও তো তোমার ভার নেবার জন্যে কতবার বলেছেন—

সুনীল বলিল, সে প্রায় কংগ্রেস-আপিসে গিয়ে ওঠার সামিল হবে—অত সভা-সমিতি, হৈ-চৈ, দেশোদ্ধারের কাছে থাকলে ক'মিনিট আমার কথা কার না-জানা থাকবে ?

অমিত খানিকক্ষণ নীরব রহিয়া কহিল, সুহৃদের কাছে কিছুদিনের মত থাকতে তোমার আপত্তি আছে ?

কোথাও থাকতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি হবার কথা তাদের। সে শৌখিন লোক, গান-বাজনা নিয়ে থাকে, জেনেশুনে ঝক্কিটা ঘাড়ে নেবে কি ? আর না-জেনেশুনে রাখলে অনেক

সময় এমন ভুল ক'রে বসবে, যাতে সেও ডুববে, আমিও ডুবব। তার সঙ্গে কথা বলেছ ?

বলব না হয় আজ সন্ধ্যায়।

কিন্তু আমার যে আজই যাওয়া দরকার।

আজই ?

দেরী করা ভাল হবে না। কাল রাত্তিরেও আমি এখানে ছিলাম না। বোধ হয় তাই এতক্ষণও নিরাপদ আছি। কাল রাত্তিরে হোটেলে যখন যাচ্ছি, তখন মনে হ'ল হোটেলওয়ালা বিষ্টুচরণ যেন কেমন আড়চোখে দেখছে। অন্য দিন খেতে বসবার আগে ও খাওয়ার শেষে তার তাগিদ শুনতে হয়—'পনরো দিন আগাম দূরের কথা, মাস চলছে শেষ হতে, তেরো টাকার একটি পয়সাও দিলে না, জগৎ ? চলবে কি করে ? এনেছ কিছু আজ ? আনো নি ? অথচ গিলতে এলে বেশ ! লজ্জা করে না' ? কাল বিষ্টুর সেসব বচনামৃত নেই। বরং আমি খেয়ে উঠতে যে ভাবে টাকার কথাটা পাড়লে, শুনে ভুল হ'ল আমিই বুঝি পাওনাদার আর বিষ্টুচরণ দেনাদার। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকল। ভাবলাম, না, কোথাও একটু গোল ঘটেছে। গলিতে খানিকক্ষণ না ঢুকে গেলাম শেয়ালদার দিকে দু পাক ঘুরে বুদ্ধি ঠিক করতে। রাত সাড়ে দশটায় ফিরে দেখলাম, কাঠের গোলার বারান্দায় একটা লোক ব'সে ব'সে সিগারেট টানছে। এ গলিতে সে মূর্তি নূতন্। মনের সন্দেহ বাড়ল। ঘরটায় না ঢুকে সটান বেরিয়ে গেলাম এগিয়ে একেবারে নেবুবাগান। পথে পথে ঘুরে রাত ফুরোয় না, পথই কেবল ফুরোয়। ফিরবো কি না ভাবছি, রাত আড়াইটে হয়ে গেছে, পা-টাও চলে না, শরীর এলিয়ে আসছে। এমন সময় বউ বাজারের মোড়ে পাহারাওয়ালার কবলে পড়লাম। কিছুতেই ছেড়ে দেয় না। বাপ ডাকি, দাদা ডাকি'—, সিপাইজী অটল। অন্তত একটা সিকি দক্ষিণা চাই। তখন বুঝলাম,

সিকি জিনিসটাও কত প্রয়োজনীয়। ‘লয়টারিং’এর দায়ে মুচিপাড়ায় নিয়ে হাজির করে আর কি? জান তো, বিজয়কে কি ক’রে ধরলে? আস্তানাটায় পুলিস আগেই গা-ঢাকা দিয়ে ব’সে আছে। গলির মোড়ে বিজয় পৌঁছতেই একজন ধ’রে ফেললে। তারপর বিজয় শুরু করলে দরদস্তর—পকেটে ওর তেরো আনা মাত্র; ওরা চায় পাঁচ টাকা। কিছুতেই যখন তা পেল না, তখন নিয়ে গেল ‘সার্চিং পার্টি’র কাছে; বাস্। কাল আমারও প্রায় সে দশা। সিপাইজী দেখলেন, সঙ্গে কিছু নেই। শেষটায় নজরে পড়ল গায়ের শালটা। বললে, ‘শালা, এ শাল তোমার নয়’। প্রথমটা আপত্তি করলাম। তারপর বুদ্ধি ক’রে মেনে নিলাম—এ শাল সিপাইজীরই। তাকে তা তৎক্ষণাৎ ফেরত দিয়ে দিলাম। তখন সে বুঝলে যে আমি সজ্জন। কানে ধ’রে পিঠে লাঠির গোড়াটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে ঠেলে দিয়ে বললে, ‘যাও শালা, ই দফে বাঁচ যাও।’ আর বেশি ঘোরাফেরা না ক’রে তখন বউবাজারের একটা বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। জন চারেক পূর্ব্বেই সেখানে আপাদমস্তক ঢেকে ঘুমুচ্ছিল; আমি তাদের পাশেই একটু জায়গা ক’রে নিলাম। সকাল হ’লে এই আটটার সময় বেশ বুঝেশুঝে, চেয়েচিন্তে এ-মুখো হয়েছি। তখন তো কেউ এ গলিতে ছিল না। এখন কিন্তু দেখলাম, একটা ময়লা-রঙের লম্বা শার্ট-পরা লোক ব’সে আছে ওদিককার দোকানটার বারান্দায়। কাজেই আর দেরি করা চলবে না। এখনই বেরুতে হবে—তুমি আগে যাবে গলির এ-মোড় দিয়ে লোকটার সামনে দিয়ে। আমি যাব ও-মোড় দিয়ে ‘ব্যাগ’টা কাঁধে ফেলে।

কিন্তু জিনিসপত্র, ঘরভাড়া. হোটেলের দেনা?

ওসব এবারকার মতো থাক। নইলে নিজেকেই থেকে যেতে হবে। গরীব বেচারীরা ঠকবে যে!

তাতে কি? পাপ হবে? হ'ল না হয় পাপ। ও পাপ আমার সইবে। যে ঘর আর যে খাওয়া হোটেলের, সেজন্যে ভাড়া চাইলে আর পয়সা চাইলে ওদেরই পাপ হওয়া উচিত।

অমিত একটু নীরব রহিল, পরে কহিল, কিন্তু যাবে কোথায়?

তোমার কোনও জায়গা জানা নেই, না? আচ্ছা দিনের বেলা আর রাতটা আমি কাটাতে পারব—এক-আধদিন। তুমি বরং একটা খোঁজ দেখ ততক্ষণ।

কি ক'রে কাটাবে?

সে চ'লে যাবে।

কিন্তু জায়গা ঠিক করতে পারলে তোমাকে কোথায় খবর দোব?

তোমার আপিসে আমিই ফোন করবো পাঁচটার সময়।

অমিত ভাবিল, বিকালে কথা আছে ইন্দ্রাণীদের জলুস বাহির হইবে; তাহা অমিতের দেখিতে হইবে। তা না হয় একটু দেরি হইবে, ইন্দ্রাণীকে বুঝাইয়া বলা যাইবে।

সুনীল তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, আপিস যাবে না আজ? তবে?

দুইজনে একটু চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে সুনীল বলিল, তোমার যাওয়া ভাল হবে না, কিন্তু নেহাত দরকার মনে করলে তেরো নম্বর হাজরা লেনে যাবে। বাড়িটা ভাল নয়, নানা জাতের মেয়েমানুষের বাস। সেখানে খোঁজ করতে হবে যমুনার। তাকে বলবে, চিন্তাহরণ চাটুজ্জেকে চাই। আর সেই চিন্তাহরণ চাটুজ্জে এলে—গৌরবর্ণ, বছর আটাশ বয়স, বেশ মুগুরভাঁজা শরীর—বলবে, 'সুকুমার সেনকে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।' ঠিকানাটা, সময়টা ব'লো।

অমিত বলিল, কে তোমার চিন্তাহরণ জানি না, তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তাও জানি না। আর যেসব মেয়ের কথা বলছ, তাদের

কারও সঙ্গে আমি কথা কইতে পারব না। তার চেয়ে তুমি চল ইন্দ্রাণীর ওখানে, না হয় সুহৃদের বাড়ি—সুহৃদের নিচেকার ঘরে বসবে। আমি ওপরে সুহৃদ ও সুধীরার সঙ্গে কথা ঠিক ক'রে ফেলব। নিদেন দিনটা সেখানে অপেক্ষা করবে; আমি রাত নাগাদ সব ব্যবস্থা করব। আর এদিকে সুহৃদের মোটরে গেলে আমি মিনুকে নিয়ে আসতে পারব। তোমাকে সে একবার দেখতে চায়। অনেকবার আমাকে খবর পাঠিয়েছেও। আর সন্ধ্যের পরে সুহৃদের মোটরে তুমি যেখানে চাও তোমায় অতি সহজে পৌছে দেবে—একেবারে নিরাপদ হবে।

সুনীল একটু নীরবে ভাবিল, বলিল, সে হয় না। এখনই আমি বেরুব একটা কাজে; দুপুরেও কাজ চুকে যাবে কি না কে জানে? সন্ধ্যায় তো অবসর নেই—অন্তত দশটার পূর্ব্বে আমি ফুরসুৎ পাব না। তুমি যা করতে হয় ক'রে রাখ; আর দু-চারদিন সংবাদ না পেলে ভেবো না। অসুবিধা বুঝলে আমিই তোমার কাছে আবার লোক পাঠাব। সেই বিভূতি ব'লে যে ছোকরাকে পাঠিয়েছিলুম, তাকেই না হয় পাঠাব। ঠিকানা, সময়, তাকে তখন ব'লে দিও। দু-চারদিনে কিছু হবে না। বরং ততদিনে তুমি দেখো, কিছু টাকা জোগাড় করতে পার কি না—শ-দেড়েক টাকা।

শতখানেক হইতে অঙ্কটা অর্দ্ধ ঘণ্টায় শতদেড়েকে দাঁড়াইয়াছে—অমিত মনে মনে আবার শঙ্কিত হইল।

কিন্তু টাকা দিয়ে কি হবে, তা তো বলছ না? আর এ দু চারদিনই বা কোথায় থাকবে?

সে হবে। জানই তো, Birds of a feather flock together.

অমিত তাহা জানে। কিন্তু এই নীড়হারা সমজাতীয় পাখিদের মিলিতে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের দূরে দূরে রাখাই তাহার মনের ইচ্ছা। সে জানে, মিলিলে ইহাদের আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, উহারা উড়িয়া

শূন্যে মিলাইয়া যায়। কিন্তু তাহার মনের ইচ্ছাটা গোপন করিয়া রাখিতে হয়, না হইলে সুনীলের কোন উদ্দেশই আর পাওয়া যাইবে না, সে এক মুহূর্তে সব ছাড়িয়া, সমস্ত ফেলিয়া পলাইবে।

আচ্ছা, পাঁচটার সময় আপিসেই না হয় একবার ফোন ক'রো, আমি থাকব। আর এক কথা, মিনু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—আজই দেখা হ'লে ভাল হয়। জানই তো তাদের বাড়ির চাল। পুরানো ঘর, তাদের বাড়ির বউদের এক পা বেরুতে একশো বাধা। তোমার জামাইবাবুও তেমন শক্ত নয়। সাহেবী আপিসে বড় চাকরি করেন, অনেক টাকা জামিন আছে। তোমার দিদি তো ভয়ে কিছু বলতে পায় না। বাবা-মার নাম ক'রে আমি সেদিন তার শ্বশুরমশায়কে তিন ঘণ্টা ভজিয়ে এসেছি। বুড়ো শেষে রাজি হয়েছে—আমরা গাড়ি পাঠালে একদিন মিনু তার জায়ের মেয়ে বীণাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবে—কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরা চাই। তুমি রাজি হ'লে আজ এখনই বেরিয়ে তাদের বলতে যেতে হয়—আজ গাড়ি পাঠাচ্ছি। বীণা মেয়েটা মন্দ নয়—ছোট কাকীকে বেশ ভালবাসে, গোলমাল হবে না। মিনু যে তোমাকে দেখবার জন্যে কি করছে, তুমি তা জান না।

কিন্তু আজ হয় না, আজ কাজ আছে।

কবে? কাল? কোথায় আবার দেখা হবে? তার চেয়ে আজই চল না—দুপুরে মিনুদের বাড়ি সুহৃদের গাড়ি পাঠাব'খন।

সুনীল মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

অমিত ধীরে ধীরে বলিল, তোমার কথা আমরা বুঝি না। কিন্তু মায়ের পেটের বোন মিনু, সে তোমাকে দেখতে চায়—একটিবার চোখে মাত্র দেখবে, সে তোমাকে ধ'রেও রাখবে না, ধরিয়েও দেবে না—তাতে যে তোমাদের কি আপত্তি, কি প্রিন্সিপ্‌লের বাধা ঘটতে পারে, সে আমার বোঝা অসম্ভব।

স্থনীল হাসিয়া ফেলিল। প্রিন্সিপ্‌লও নেই, আপত্তিও নেই—সময়ের আর স্থযোগের অভাব। নইলে মায়ের পেটের বোন কেন, ছুনিয়ার সকল আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গেই ব'সে আড্ডা জমাতে পারি। মণির কথা তো তোমাকে বলেছিই—তোমাদের কল্পনায় অমন মমতাহীন কঠিন লোক কম মেলে। কিন্তু কে জানে তার এই কাঠিন্যের পিছনকার সত্য? তার আপন জনদেরও তা জানবার অবকাশ ঘটল না।

স্থনীল গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। একটু পরে আবার বলিল, আপন জন, আপন জন, আপন জন! দেখেছি সবাইকে। তুমি ভাল ছেলে হও, পাস দাও, চাকরি ক'রে টাকা জমাও, দশ গণ্ডা ছেলেপিলে জন্ম দিয়ে ক্লাব, থিয়েটার, বায়স্কোপে ভেসে বেড়াও—আপনজন তোমার পরম আপন থাকবে। তুমি পরম আদরে থাকবে। ছোড়দা তোমারই বন্ধু না, অমি 'দা'? এক সঙ্গেই না ছুজনে শিবাজী হবার কল্পনা করতে? প্রতাপসিংহের মত বনে বনে ঘুরে বেড়াবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে। ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডী থেকে 'প্রসপারাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' পর্য্যন্ত একসঙ্গেই প'ড়ে না তোমরা নিদ্রাহীন চোখে ইস্কুল-কলেজে দিন কাটিয়েছ? পাহারাওয়ালা সার্জ্জেণ্ট দেখলেই হাত গুটিয়ে দাঁড়াতে! ছোড়দা থাক, বউদিদেরও দেখলুম। নব নব শাড়ি ব্লাউজ, কলকাতার ফ্যাশানের মফস্বলী অনুকরণ, হীরের গয়না, উঁচু খুরওয়ালা জুতো—বাস্‌, ওখানেই শেষ। তুমি হীরের টুক্‌রো ছেলে ঠাকুরপো।'—যখন তাদের কাছে হাত পাতলাম, ভয়ে তাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। কেউবা হেসে খুন—উপহাসের এমন জিনিস জীবনে ওরা আর পায়নি। কেউবা ভয়ে বিবর্ণ—'কি করব ভাই, তোমার দাদা যে শুনলে কেটে ফেলবেন'। এঁরাই স্বাধীনা, পর্দ্দাহীনা, শিক্ষিতা, বাংলা দেশের মহিলা প্রগতির প্রবক্ত্রী।

অমিত মুখ তুলিল না, একবার কহিল, তবু তাঁদের স্নেহের অপমান ক'রো না।

না না। তবে নিখরচার ওই স্নেহ থেকে দু ঘা ঝাঁটা মেরে কিছু টাকা দিলেও বুঝতাম ওদের মন আছে, জোর আছে, ভেতরে মানুষ আছে।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। সুনীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল, এখন বেরুই, আর দেরি করা নয়। তুমি আগে যাও।

অমিত জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে মিনুর সঙ্গে দেখা হবে না?

সুনীল শান্তস্বরে কহিল, হবে; তবে দিনটা তোমাকে পরশু ব'লে পাঠাব। দিদিকে ব্যস্ত হ'তে নিষেধ ক'রো—বুঝিয়ে ব'লো, বেশ আছি।

পাঁচটার সময় ফোন ক'রো—আপিসে। আমি ততক্ষণে একটা ব্যবস্থা করবই।

অমিত ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। সুনীলের ক্ষোভের কারণ অমিতের জানা ছিল, তাই অমিত সুনীলের উপর বিরক্ত হইতে পারিল না।

৪

অমিত পথে চলিতে লাগিল। আজ সুন্দর প্রভাত—শীতের রৌদ্রভরা পথ আজ ; কিন্তু তখন গ্রীষ্মকাল।

গ্রীষ্মের ছুটিটা তখন প্রায় দুয়ারে আসিয়া গিয়াছে। উপরে রৌদ্রময় তাম্রাভ আকাশ ; নিচেকার শুষ্ক, রুক্ষ, পিঙ্গল তরু-লতা-পাতার উপরে আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। দেশের মনের আকাশ লালে লাল। সে কী দিন !

স্কুল ভাঙিয়া যাইতেছে ; কলেজ টলিয়া পড়িতেছে—কিশোর ও যুবক প্রাণগুলি দিশেহারা, লক্ষ্যহারা ; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে আপনাদের তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা অস্থির। তাহাদের মনে সুদূর আদর্শের অস্পষ্ট আহ্বান পৌঁছিয়াছে—তাহার সকল রূপ, সকল দিক, কার্য্যকারণ বিচার করিবার মত তাহাদের না আছে চিন্তার দৃঢ়তা, না আছে চিত্তের স্থিরতা। একটা কিছু করিতে হইবে, একটা ভাবময় গৌরবময় আবেগময় অনুষ্ঠান, যাহাতে আত্মদানের মহিমা আছে, স্বার্থত্যাগের তীব্র মোহ আছে, জীবনের সচরাচরতা যাহাতে মুছিয়া যায়। অমিতের নিজের মন হইতেও সে দিনের তীব্র দ্যুতি মুছিয়া যায় নাই।

সকাল সন্ধ্যা শহরের পথে পথে ছেলেদের মেসে মেসে, মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া রৌদ্রশুষ্ক সুনীল যখন 'একটা' কিছুর' পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, এমনই সময়ে কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। যাহাদের সংস্পর্শে তাহার উত্তেজনা খোরাক পাইয়া বাঁচিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেই

সতীর্থ ও সমবয়স্ক দল একে একে বাড়ি গেল। সুনীলের মনের অগ্নিদীপ্তি চারিদিককার উত্তেজনা হইতে বিমুক্ত হইয়া তখন কয়েকদিন ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া আপনার মনেই জ্বলিতে লাগিল। তারপর সেও ফিরিল বাড়ি। প্রথম মনকে বুঝাইল, সেখানেই আসল কাজ,—দেশের নিজস্ব আঙিনা;—সেখানেই তো দেশের যজ্ঞানল প্রজ্বলিত হইবে। সুনীল বলিত, অমিদা, দিন দুই যজ্ঞানল জ্বলেছেও। বাড়ির সঙ্গেই মাইনর ইস্কুল; তাহাদেরই পরিবারের অর্থানুকূল্যে বিশেষভাবে প্রতিপালিত। সেই মাইনর ইস্কুলের মাইনরদের লইয়া তিনক্রোশ দূরের নোনা জলের খাল হইতে জল ও মাটি আনিয়া মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইল—লবণ অবশ্য পাওয়া গেল না। তবু এক সপ্তাহ উৎসাহ নিবে নাই। শেষে একদিন লবণও পাওয়া গেল—সুনীলের কথায় 'সত্যকারের দেশী নুন'। সেদিন তাই মহা উৎসব। কিন্তু থানার দারোগা বিচক্ষণ লোক। বোসপুকুরের দত্তবাবুদের ছেলেদের ক্ষ্যাপামিটা তিনি চোখে দেখিয়াও দেখিলেন না। অন্য দিকে লবণ আহরণ ও লবণ প্রস্তুতের অনুষ্ঠানটিতেও ক্রমেই উৎসাহ কমিতে লাগিল। ধীরে ধীরে দুই-এক পসলা বৃষ্টি নামিল; লবণ-যজ্ঞ অবসান হইয়া আসিল। দুই একদিন বিলাতী বয়কটে কোনরূপে সে আগুনকে রক্ষা করা গেল। তারপর তাহারও দরকার নাই—কলেজ খুলিয়াছে।

আবার কলেজ। সকলেরই মন টল-টল, কিন্তু কেহই আর উছলিয়া পড়িবে না।

সমুদ্র-মেখলা বিশাল ভূমি অগ্নি-মেখলা হইয়া উঠিয়াছে; চিতাদগ্ধ কৃষ্ণধূম তখনও দিক ছাইয়া আছে। ইহার মধ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা—তপস্যা বটে! সত্যই তপস্যা—গৌরীর তপশ্চর্য্যারই সমতুল্য।···

ভাবিতে আশ্চর্য্য মনে হয়—এ সময়ে মানুষ লজিক পড়িতে পারে কিংবা এথিক্‌স! তাহা সম্ভব হইলে লবণ-সমরই বা দোষের কি?····

পূজার ছুটি আসিল। সুনীল বাড়িতে বসিয়া দিন কাটাইতেছে। শহর হইতে বাড়ি ফিরিলেই তাহার দিনগুলি একটু শান্ত হইয়া আসে।

অমিতের চোখে সুনীলদের বাড়ির ছবিটা ফুটিয়া উঠিল....

পূজার আকাশের সোনার রোদ, ভরা খালের জলের ছল-ছল ধ্বনি, রূপার মত ঝিকমিক-করা জলধারা, বর্ষাস্নাত বন-জঙ্গল ঝোপঝাড়ের সজীব শ্রী, লোকের মুখে উৎসবের হাসি, কুশলবার্ত্তা, সস্নেহ আশীর্ব্বাদ—সুনীলের উদ্‌ভ্রান্ত মন যেন আজন্মপরিচিত জীবন-কক্ষে আবার ফিরিয়া আসিল। পল্লীতে পা দিলে অমিতেরও তাহাই হয়। অমিত ভাবে, আচ্ছা, কেন এমন হয়? এ কি পল্লীর মায়া, না আত্মীয়ের স্নেহ?

বাড়িতে লোকজন আত্মীয়-অতিথি প্রচুর। বড় ঘর, মানী পরিবার, দুই ছেলে ওকালতি করে—নিখিল জেলার শহরে, ও অখিল পাটনায়। তৃতীয় ছেলে অনিল সরকারের চাকুরে, সর্ব্বকনিষ্ঠ সুনীল। বাস্তবিক সুন্দর তাহাদের বাড়ি—মা আছেন, বউদি'দেরও স্নেহ আছে,—সুনীলের সবদিকেই সৌভাগ্য। তাহার বউদিরাও সুশিক্ষিতা, ভাল ঘরের মেয়ে—স্কুলে পড়িয়াছে, একটু-আধটু ইংরেজী জানে। ছোট বউদি ললিতা আই. এ. ক্লাশেও ভর্ত্তি হইয়াছিলেন,—মেরি করেলি, হল কেনের নভেল পাঠে তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি,—অমিতকে সে কতবার বলিয়াছে।

অনিলের স্ত্রী ললিতা....ললিতা...এই শীতের কলিকাতার পথে আলো যেন চৌদিকে হাসিয়া ঝলকিয়া পড়িতেছে। কি হাস্যমুখর আলো!

সুনীল তাহার জন্য লইয়া আসিয়াছে হল কেনের 'বান্‌বড ওয়্যার' ও শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'। কিন্তু ছোড়দা ও বউদি এবার বাড়ি আসিতে পারিলেন না, তাঁহারা হওয়া বদলাইতে দার্জিলিং গিয়াছেন। বই দুইটার খবর পাইয়া ললিতা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সুনীলকে লিখিতেছে,

পূজা শেষ হইতে না হইতেই বই চাই। আর শুধু বই নয়, বইয়ের জোগানদারকেও চাই—'এই দার্জ্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে, যেখানে কুয়াশার আব্রুতে মিশে বদ্রাওনের নবাবপুত্রী তোমাদের মতন ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' শাশুড়ী ও বড় ভাজকে ভিন্ন চিঠিতে অনুরোধ আছে—তাঁহারা যেন একবার আসেন, অন্তত সুনীলকে পাঠাইয়া দেন।

ললিতার কাণ্ডই এইরূপ। অমিতের মনে পড়ে ললিতাকে—তখনও সদ্যপরিণীতা সে, চঞ্চলা হরিণীর মত সেই তরুণী…

পূজা শেষ হইয়াছে। কিন্তু উৎসবের জের এখনও মিটে নাই, এমন সময় সুনীলের বাড়ীতে হঠাৎ উদিত হইল মণীশ।

অমিত ওই ছেলেটিকে দেখে নাই। ভাবিতে লাগিল, কেমন সে? ময়লা রঙ, দীর্ঘ মূর্ত্তি, বড় বড় চোখের একটা ফোটো—মাত্র এই কি সে?

একটা ছোট ছেলে সুনীলকে বলিল, সুনীলদা, খালের ওপারের পথে একজন লোক তোমায় ডাকছে।

পুকুরের ঘাটে বসিয়া শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ দেখা আর হইল না। সুনীল বলিয়াছে, জানিলাম, লোকটি সেখানে আসিতে চায় না, ওখানের খালের ধারের বাঁধানো পোলটায় বসিয়া আছে।

সেই পোলটা, যেখানে সাত বছর আগে অনিলের সঙ্গে বসিয়া অমিত বাঁশী বাজাইত; পিছনের একখানা ইঁট খসিয়া গিয়াছে, নিচে কার্ত্তিকের স্রোতহীন নিশ্চল কালো জল।……

স্নীল প্রশ্ন করিয়া জানিল, লোকটিকে উহারা কেহই পূর্ব্বে দেখে নাই—কেমন রুক্ষ মূর্ত্তি, ময়লা ময়লা জামা-কাপড়। বয়স? বৎসর কুড়ি-বাইশ হইবে।

....সেই ফোটোটা—আবক্ষ ফোটো....অমিতের চোখে এই গির্জ্জার ক্রুশ চূড়ায় যেন সেই দীর্ঘ আবক্ষ মূর্ত্তি রৌদ্রভরা আকাশের পটে ফুটিয়া উঠিতেছে।

ত্রয়োদশীর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় একটু নিকটে আসিতেই সুপরিচিত বন্ধুমুখ স্নীলের চিনিতে দেরি হইল না।

স্নীল বলিয়াছে, প্রথম দর্শণের আবেগে মুখ দিয়া বাহির হইল, মণি? অমিতের মনে হইয়াছে স্নীলের মুখ বলিতে বলিতে যেন জ্যোৎস্নাচ্ছটায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল। কিন্তু, পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত দীপ্তি নিবিয়া গেল—যেন ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে নাই, শরতের শ্রী ঝরিয়া গিয়াছে।

ক্ষীণ হাস্তে মণীশ বলিল, চুপ। তারপর, আসব? না, এখান থেকেই বিদায় নেব?

স্নীল একমুহূর্ত্তের জন্য উত্তর দিতে পারিল না। তারপর আত্ম-গ্লানিতে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অগ্রসর হইয়া সে মণীশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এ কথার মানে?

মানে আজ আছে—এক মাস পূর্ব্বে ছিল না। সে তুই জানিস, বুঝে ত্যাখ।

আজই বা কেন থাকবে?—বলিয়া স্নীল তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বাড়ির দিকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

থাকবে না? বেশ, তোর কাছেই বরং না থাকল, কিন্তু এ তো

তোদের বাড়ি; দাদারা আছেন, তাঁদের কাছে বেশ ভয়ানক রকমই এর মানে।

সে দেখা যাবে। তাঁদের কথা তাঁদের থাক, আমার কথা আমার।

চলিতে চলিতে মণীশ আর একবার বলিল, কিন্তু ভেবে ত্যাখ।

অমিতের চোখে ভাসিতেছে—শারদ জ্যোৎস্নায় দুই বন্ধু হাত ধরিয়া আসিতেছে।

সুনীল কানে তুলিল না। বাড়ির বাহিরের ঘরের আঙিনায় দাদারা বসিয়া আছেন। পাড়ার আরও দুই-চারিজন ভদ্রলোক আছেন। জন তিন সুনীলের সমবয়সী গ্রাম্য বিজ্ঞ ছেলে ও শহরের কলেজের ছাত্র তাঁহাদের আলাপ-আলোচনা পান করিতেছে। জ্যোৎস্নায় তাহাদের অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—কান পাতিলে তাহাদের কথা শোনা যায়। পুকুরের ঘাটে বসিতে বসিতে মণীশ শুনিল তাঁহারা আলোচনা করিতেছেন স্বদেশীর ইকনমিক দিক। সুনীলের মেজদা অখিল পাটনার উকিল। তিনি বলিতেছেন যে, যাহা অর্থনীতির মূলসূত্রের বিরোধী জোর করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কতদিন স্বদেশী চালাইবে? লোকের ভাবাবেগ থাকিবে না, ট্যাঁকে হাত পড়িলে স্বদেশী ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বড়দাদা নিখিল বলেন, উপায় নাই। এইরূপেই ক্ষতিকে স্বীকার করিতে হইবে; তবেই তো ইকনমিক পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিবে। কিন্তু অখিলের তাহা মনঃপূত নয়। পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়া, ভেড়ার পালের মত সার্জেণ্টের গুঁতোয় ছুটিয়া পালানো, কিংবা এক টুকরা কাপড় উড়াইয়া জেলে পচিয়া মরা—এ সবই শেমফুল। এত চরকা টকলি তৈরি করার অপেক্ষা গুটি-কয় এরোপ্লেন তৈরী করা ঢের ভাল; সার্জেণ্টের লাঠি খাইয়া হাসা অপেক্ষা লাঠি দিয়া সার্জেণ্টকে ঠেঙানো বেশি **spiritually effective**। তাহাতে নিজের শক্তিতেও বিশ্বাস জন্মাইত, গোরাগুলিরও মনে ভয় ঢুকিত;—ইত্যাদি।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সুনীল কহিল, তারপর মণি, ২০ এর পর কোথায় গেলি ?

মণীশ উত্তর দিল না। একটু পরে কহিল, একটা ভাল জায়গায় বসা যায় না, সুনীল ? একটু নির্জ্জন, যেখানে খানিকক্ষণ শো'য়া চলে। এখানে এই ঘাটে বোধ করি শুলে ভাল হবে না। না, কি বলিস ?

তুই শুবি ? ঘুম পাচ্ছে ?

ঘুম পাবে কোথা থেকে ? তবে শোব যদি জায়গা পাই।

আমার ঘরে চল।

কোথায় ? বাড়ির ভেতরে ?

হ্যাঁ, ওপর-তলায়।

এদের সামনে দিয়ে যেতে হবে যে !

তাতে কি ?

না।—মণীশ দৃঢ়স্বরে কহিল। খানিকক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। সুনীল কহিল, আমার ঘরে যাবি না, আমাদের বাড়িতে উঠবি না, এই কি স্থির ?

স্থির নয়, বোধ হয় তাই সুবুদ্ধির কাজ। ভেবে ছাখ্। তোকে অবিশ্বাস নয়, কিন্তু সকলকে বিশ্বাস তো করা যায় না—মানিস তো ?

সুনীল একটুক্ষণ মাথা নিচু করিয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, যদি এই বুদ্ধিই মাথায় ছিল, তবে আমার এখানে আসবার মানে কি ? এই অপমানটুকু করার উদ্দেশ্যেই কি এই দেখা ?

মণীশ বুঝিল সুনীলের অভিমানে লাগিয়াছে। ক্লান্ত ভাবে কহিল, মেয়েদের মতো মান-অভিমান করিস না, বিচার ক'রে ছাখ। মান-অভিমানের অপেক্ষা প্রাণের দায় বড়; আর আমার মাথাটারও দাম

আছে। প্রাণটাই বা অমন সহজে বিলিয়ে দেব কেন····যদি একটু সামলে ধ'রে রাখতে পারি ?—একটু হাসিতেও চেষ্টা করিল।

'মাথাটার দাম আছে'—যে মাথাটা ওই গির্জ্জার উপরে এখনও রৌদ্রে মণ্ডিত—আকাশের দান আলোক কিরীট! অমিত দেখিতেছে।

বেশ, কিন্তু তোমার তো এখানে না এলেও চলত।

হয়তো চলত। কিন্তু মনে হ'ল, এখানে কিছু সুবিধা হতে পারে।

কি সুবিধা, শুনি ?

এক রাত্রির মত আশ্রয়। কাল দিনের বেলাটারও—যদি সম্ভব হয়। সন্ধ্যায় আমি চ'লে যাব ঠিক। আর—আর—আর—

আর কি ?

মণীশ একটু কুণ্ঠিত হইল, তবু জোর দিয়া বলিল, টাকা। শ'তিনেক টাকা যদি দিতে পারিস ?

শুধু এইটুকু। আর কিছু প্রত্যাশা কর নি ? আর কিছু চাই না ?

আপাতত না।

'না'—ক্ষুণ্ণ স্বরে সুনীল শব্দটা উচ্চারণ করিল। মণীশ হঠাৎ চকিত হইয়া বলিল, চাই কি না, জিজ্ঞাসা করছিলি ? চাই বললেই কি আশা মিটবে ? চাই, চাই বিষম রকমে চাই। তোদের সবাইকে, তোদের সব-কিছু, সকল-ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, গৃহ-ছাড়া ক'রে তোদের চাই। কিন্তু সে চাওয়া কে শুনবে ?

শরতের জ্যোৎস্না ঘাটের উপরে, পুকুরের জলে, অশ্রান্ত লুটাইতে লাগিল।

শীতের সকালে, কলিকাতার ফুটপাথের উপরেও যেন সেই জ্যোৎস্নার ধারা লুটাইয়া যায়···

সুনীল উঠিল। মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, উঠলি যে?

আসছি এখনই।—বলিয়া সে অগ্রসর হইতে গেল।

সাবধান সুনীল!—বলিয়া মণীশ খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া একটানে তাহাকে বসাইতে গেল। চোখে ক্রুদ্ধ সন্দেহ।

অমিত দেখিতেছে—ঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সেই দুই বন্ধু—যেন ওই লাল বাড়িটার কোণে সেই ঘাটটা···ওই যেন দুই বন্ধু····

ভাবিস না অত সহজ, অত নিরীহ আমি। প্রাণ বাঁচানোর সমস্ত আয়োজন আমার সম্পূর্ণ আছে—তোদের একটা মাজ্‌ল লোডার-এর ওপর অত ভরসা রাখিস না।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া সুনীল খানিকক্ষণ মণীশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ তিরস্কারের স্বরে দৃঢ়ভাবে বলিল, চুপ কর, মণি। বকিস না—শুনলে আমাদেরই লজ্জা হবে তোর জন্যে। এত ছোট তোর মন—ভাবতে পারলি আমি তোকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছি।

মণীশ হাত ছাড়িয়া দিল। হাতটা পকেটে পুরিয়া সিধা বসিয়া কহিল, তুই কি করবি? তোদের থানায় ক'জন পুলিস থাকে? দশজন? থাক, তাদের রুখতে পারব। যা তুই।

সুনীল দাঁড়াইয়া রহিল, কহিল, মণি, ওঠ, আমার সঙ্গে আয়। এখনই ব্যবস্থা হবে, তারপর কথা বলিস। মণীশের হাত ধরিয়া তুলিল।

বাইরের একটা কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরের একটা ঘরে মণীশ উঠিয়া গেল। সুনীল বলিল, ব'স, আমি আসছি।

কোথায়?—বলিয়া মণীশ পথ বোধ করিল।

তোর থাকবার জায়গা চাই, টাকা চাই, তা পেলেই তো হ'ল? তবে আর বার বার অমন করছিস কেন? আমি যা করব, তাই হবে। এখন চুপ ক'রে ব'স।

আচ্ছা।—বলিয়া এক টানে জামাটা মণীশ খুলিয়া ফেলিল; বোতামগুলি পটপট ছিঁড়িয়া গেল—ভ্রূক্ষেপ নাই। কোমরের বেল্টে কি ঝকঝক করিতে লাগিল।

সুনীল চলিয়া গেল।

মণীশ দরজার সম্মুখে তৈরি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পার্শ্বের জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিল, সেখানে মুক্ত ছাদ। ছাদের শেষে একটা নারিকেল গাছ। না, এ খাঁচা নয়। তবুও তৈরি হইয়া থাকাই ভাল। ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, টেবিলে বইয়ের তাকে পরিচিত পাঠ্যপুস্তক, খাটের উপর একটি অর্দ্ধপঠিত খোলা বই। সুনীলেরই ঘর হইবে।

কাগজের ঠোঙায় করিয়া সন্দেশ ও নাড়ু লইয়া সুনীল ফিরিয়া আসিল, বলিল, কুঁজোয় জল আছে। আগে হাত ধুয়ে নে—ওই ছাদে। মাথাটায় জল দে, সিঁথিটা আঁচড়ে নে—তারপর দুটো খা।

মণীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুনীল কহিল, কি, নড়ছিস না যে? খা।

মণীশ পিছন ফিরিয়া জানালার কাছে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনীল হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, খাবি না? রাত্রিতে আর কি আনতে পারব জানি না। তবে মাকে ব'লে এসেছি, 'কাল সকালে দেবব্রত আসবে, শেষরাত্রে আমি যাব স্টেশনে তাকে আনতে।' তার পূর্ব্বেই তুই এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবি, আর কাল আমার সঙ্গে

ফিরবি--তুই হবি দেবব্রত রায়। কেউ তাকেও চেনে না, তোকেও চেনে না। এখনকার মত কিছু খেয়ে শুয়ে পড়। পরে আর একবার কিছু খাবার আনতে চেষ্টা কর্‌ব। এ ঘরে কেউ আসবে না। বড় বউদিকে বলে এসেছি, আমার মাথা ধরেছে, আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। আয়।—বলিয়া স্নুনীল মণীশের হাত ধরিয়া টানিল।

ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। স্নুনীল চমকিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে মণীশকে ধরিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল। নীরবে জলের ধারা বহিয়া চলিল। কেহই কথা কহিল না।

মণীশ অশ্রুচাপা কণ্ঠে কহিল, মাফ করিস, স্নুনীল। বড় অন্যায় করেছি, অন্যায় কথা বলেছি, অপমান করেছি—তবু মাফ করিস। ভাবছিস্, একি দুর্ব্বলতা! সত্যই তা'ই। কিন্তু আজ এক মাস আমার চোখে ঘুম নেই। দিন সাত-আট মাত্র শুতে পেয়েছিলাম। শুতে পেলেই যে ঘুমুতে পারি, তা তো নয়—কিন্তু শুতেই পাই না। তা ছাড়া রাত্রেই চলতে হয় পথ, দিনের বেলা পথে বেরুনো নিরাপদ নয়। এই চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ পথ চলে এখানে এসেছি—পায়ের জুতো ছাড়তে হয়েছে অনেক পূর্ব্বেই; গায়ের জামা দু-একবার নতুন কিনে নিয়েছি; ফোস্কা প'ড়ে আজ পা অচল হয়ে এসেছে। অথচ কোথাও তিষ্ঠোবার উপায় নাই—চল—চল—চল। এক ঘণ্টা আগে যেখানে ছিলে, এক ঘণ্টা পরে সেখানে আর যেন তোমার রেখাটি না থাকে। প্রতি মিনিটে পথ বদলাও, প্রতি মোড়ে পাল্টা চল—যেন কোন চিহ্ন তোমার কোথাও কেউ খুঁজে না পায়। শিকারী কুকুরের পাল তোমার দেহের আঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে তোমার পেছনে আসছে। নেকড়ের মত জিব বার ক'রে তারা তোমায় তাড়া করছে। দাঁড়ালে কি মরলে। ভুল করলে কি শেষ হ'লে। একটিবার অমনোযোগী হয়েছ তো আর নেই।...

শিকার ও শিকারী···the hunter and the hunted—অমিত চোখের সম্মুখে দেখিতেছে যেন—hunted and haunted.

মীরগঞ্জের একটা খালি গুদামে কাল রাতে শুয়েছিলাম। পা ফোস্কায় একেবারে অচল। ভাবলুম, এই রাতটা জিরোই—যখন আশ্রয় মিলেছে। কেউ যেচে আশ্রয় দেয়নি। পূজোর শেষে গুদামগুলো অমনই খালি প'ড়ে থাকে, মালিকের দেখা নেই। একটাতে ঢুকে শুয়ে প'ড়ে থাকলেও কেউ খোঁজ নেয় না। মাথার নিচে দুখানা খালি চট দিয়ে শুয়ে পড়লাম। নিমেষ যায়, পল যায়, মিনিট ঘণ্টা যেন শুঁয়োপোকার মতো ধীরে ধীরে মনের ওপরে জ্বালা ফুটিয়ে চলে। ফুরোয় না, কেবলই জ্বালা বাড়ে। শেষে মন আর শাসন মানে না, উন্মাদের মতো দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। মনে পড়ে ২০ এ—সেই সুতীব্র সর্ব্বরোধরিক্ত উন্মত্ত উদ্দীপনা—অতি সহজে ঘটে গেল যে অসম সাহসের, বহু কল্পনার আয়োজন।···

অমিত দেখিল, শীতের নিষ্প্রভ রৌদ্রে যেন একটা আগুনের তীব্র স্ফুরণ ফুটিল···

তারপর সেই পালাও, পালাও!—বাড়ি টপকে, শহর ছেড়ে, বন-জঙ্গল ভেদ ক'রে, অচেনা গাঁয়ের পথে, অজানা নদীর ধারে, পালাও পালাও! দিনকে রাতের মত শূন্য ক'রে, দিনের মত অশান্ত ব্যস্ততায় শতছিন্ন ক'রে চল—চল—চল। কিন্তু কেন? কেন? কেন এই চলা? কেন এই নির্ব্বোধ ছুটোছুটি? পালাবার ভরসা তো মনে নিয়ে ২০ এ বেরোও নি। পালাবার আশা এখনও তো মনে মনে স্বীকার কর না। তবে কেন এই ভাবে ঘুরে বেড়ানো? শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, এইখানে এই ভাবে শুয়ে পড়। রাত ভোর হয়ে যাবে—সূর্য্য উঠবে, গঞ্জের লোক জাগবে, গুদামের দুয়ার খোলা হবে; তারা তোমাকে পেলে তাকিয়ে থাকবে বিস্ময়ে। ক্রমে বিস্ময় বাড়বে, তারপর আরও বিস্ময়, আরও—ক্রমে ভয়ে ভয়ে

কানাকানি, শেষে হবে সব দুশ্চিন্তার শেষ—আর ছুটতে হবে না—বিশ্রাম, বিশ্রাম, বিশ্রাম।

বিশ্রাম! চোখ মুদে প'ড়ে থাক। এই প'ড়ে-থাকার আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে কি লাভ? শেষ পর্য্যন্ত যখন নিজেকে আগলে বেড়াবে না, ঠিকই করেছ; চোখ বুজে প'ড়ে থাক,—একবার এই রাত্রির নির্ব্বাক জীবনগতির ছন্দ ও স্পন্দন তোমার চেতনার মধ্যে গ্রহণ কর,—চেতনাকে নিষিক্ত ক'রে নাও তার ছন্দে।···

গা মোড়া দিয়ে উঠলাম। বুঝলাম, অবসাদ দেহে-মনে চেপে বসছে। আবার পথে পথে হেঁটে হেঁটে চললাম। এমনই ক'রে আজ কত রাত, কতদিন গেল—এই ত্রস্ত, চিন্তাদিগ্ধ দিনরাত,—দুঃস্বপ্নভরা দিন, দুশ্চর রাত, যাতনাময় অস্থিরতা! মানুষের সহজ প্রশ্নকে মনে হয় কুটিল; সোৎসুক দৃষ্টিকে মনে হয় সন্দেহসঙ্কুল; তার ছায়াকে মনে হয় সর্পিল।···মাফ করিস সুনীল, অবস্থার চক্রান্তে আমার মন বেঁকে-চুরে যাচ্ছে, ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করিস।

অমিত মনে মনে বলিল, হাণ্টেড অ্যাণ্ড হণ্টেড!

মণীশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ পরে সুনীল মণীশকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তোর সঙ্গে তো অন্য লোক ছিল, তারা কোথায় গেল?

জানি না, জানবার সময় নেই। তাদের দোষ দিও না, সুনীল। তাদেরও সাধ্য নেই আমার খোঁজ রাখে। রাখলে আমি আজ বাইরে থাকতে পারতুম না। হয়তো তারাও বাইরে নেই। তাদেরও এমনই ছুটে ছিটকে পড়তে হয়েছে, নইলে সব চেষ্টাই শেষ হয়ে যাবে—'কাজ' আর এগুবে না।

আবার খানিকক্ষণ কথা নাই। তারপর মণীশ কহিল, বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো আমাদের নয়—আমাদের 'কাজের' সম্পর্ক, যমের দুয়ারে এগিয়ে দেবার সম্পর্ক। সেখানে যে বন্ধুত্ব জন্মে, তার নিয়মই এমন সৃষ্টিছাড়া; নইলে সবই যায় ভেস্তে। তাদের থেকে আমার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আমি পেয়েছি ২০এ পর্য্যন্ত। আবার তেমনিতর আয়োজন করতে পারলে আবার পাওনা দাবি করব, কড়ায় গণ্ডায় তা বুঝে নেব—তাদের পাওনাও অমনই ক'রে বুঝিয়ে দেব তাদের। আমাদের বন্ধুত্বের লেন-দেনে এইটাই নিয়ম। তার বেশি যা, তার চিহ্ন নেই—সে কথায় ফুটবে না, চোখের জলে ধোয়া হবে না। সে থাকবে মনের কোঠায়, যেখানে থাকলেও লোকে তাকে দেখতে পায় না, না থাকলেও লোকে তা সন্দেহ করে না। বাইরের চোখে তা থাকা না-থাকা সমান।...কিন্তু ওই থাকাটাই তবু চাই। —উদ্‌ভ্রান্ত হয় মণীশের মন।

বাসের জন্য অমিত অপেক্ষা করিতে করিতে অস্থির হইয়া উঠিল....কেবলি মনে পড়িতেছিল মণীশের কথা...

দিন পাঁচেক কাটিল। মণীশ একটু একটু করিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সুনীলের মুখে কথা নাই—সে যেন কি একটা চিন্তায় নিমগ্ন। এদিকে সকালে সন্ধ্যায় সুনীলের দাদারা ডাকিয়া পাঠান, কোথা হে দেবব্রত, এস, ব'স; একটু গল্পসল্প করা যাক্। করছিলে কি? বেড়াতে বেরিয়েছিলে? না, আজও পড়তে পড়তেই বিকালটাকে শেষ করলে? কি পড়ছিলে? উপন্যাস? কার? কণ্টিনেণ্টাল? সেবেটেনি? কি বললে, ফয়স্টবেঙ্গার? সে আবার কে? গল্পটা কি নিয়ে শুনি?

অমিত মনে মনে মানিল—আশ্চর্য্য ইঁহারা। সুহৃদ সেদিন বলিল,

'এখনও অমি' তুই 'ডাউন-ফল পড়িস নি!' যেন পড়াটাই একমাত্র জীবন।

চোখের সম্মুখে ইতিহাসের যে পতন-অভ্যুদয়ের পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, তাহাও দেখে না ইহারা!

গল্পটা বলা শক্ত, বিশেষত মণীশ "জু স্যস" বা "আগ্‌লি ডাচেস" কোনটাই পড়ে নাই। বিজয়ের মুখে গল্পটা সে একদিন শুনিয়াছিল। এখন তাহাও কিছুই মনে পড়ে না। যদি বা সুনীলের দাদারা কোনও দিন গল্পটা জিজ্ঞাসা না করেন, অন্য কথা উঠিয়া পড়ে। এখন কলেজে কে পড়ায়? ইকনমিক্‌সের উপর এ যুগের ছাত্রদের এত আকর্ষণ কেন? ফিলজফি কি এখন কেউ পড়ে না? কলেজ, পড়া, ফিলজফি, ইকনমিক্‌স—এই সব শব্দগুলি মণীশের পিছনকার অতীত জগতের লুপ্তচিহ্ন—যে জীবনকে সে সহিতে পারে নাই, মানিয়া লইতে পারে নাই। সেই গ্লানিময় দিন-রাতের স্রোতোহীন খাদে বইয়ের এই বুদ্‌বুদমালা ফুটিয়া উঠিত। দূরে—বহুদূরে—অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে মণীশ সেই মন্দগতি জলরাশিকে। ক্ষুরধার খরস্রোতের মধ্যে সে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছে। কোথায় সেই পুরাতন বদ্ধবায়ু, রুদ্ধবেগ দিন রাত? কলেজ, পরীক্ষা, প্রোফেসর ইকনমিক্‌স, ফিলজফি ....সেই ডোবার জলের তলাকার পচা মাটির নিঃশ্বাসে যেন আবার বুদ্‌বুদ ফুটিতেছে।

না, মণীশ আর এই বুদ্‌বুদ দেখিতে চাহে না—চাহে না, চাহে না। এক লাফে এই বসিবার ঘর হইতে বাহিরের সামনেকার প্রাঙ্গণে পড়িয়া দাঁড়াইয়া সে বলিতে চায়—গলা চিরিয়া চীৎকার করিয়া,—শ্বাসযন্ত্র ফাটিয়া যাক, তবু একবার সমস্ত শক্তি ঢালিয়া সে বলিতে চায়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা,...এই সব মিথ্যা! তোমাদের আলাপ মিথ্যা, আলোচনা

মিথ্যা, চিন্তা কর্ম্ম ধর্ম্ম সব মিথ্যা, তোমরা মিথ্যা—আমার নিকটে তোমরা মিথ্যা,—অস্তিত্বহীন, প্রাণহীন—যাতনাকর।

অমিতও কি সুহৃদকে এমনই বলিতে চায়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা, তোমরা মিথ্যা। না, অমিত সে যোগ্যতা অর্জন করে নাই।......

মণীশের অধীরতা বাড়িয়া গেল, কিন্তু সুনীল একেবারে নিশ্চল। এক সপ্তাহ শেষ হইতে চলিল, সে কোন কথা বলে না, টাকার কথা আর পাড়ে না—যেন কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। কি ভাবিতেছে সুনীল রাত্রিদিন—কেন একা একা ঘুরিয়া বেড়ায়? কোথায় যায়? সুনীলের মা আবার মণীশকে ডাকিয়া পাঠান।

অমিতের চোখে ফুটিল এবার পূর্ব-আকাশের পটে সেই মাতৃমূর্তি। অমিতকেও তিনি এমনই করিয়া খাওয়াইতেন।

নিকটে বসিয়া মণীশকে মা নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নানা খাদ্য খাওয়াইলেন, কিছুতেই ছাড়েন না।

বাড়িতে কে আছে? মা নাই? তাই বুঝি খুব ঘুরিয়া বেড়াও? —সুনীলের মতই। বউদিরা আছেন? থাকিলে হইবে কি? পারিবেন কেন? আজকালকার বউরা খুব মিশুকে, খুব গল্প করিতে পারেন, গুণের কাজও নানারকমের জানেন। কিন্তু আদরযত্ন তাঁহারা বুঝেন না, করিতেও জানেন না। তাঁহারা বই পড়েন, সেলাই করেন। তাঁহার ছোট বউমা ললিতা···

ললিতা—অমিতের চোখে যেন এখনও সে স্পষ্ট···প্রভাতের একটি উজ্জ্বল কিরণরেখা—স্বচ্ছ, সহাস্য, চপল,—জীবনের ছন্দ যেন উপচিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একটি মানুষ হইয়া উঠিয়াছে···

ছোট বউমা কলেজে পড়িতেন। ইংরেজী খুব জানেন, ছবিও আঁকিতে পারেন। গলাও তাঁহার মিষ্টি—যেন মধু ঝরে। সর্বদা হাসিখুশি। মণীশ দেখিলে নিশ্চয় সুনীলের মত তাঁহার বন্ধু হইয়া পড়িত। কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ ললিতা, ঠিক মণীশ সুনীলের মতই। দুই হাতে টাকা ছড়াইয়া দেন পাড়ার মেয়েদের আমোদে উৎসবে, পরের ছেলেদের বই কিনিবার জন্য, লাইব্রেরির বই বাড়াইবার জন্য। সময়ই পান না—শহরের মেয়েদের সভা ডাকিয়া, খাওয়াইয়া তাহাদের নিজের গাড়িতে বেড়াইতে লইয়া গিয়া। এমনই আরও কত খেয়াল। একেবারে পাগলী, একেবারে খেয়ালী। খেয়ালের আদি অন্ত নাই। সুনীলের ত তাহার সঙ্গ পাইলে আর কথা নাই; সেও সুনীল বলিতে অজ্ঞান। গিয়াছে দার্জিলিং, লিখিতেছে চিঠির পরে চিঠি—সুনীলকে একবার পাঠাইয়া দাও। সুনীল এতদিনে যাইতও। মণীশ আসিল, তাই রহিয়া গেল। আর দার্জিলিং গেলে হইবে কি? যে পাগলী মেয়ে! দিনরাত রাঁধিবে—যত বিলাতী রান্না। বিলাতী পিঠা হইবে —সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। রাত দুপুরেও বাদ যায় না। ওদের এক মুহূর্ত শান্তি নাই। খাওয়া-দাওয়ার সময় স্থির থাকে না। যতই খাক না, এরূপ চলিলে শরীর ভাল হইবে কেন? শরীরের যত্ন জানেন বুড়ীরা। মা থাকিলেই মণীশ দেখিতে পাইত, অমন বড় বড় চুল রাখিয়া, মাথায় তেল না ছোঁয়াইয়া, গায়ে তেল না মাখিয়া কেমন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়! কতদিন হইল মা গিয়াছেন?

মা…

মণীশের কণ্ঠে কথা রুদ্ধ হইয়া যায়। না, সে আর এইখানে থাকিতে পারে না—অসম্ভব, অসম্ভব।

অমিতের মনে এবার নিজের মায়ের মূর্তি জাগিয়া উঠিল। আজ মা বড় বিষণ্ণ…কিন্তু কি করা যায়? কি করিবে অমিত?

কয়েকটি পিঠা তৎক্ষণে আবার মণীশের থালায় পড়িল। আপত্তি করিবার জন্য মুখ তুলিতেই স্নুনীলের মা এমন একটা ভাব দেখান, যেন ইহা একটা অতি সামান্য ব্যাপার, এই সম্পর্কে কোন কথা বলাই মণীশের পক্ষে বাড়াবাড়ি।

বেলা নয়টা বাজিতেই আবার দুধের বাটি হাতে লইয়া বৃদ্ধা বসিয়া থাকেন। 'ওবেলা খেতে দেরি হবে, স্নুনীলের ত খোঁজ নেই, তুমি বাবা খেয়ে নাও।'

...ঠিক এই কথাই এমনই করিয়াই বাড়িতে মণীশের মাও বলিতেন মণীশকে।—অমিতের মা আর বলিতে পান না অমিতকে।

যাক, বাস আসিয়াছে, অমিত আশ্বস্ত হইল। সওয়া নয়টা—একবার পার্ক-সার্কাসে গেলে হয়। সাতকড়ি এখনও আছে বোধহয়, রাত্রি জাগিয়া এখনো ঘুমাইতেছে। এখনও কি ? নয়টা ত সাতকড়ির রাত।

না, মণীশ আর তিষ্ঠিতে পারে না। এখান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে—যেখানে মা নাই এমন স্থানে, তেমনতর একটা রাজ্যে যাইতে হইবে।...

বাংলা দেশ বড় অদ্ভুত, বিশ্রী। এখানে পথে ঘাটে একটা বিমূঢ়, অন্ধ মানবশ্রেণীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহারা কিছুই হইতে চাহেন না—মা হইয়াই তৃপ্ত। পদে পদে ইঁহাদের স্নেহের চোরাবালি মানুষকে বাঁধিয়া ফেলে। অসম্ভব এই জাতি, অসম্ভব এই দেশ। সত্যি সত্যি অমিত মানে, বাংলা দেশের ছেলেরা স্নেহের ফাঁদে পড়িয়াছে, মানুষ হইতে পায় না।......

স্নুনীল টাকার কি করিল ?এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে চলে না। আর ত এখানে থাকাও উচিত হইবে না।—মণীশ স্নুনীলকে বলিল।

সুনীল স্থির করিল, প্রথমে যাইবে বড় বউদি'র কাছে। স্নেহশীলা বউদির কাছে টাকা চাহিতে কোন দিন তাহার দ্বিধা নাই, কোন দিন চাহিয়া সে নিরাশও হয় নাই। তবু, এবারকার টাকাটা একটু অদ্ভুত কারণে চাহিতে হইতেছে—পরিমাণেও বেশি। কোথায় যেন কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। তাহা ছাড়া বড় বউদির হাতে অত টাকা জমা থাকে না। তিনি খরচই করেন, জমাইতে জানেন না। বরং মেজ বউদি হিসেবী, তিনি শৌখিন মেয়ে। তাঁহার বাবা পেন্‌শনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; ভাইরা বিলাতফেরত। পাটনায় তাঁহার খরচ কম; নূতন নূতন জামা-কাপড় সুনীল কলিকাতা হইতে তাঁহাকে যোগায়, তাহাতেই তাঁহার যাহা কিছু বেশি খরচ। সুনীলের চোখ আছে, পছন্দ ভাল। পাটনাতে কলিকাতার ফ্যাশান-জগতের বার্তা তাঁহার কাছে নিয়ত পৌঁছাইবার ভার এই রুচিশীল দেবরটির উপর দিয়া তিনি সন্তুষ্ট আছেন। পাটনায় তাহারই সময়মত চেষ্টায় তিনি নূতন ফ্যাশান প্রচলিত করেন—সেই খোলা-হাতা ব্লাউজ, ঢোলা-কাটের ব্লাউজ, মণিবন্ধ পর্যন্ত বিলম্বিত ব্লাউজ, প্রকাণ্ড পদ্মাকৃতি কানের ফুল, সারনাথ-লোটাস-মটিফ চালানো; সিল্ক শাড়ির পাড়ে ভারতীয় চিত্রের অনুকৃত লতাপাতা, শোভাযাত্রা, ভেলভেটের লাল নাগরীর বদলে সুরুচিসম্মত স্যাণ্ডেল—পাটনার জগতে এসবের প্রথম প্রচলয়িত্রী মিসেস্ বনলতা দত্ত। সুনীলের প্রতি তাঁহারও যথেষ্ট স্নেহ আছে। তবু তিনি থাকেন দূরে; তাঁহার অপেক্ষা বড় বউদি সুনীলকে দেখিয়াছেন বেশি—একরূপ মানুষই করিয়াছেন; যতদিন সুনীল স্কুলে পড়িত, ততদিন তাঁহারই কাছে থাকিয়া সুনীল পড়াশুনা করিত। তিনি ভালমানুষ, কিছু বলিবেন না। কাজেই প্রথম বড় বউদির উপর সুনীলের দাবি, তারপর মেজ বউদি আছেন। তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সব বুঝিবেন। তাঁহাদের দুইজনকেই দরকার হইলে সত্য কথা বলা চলিবে, তবে দরকার না হইলে বলিয়া কি হইবে? বরং

না বলাই শ্রেয়ঃ। এখন বলিবে—সুনীলের তিন শত টাকা চাই। তোমরা দাও। আর কাহাকেও বলিতে পাইবে না—এই শর্তে সে তোমাদের টাকাটা লইতে পারে। টাকা কেন চাই? জানিতে পাইবে না। তবে, তুমি যদি জানিতে চাও, একমাত্র তোমাকেই বলিতে পারি—সাবধান, আবার দাদাদের কাহাকেও বলিও না। কিন্তু থাক, মেয়েদের পেটে কথা থাকিতে পারে না; এখনই দাদাদের সম্মুখে তাহা উদ্গীরণ না করিতে পারিলে তোমরা আজ দুপুরে ঘুমাইতে পারিবে না। তবে যদি কথা দাও—। কথা দিলে! শোন, কিন্তু সাবধান,—বলিবে না তো? সুনীল একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটর-বাইক কিনিবে।

সমস্ত দৃশ্যটা অমিত মনে মনে আঁকিয়া ফেলিল। অমিতের মনে পড়িল এমনই সুনীলের ছলনার চেষ্টা। এতই innocent ওর ছলনা পর্যন্ত।

তবু আরও একদিন সুনীলের এইভাবে গেল। তারপর আর চলে না—সুনীলকে এবার মণীশ শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

সুনীল কথাটা পাড়িল। কথা সবই ঠিক মত চলিল, কিন্তু ফলটা আশানুরূপ হইল না। বড় বউদি কহিলেন, হাতে তো ভাই, এই পূজোর বাজারে কিছু নেই। তোমার দাদাকে বলি—আপিস খুললেই হবে। এ কথা ওঁকে বলতে আর বাধা কি? তবে, দেখো, তোমার হাতে মোটর-বাইক দিতে আমার বড় ভয় হয়, যে অসাবধান তুমি।

কিছুতেই বড় বউদি বুঝিতে চাহেন না। মোটর-বাইকে তাঁহার বড় ভয়। তাঁহার সর্বদাই সুনীলের জন্য ভয়! না, ইহার অপেক্ষা মেজ বউদির সঙ্গে সহজে কথা বলা চলে।

সুনীলের সেখানে কথা বলা সহজ হইল। তিনি বুদ্ধিমতী, শুনিয়াই বলিলেন, দূর! মোটর-বাইকে কি আবার মানুষে চড়ে! দেবু মিত্তির বিলেত থেকে ফিরে তিন মাস একটায় ঘুরত; তাও সাইড-কার ছিল, আর তার প্রয়োজনও দেবুর ছিল,—ফিরিঙ্গী মেয়েরা সাইড-কারে চড়তে উৎসুক। কিন্তু আমার দাদা তো তাকে ক্ষেপিয়ে পাগল ক'রে দিলেন। শেষটা বাইকটা দেবু বিক্রি ক'রে দিলে। তুমি কিনছ আবার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বাইক্! আরে দূর দূর!

সুনীল ছাড়িতে চাহে না। ওর বাইকটায় সাইড-কার নাই,—বউদির দুর্ভাবনার কারণ নাই। সুনীল কোনও ফিরিঙ্গিনীর মোহে তাঁহার বোন মনোলতাকে সাইড-শো করিয়া রাখিয়া পলাইয়া বেড়াইবে না, ইত্যাদি।

কিন্তু ফল হইল না। মেজ বউদি বুদ্ধিমতী, বাজে কথায় টাকা নষ্ট করেন না। হইত যদি বিলাতী 'ফার'-কোট, টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারে সুনীলের নামে আসিত টাকা!

অনেক ভাবিয়া সুনীল পরদিন বড়বউদিকে খুব গোপনে কথাটা বলিল, বাইক নয়, অপর কিছু। দেশের কাজে চাই। চরকা ও তকলির জন্যে নয়, অন্য কিছু। তোমরা তো দেখেছ বউদি, গোরাগুলো কেমন ঠ্যাঙাচ্ছে।

বউদি আঁতকাইয়া উঠিলেন, সর্বনাশ! তুমি এসব কি বলছ?

অনেকক্ষণ সুনীলের কথা শুনিয়া তিনি সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মেয়ে-জন্মে কি কিছু করার সাধ্যি আছে ভাই? তোমার দাদা শুনলে আমায় কেটেই ফেলবেন। জান তো, তিনি চুরি-ডাকাতি খুন-জখম কত ঘৃণা করেন! সাবধান ভাই, তাঁকে যেন এসব কথা বলো না।

সুনীলের বড় বউদির জন্য কৃপা হইল, রাগ হইল। একটা নির্বোধ জরদ্গব।

অমিত কিন্তু দেখিতেছে গৃহিণীমূর্তি—সন্তানবৎসলা, আত্মীয়বৎসলা, বাঙালী মেয়ে।

মেজ বউদির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তাহা ছাড়া তিনি একটু আপ-টু ডেট। এই সব কথা তিনি বলিলেই বুঝিবেন।

সত্যই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ও ঠাকুরপো! দেশোদ্ধারের কথা বলছ? তিনশো টাকায় হয়ে যাবে ভারতোদ্ধার? কে তোমায় এ বুদ্ধি দিলে?

অমিতের চোখের সম্মুখে ফুটিল সেই ফ্যাশান-উপাসিকা মূর্তি আর তাঁহার শ্রদ্ধাহীন অবজ্ঞার হাসি। ইহা অপেক্ষা অমিতের চোখে পল্লীগ্রামের মূর্খ-গৃহিণীও বড়।

হাসি থামিলে মেজ বউদি বলিলেন, আমার মেজদাদা কেম্‌ব্রিজে ইকনমিক্‌সে ট্রাইপোস্। তিনি হিসেব ক'ষে ব'লে দিয়েছিলেন—যদি একশো কোটি টাকা পাওয়া যায়, তা হ'লে ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব হবে। ওঁর মতে—উনি অনেক ঘেঁটেছেন,—সাদা ফৌজের কর্তাদের হবে প্রথম হাত করতে—জোর পঞ্চাশ কোটি টাকা ঘুষ। সাধ্যি নেই 'না' বলে। বাদ-বাকি চব্বিশ কোটি সব অমনই লাটবেলাটদের। সাদা মন্ত্রীদের জন্য পঁচিশ কোটি রিজার্ভ—এক কোটি শুধু দরকার দেশের লোকদের অর্‌গ্যানিজেশনের জন্যে। দাদা বলেন—'এক কোটি এমন বেশি কিছু নয়। সেদিনও তো চরকা-তকলির খেলনা কিনে তোমরা গান্ধীর জন্য নষ্ট করলে এক কোটি। তার চেয়ে যদি সাইন্টিফিক লাইনে চলতে, মাথাওয়ালা লোকদের হাতে টাকাটা দিতে!' কিন্তু আমার বড়দা আবার বলেন—একশো কোটি টাকা অমনই ঢেলে ইংরেজ তাড়ানোতে

নাকি মোটের ওপর আমাদের লোকসান হবে,—ইংরেজ তাড়ানোর খরচই পোষাবে না। উনি বলেন—'আন-ইকনমিক'। মেজদার সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর তুমুল তর্ক। মেজদা বলেন, 'ঠিক তা বলা যায় না, যা ওরা শুষছে—'। কিন্তু বড়দা বলেন—

মেজদা···বড়দা···মেজদা····আন-ইকনমিক···

স্থনীল একটু অধীর হইয়া বলিল, আমার অত টাকা চাই না। তিনশো টাকা আন-ইকনমিক হবে না, তা তোমার বড়দাও বলবেন। তুমি তাঁকে পরে জিজ্ঞাসা ক'রো, আপাতত টাকাটা আমায় দাও।

তিনশো টাকায় দেশোদ্ধার,—কেমন? এ কি তুমি বাঙালকে হাই-কোর্ট দেখাচ্ছ নাকি?—মেজ বউদি হাসিতে লাগিলেন।

স্থনীল আর এক দফা বলিল, দেখছ তো ফাটা মাথা, রক্তারক্তি, গুলিতে খুন, ইত্যাদি। যদি একটা বারও ইংরেজ পাণ্টা জবাব পেত—!

তোমার দাদাও ঠিক তাই বলেন। দু-চারটে লালমুখকে শুইয়ে দিলে শর্মারা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু মেজদা আবার তা মানেন না। বলেন, 'তুমি দেখনি ব্রিটিশ কারেজ বা ব্রিটিশ ক্যারেক্টার। পাব্লিক স্কুলের টোন অনেক উঁচু। ভয় তাদের নেই, আছে লোভ। সেই লোভের বোড়ে দিয়েই তাদের মাত করতে হবে।' তোমার দাদার সঙ্গে মেজদার তাই তুমুল তর্ক। তখন ওমাসের ঘটনাটা ঘটেছে, সবারই মুখে এক কথা। কিন্তু মেজদা বলেন, 'না। পকেটে মর্তমান কলা নিয়ে বেরুলেই যে চৌরঙ্গীর সাহেবরা ছুটে আউটরাম ঘাটে গিয়ে জাহাজে চ'ড়ে বসবে, তা নয়।' মেজদা অনেক ভেবেছেন এ সম্বন্ধে, আর বলেনও বেশ—'পকেটে মর্তমান কলা'! হি-হি-হি!

সেই প্রাণহীন, মমতাহীন, শ্রদ্ধাহীন হাসি···অমিতের চোখে এই হাসি অসহ্য।

সুনীল তবু একবার শেষ চেষ্টা দেখিল। কিন্তু মেজ বউদি হাসিয়াই খুন,—ওঃ! তুমি কি তবে আনন্দমঠ খুলছ নাকি? বেশ বেশ। কিন্তু বাপু, জমবে না—দু-একটা শান্তি-কল্যাণী না হ'লে 'সন্তানরা' টিকবেন না। নিদেন, তোমাদের এক-আধজন মেজ রাণী চাই, যে লোক-বিশেষকে ঘরের মোহরগুলো চুরি করে দেবে। কিংবা একজন সুমিত্রা, যিনি হঠাৎ বেফাঁসে পড়লে তোমাদের 'পথের দাবির' কাউকে পথের স্বামী ব'লে দাবি ক'রে বসবেন। সে সব দিকে কিছু করছ কি, হে সন্দীপ-সব্যসাচী?

মেজ বউদির বুদ্ধি ও ব্যঙ্গ দুইই তীক্ষ্ণ। কিন্তু টাকাটা পাইলে সুনীলের আর চিন্তা থাকিত না।

সুনীল মাকে জানাইল যে, কাল সে দার্জিলিং যাইবে; দেবব্রত যাইবে তাহার বাড়ি। পথের জন্য সুনীলের গোটা পঞ্চাশ টাকা দরকার। দেবব্রত আরও দুই-চারিদিন থাকে, মা তাহা চাহেন। কিন্তু দেবব্রত আর থাকিতে পারে না। অগত্যা মা সুনীলের কথায় স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যায় বড়দাদা সুনীলকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসাদি করিয়া পঞ্চাশটা টাকা দিয়া বলিলেন, কিন্তু দেখো, 'ফগে' ঘুরে ঘুরে যেন নিউমোনিয়া ক'রে ব'সো না। ছোট বউমাও এ বিষয়ে বড় অমনোযোগী। আর অনিল তো ক্লাব, টেনিস বা আউটিং পেলে নেচে ওঠে। সাবধান বাপু।

পঞ্চাশ টাকা হাতে লইয়া সুনীল ছুটিতে চাহিল দার্জিলিং। মণীশকে সে কিছুতেই ছাড়িবে না, বলিল, সেখানে টাকা যোগাড় ক'রে তোকে দিয়ে তবে আমার মুক্তি।

মণীশ প্রথমে স্বীকৃত হইতে চাহে না। সেখানে এখন বাংলা-সরকার —সব হোমরা-চোমরারা পাহাড়ে গিজগিজ করছে।

বেশ তো, তোমার দাদার ওখানে ভয় নেই। একে সরকারী চাকুরে

কেউ সন্দেহ করবে না; তার ওপর, এককালে তাঁর তোরই মত মাথা-গরম হয়েছিল, এখনও একেবারে হিম হয়ে যায় নি। আর আমার বউদিও রীতিমতো ব্রেভ এবং স্পিরিটেড।

তুই ডুববি, তাঁরাও ডুববেন, আমিও ডুবব।

কিন্তু টাকা যে নইলে দিতে পাচ্ছি না। অথচ ছোট বউদির কাছে চাইলেই পাব। এমন কি, সত্যি কথা ব'লে চাইলেও—

সাবধান!—মণীশ ধমক দিল, বলেছিস কি মরেছিস। মানে আমাকে ফাঁসিয়েছিস—হোক সে তোর ছোট বউদি।

বেশ, না হয় বলব না। কিন্তু টাকা তোকে দোব, কথা দিচ্ছি; আমার সঙ্গে চল। কেউ ওখানে তোকে চিনবে না—এক মাসের ছুটোছুটিতে চেহারা অনেক বদলে গেছে—মিলবে না।

মণীশ রাজি হইল।

বিদায়কালে বড় বউদি জিজ্ঞাসা করিলেন, একটা কথা জানতে চাই, সুনীল। ত্রয়োদশীর রাত্রিতে তুমি মাথা ধরেছে ব'লে শুতে গেলে, খেলে না। মা আমাকে পাঠালেন দেখে আসতে, কেমন আছ। ঘরে আলো নেই—আমি ধীরে ধীরে গেছলাম। খাটের ওপর দেখলাম, দুজনে শুয়ে। চমকে গেলাম। জ্যোৎস্নায় যতটুকু চিনেছি—আর-জন এই দেবব্রত। অথচ, সে নাকি এল তার পরদিন সকালের গাড়িতে। আমি কি ভুল দেখেছি, সুনীল?

সুনীল কথা বলিল না, মুখ নত করিয়া রহিল। আবার প্রশ্ন হইল, কি যেন একটা তুমি গোপন করছ? কেন, সুনীল?

সুনীল মুখ তুলিল: সে তুমি বুঝবে না। তবু আমার একটিমাত্র অনুরোধ: আমার ভাল চাইলে এই কথাটা আর কারও কানে তুলবে না। যদি তোল, তা হ'লে আমার পরম অকল্যাণ।

মাকে প্রণাম করিয়া সুনীল দার্জিলিং যাত্রা করিল।

৫

শীতের রৌদ্রে দাঁড়াইয়া অমিত দেখিতেছে, কলিকাতার বুকের উপর তুষারমণ্ডিত হিমালয়—দার্জিলিং।

তরাইয়ের বন, ধোঁয়াটে পাহাড়, সাদা তুষারমৌলি,—কুণ্ডলায়িত মেঘ, পাতলা কুয়াসা, পাগলা ক্ষ্যাপা মেয়ে ঝরনা, পথের ফুল, পাহাড়িয়া নরনারীর রহস্যময় মুখাবয়ব, আর···ললিতার হাসি। প্রচুর হাসি, অকারণ হাসি। অকারণে ছুটাছুটি, হাতাহাতি, মারামারি, সময়ে অসময়ে 'চল বেড়িয়ে আসি। ফগ আছে, চল; ফগ নেই, চল।' অসম্ভব খাদ্যের আয়োজন, অপরিমিত চা ও কেক, চপ ও রোষ্ট। গরম জল লইয়া ছুটাছুটি—'হাতে ঠাণ্ডা জল! মা গো, মরবে যে! নাও, নাও।' 'বিছানাটা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে।' 'বেশ ছেলে! পায়ে মোজা নেই! গেছ এবার।' 'আমার শালটা জড়িয়ে নিন, দেবব্রতবাবু। না না, দার্জিলিং ইজ এ হরিব্‌ল প্লেস—জানেন না।' ম্যাল, ক্যালকাটা রোড, কার্শিয়ং লেবং, টাইগার হিল, সিঞ্চল—'যেতেই হবে। না, যেতেই হবে।' 'আমার বই এনেছ? থাক, তোমরা যতদিন আছ দরকার নেই। পড়েছি 'শেষপ্রশ্ন', কচকচি ভাল লাগে না। থাক থাক। চল ঘুরে আসি অব্‌জারভেটরি হিল। মিস মিত্র আসবেন—শী ইজ এ বিউটি, ইজ নট শী? 'ম্যাডোনা ইন দি স্লিপিং কার' পড়ি নি, ও বই তোমার দাদার। তোমাদের কণ্টিনেণ্টাল লেখকরা যে শক্ত! পরে পড়ব'খন। জান, একটা বই পড়েছি 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। আঃ, সো ক্রুয়েল! সো ক্রুয়েল—তোমাদের পলিটিক্‌স আর যুদ্ধ আর পেট্রিয়টিজ্‌ম!'

ললিতা যেন ঝরনার মত....ইন্দ্রাণী এত কথা বলে না, এত হাসেও না—তাহাকে মানাইতও না বোধ হয়। তবু সে যেন ললিতার মত—আবার ললিতার মত নয়ও। ইন্দ্রাণী সচেতন, ললিতা সরল নিশ্চিন্তা। বরং ললিতা যেন সুধীরার মত।—কিন্তু না, ইন্দ্রাণীকেও অবিচার করিও না, অমিত। ললিতার প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব সত্যই হয়তো আছে, অন্তত অনেকের কাছেই তাহা জানা কথা। কিন্তু ইন্দ্রাণীও উদার, মহীয়সী।—অমিত বিচার করিল—সুধীরার স্নিগ্ধতা....শান্ত মিতাভাষিতা।....ললিতা যেন কথার ঝরনা, স্নেহের উচ্ছল ধারা।

তিন দিন উড়িয়া গেল।

স্টেশনের বড় কাগজে-আঁটা প্রতিলিপিটার দিকে দেখাইয়া মণীশ বলিল, সুনীল, টাইম ইজ আপ।

ললিতা বলিল, অ্যাণ্ড টাইম ইজ লাইফ। কথাটা সে নূতন পড়িয়াছে কোথায়।

মণীশ বলিল, অ্যাণ্ড টাইম ইজ মানি, না সুনীল?

সুনীল উত্তর দিতে পারিল না। মাথা নোয়াইয়া চলিল।

ললিতা বলিল, আপনারা সত্যি এত বাজে বকেন! টাইম ইজ মানি! শুনলে আমার গা জ্ব'লে যায়। মানি ইজ ট্রাশ! টাইম ইজ লাইফ।—ললিতা বকিয়া চলিল।

অমিত জানে, ললিতা এমনই বটে......তরাইয়ের চিন্তাহীন প্রজাপতি......রৌদ্রে খেলিয়া বেড়ায়।

কিন্তু পরদিনই ললিতাকে মানিতে হইল, টাকা ট্র্যাশ নয়।

তিন শো টাকা বললে না? দেখছি কত আছে—গুণে তো

রাখি নি। ওমা! এ যে মাত্র এক শো চুরাশী টাকা। ছিল পাঁচশো তেইশ, অ্যাণ্ড আই হ্যাভ স্পেণ্ট দি হোল লট। গুড্‌নেস! তোমার তা হ'লে কি হবে? আচ্ছা, তিন শো টাকাই তোমার দরকার? কমে হবে না? তবে তো মুস্কিল! এ যে এখানকার ভাড়া ও রেল-ফেয়ার দিতেই যাবে। আচ্ছা বেশ, আপিসে উনি হাজির হ'লে টেলিগ্রাম ক'রে সেদিনই তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

স্নুনীল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

শীতস্নিগ্ধ পাহাড়ের দেশে মেঘহীন আকাশের রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। দূরে ঘুম ছাড়িয়া উঁচু পাহাড় বাহিয়া সাপের মত পাহাড়িয়া রেলগাড়ি নামিয়া আসিতেছে।

চল চল, কাব্যি করতে হবে না। এখ্‌খুনি ছুটে গেলে অবজারভেটরি হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে। নাও, তোমার জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি, প'রে ফেল চটপট ক'রে। না বাপু, শুনছি না। ওঠ, ধর এই দূরবীনটা।

স্নুনীল ও মণীশকে টানিয়া লইয়া ললিতা বাহির হইয়া পড়িল। সত্যই মানি ইজ ট্র্যাশ—ললিতার কাছে।

আরও একদিন চলিয়া গেল—স্নুনীলের মুখ মেঘাচ্ছন্ন দার্জিলিঙের ম্লান আকাশের মত। ললিতার হাসিতেও সে মেঘ হালকা হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। মণীশ সব শুনিল।

তবে এবার স'রে পড়ি?

আর একটা দিন সবুর কর, আমার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

কিন্তু এখানে আর থাকতে আমার সাহস হচ্ছে না। মনে হয়, যেন টিকটিকিতে পাহাড় ছেয়ে ফেলেছে।

তা হোক, এ বাড়িতে তোর ভাবনা নেই। একটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে।

অবশেষে স্থনীল দাদাকেই বলা স্থির করিল। সামান্য কয়টা টাকা, কথাটাও গোপন থাকিবে, কেহ জানিবেও না। সত্য কথা বলিলে দাদার নিকট হইতে এ টাকা পাওয়া অসম্ভব নয়। গোপনে তিনি এখনও ন্যাশনাল স্কুলে মাসে মাসে চাঁদা দেন, অমিতকে টাকা দেন শ্রমিকসজ্ঘ গঠনের জন্য, সমবায়-সমিতি বাড়াইবার জন্য।

অমিত মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল—এ পর্যন্ত অনিল, ইন্দ্রাণী, ও স্থধীরা তাহাকে কত টাকা দিয়াছে। পঁচাত্তর ও দেড় শো; সেবার পঁচিশ, না পঞ্চাশ? পঞ্চাশই। তারপর তিনবারে দেড় শো··· প্রায় ছয় শত টাকা। অনিলের হাতও ছোট নয়, বছরে শ' দেড়েক টাকা সেও দিত। স্থনীল যতই রাগ করুক—অনিল ক্ষুদ্র-চেতা নয়।

এককালে অমিত আর অনিল নাকি তাহাদের অঞ্চলে প্রসিদ্ধ স্বদেশী ছিল। তবে সে যুদ্ধ ও অসহযোগের যুগ। অল্পের জন্য সে সময় জেল হইতে অনিল বাঁচে। নিতান্তই বোসপুকুরের দত্তবাবুদের ছেলে বলিয়া সেবার দারোগাবাবু তাহাকে চালান দেন নাই। না হইলে মীরগঞ্জের বাজারে দিনদুপুরে নিমু সাহার বিলাতী কাপড়ের বস্তা জোর করিয়া পোড়াইবার কাজে অনিলই ছিল পাণ্ডা। আজ সেই অনিল স্থপারিণ্টে-ডেণ্ট অব এক্‌সাইজ হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই—দেশী সিল্কের স্থানে এখনও ললিতা তাহার বাড়িতে ইতালিয়ান সিল্ক আনে নাই—ললিতা বনলতার মত ফুজি সিল্কের ব্লাউজ পরিতে পায় না, যদিও ফুজি সিল্ক তাহার চোখে বেশ লাগে—'হাউ ফাইন!'

অনিলকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেই একটা ব্যবস্থা হইবে।

অনিল শুনিল। তাহার সমস্ত মুখ দুর্ভেদ্য চিন্তার মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

সে ছেলেটা কোথায়? তার নাম না মণীশ মুখুজ্জে?—অনিল জিজ্ঞাসা করিল।

হ্যাঁ, সে এখন উত্তর-বাংলায় একটা গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তোর কাছে সে টাকা চাইলে কি ক'রে?

একটা চিঠি লিখেছিল—হাতে লেখাও চিনি। সেদিককার একজন ক্লাসের চেনা ছেলের নামে টাকাটা পাঠালেই সে পাবে।

কি নাম সেই ছেলেটার?

বিজন চৌধুরী। স্থনীল সত্য বলিতে ভরসা পায় না।

তোর খুব বন্ধু, না?

হ্যাঁ।

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া অনিল জিজ্ঞাসা করিল, মণীশের সঙ্গেও তোর বন্ধুত্ব ছিল?

ছিল।

খুব বেশি?

মন্দ নয়।

তোর পেছনে টিকটিকি লেগেছে নিশ্চয়—সাবধান।

অনিল আবার বাহিরের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

বাংলা দেশের বুকে নিজেদের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া দিয়া বর্ষণশেষ শুভ্র মেঘ পাহাড় বাহিয়া উঠিয়াছে—ফুটপাথের উপরে দাঁড়াইয়া অমিত তাহা দেখিতেছে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। নিচেকার ওই জন্তুর আকৃতি মেঘটা উপরে উঠিয়া ঘুমের দিকে অদৃশ্য হইতেছে—পিছনে দেখা যাইতেছে পুচ্ছচ্ছটা। তাহাও রূপান্তরিত হইয়া ত্রিফলাকৃতি হইতেছে।

সুনীল ধীরে ধীরে কহিল, তা হ'লে টাকাটা আজই দেবে কি? আমি বরং অন্য নামে বিজনকে পাঠাব।

অনিলের মুখে একটু প্রসন্ন হাসি ফুটিল: ক্ষেপেছিস! ও ফাঁদে পা দিয়েছিস কি শেষ হবি। ও কোনও 'স্পাই'-এর কাজ, তোকে ধরাবার মতলব।

সুনীল তর্ক করিতে লাগিল। অনিল প্রথমটা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে লাগিল যে, টাকা পাঠানো পরম মূঢ়তা হইবে। খানিকক্ষণ পরে একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, যা বুঝিস না, তা নিয়ে তর্ক করিস না। এসব ক্ষ্যাপামি ও বোকামিতে জড়িয়ে পড়তে পাবি না।

টেনিস-র‍্যাকেট হাতে লইয়া অনিল স্যানাটোরিয়ামে খেলিতে চলিয়া গেল, কিন্তু মুখ তাহার চিন্তাক্লিষ্ট। আজ সে সেটের পর সেট হারিতে লাগিল। মিসেস ঘোষ ও মিস বোস তাহাকে পরিহাস করিতেছে।

লুই জুবিলি স্যানাটোরিয়মের সেই বেঞ্চগুলি যেন অমিতের চোখে ওই পার্কের বেঞ্চগুলি—এত কাছে। ওই যেন সেই অনিল।—মিস্টার দত্ত, মিসেস দত্ত নেই; আর আপনি একেবারেই আউট অব ফরম। তিনি বুঝি লেবং গেছেন? না, জলাপাহাড়?

না, আপনার ভাই ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গেছেন বটনিকাল গার্ডেনে?

কিন্তু ললিতাও সেদিন কোথাও যাইতে পায় নাই। সুনীল মুখভার করিয়া বসিয়া আছে; ঘরের আর-এক দিকে মেঝের দিকে তাকাইয়া শাল-গায়ে বসিয়া আছে দেবব্রত। ললিতা বার বার পীড়াপীড়ি করিল, জামা-কাপড় লইয়া উহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু উহারা আজ বেড়াইতে বাহির হইবার নাম করে না। মিছামিছি ললিতা পোশাক করিয়াছে আজ, সে উহাদের লইয়া সরকার সাহেবের বাড়ি বেড়াইতে যাইবে। সেখানে গান গাহিবে,

গান শুনিবে—অনেক আশা করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু উহারা এমন কুড়ে! নড়েও না! মণীশের গায়ের শালটা এক টান দিয়া ফেলিয়া দিতে দিতে ললিতা বলিল, আপনি উঠুন তো দেবব্রতবাবু।

'দেবব্রত'-মণীশ মৃদু হাসিয়া বলিতে গেল, থাক বউদি, আজ আমি ভাল নেই।

ভাল নেই আবার কি?—বলিয়া ললিতা তাহার কোলের উপরস্থ বালিশটা ধরিয়া টান দিল। হঠাৎ দেবব্রত-মণীশের কোমরের এক দিকে কি একটা জিনিস চকচক করিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, ওটা কি? মাদুলি নাকি? অত বড়?

তড়িৎস্পৃষ্টবৎ মণীশ লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের এক প্রান্তে চলিয়া গেল। ললিতা হাসিতে হাসিতে বলিল, দাঁড়ান, দেখি ওটা কি!

মণীশ ঘর ছাড়িয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। সুনীল হঠাৎ বিরক্তির স্বরে বলিল, কি করছ ছেলেমানুষি বউদি!

তাহার কথার ঝাঁজে ললিতা থমকিয়া তাকাইল। নিস্তব্ধ।

মণীশ দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, সুনীল, আমি ম্যালের দিকে গেলাম, সেই বেঞ্চটায় থাকব। এক ঘণ্টার মধ্যে আসা চাই। আর না হলে আসার দরকার নেই।—বলিয়াই মণীশ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ললিতা বিস্মিত হইয়া কহিল, কি ব্যাপার, ঠাকুরপো?

সুনীল কথা কহিল না।

ললিতা দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতা কহিল, আমি কি অন্যায় করেছি, দেবব্রতই বা কেন অমন ক'রে বেরিয়ে গেল, তুমিই বা কেন অমন চটলে? মাদুলি নিয়ে তো আমি ঠাট্টাও করি নি। আমার বাবারও তো হাতে বড় একটা মাদুলি আছে—এক সাধু দিয়েছিলেন।

চোখের জল নিঃশেষ হইল কথার ঝরনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

ললিতা এমনিই বটে—এমনিই ছেলেমানুষ। হাসিতে তাহার মোটেই দেরি হয় না। একটু চপল, একটু অগভীরচিত্ত। কিন্তু অমিত তাহাকে মন্দ বলিতে পারে না। তাহার সবই খেলা, সবই স্পোর্ট। সে কিছুই বুঝে না, বুঝিবার দরকারও দেখে না। গান, ছবি, ফুর্তি—ইহাই তাহার স্বভাব, স্বধর্ম। না, অমিতের চোখে ললিতা বেশ মেয়ে, তবে একটু superficial, আজ অমিত তাহা বুঝিতেছে। কিন্তু ললিতাকে তাহার ভাল লাগে—কাহারই বা ভাল না লাগে ললিতাকে?

সুনীল তখনও নিরুত্তর। সুনীল দেখিতেছিল, ললিতার হাতের দামী ঘড়িটি—হীরের ব্রেস্‌লেটের মধ্যে একখণ্ড ছোট্ট মহামূল্য পাথর। শ' পাঁচেক হইবে বোধহয় এই ঘড়িটুকুর দাম।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, কথা বলছ না যে?

আমায় পঁচিশটা টাকা দাও তো। কাল একবার দেবব্রতকে নিয়ে কার্সিয়াং ঘুরে আসি। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর একটু বিশেষ চেনা। দুদিন ধ'রে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছটফট করছে। দেখা না করতে পেয়ে অমন গম্ভীর হয়েছে। কাল একবার ওকে নিয়ে আমি কার্সিয়াং যাব।

ললিতার মুখে কৌতুকের পরিহাসের হাসি ফুটিল। তৎক্ষণাৎ টাকা বাহির করিয়া দিল। সুনীল টাকা লইয়া জামা-কাপড় পরিল। বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় ললিতা কহিল, বাঃ! বেশ লোক তো! আমি যাব না! আমাকে যে এখন আর ডাকছও না!

তুমি আজ থাক বউদি, আমি দেবব্রতকে শান্ত ক'রে নিই।

আমিও যাই না? ঘাট মানব, বলব, 'মশায়, আপনার পরিচিতা সেই অ-দেখা রূপসীকে না জেনে যে মর্মপীড়া দিয়েছি, তার জন্যে অনুতপ্ত! আই অ্যাপলজাইজ আনকণ্ডিশনালি।'

হাস্যপ্রিয়া, লাস্যময়ী তরুণী—মন তাহার যেন শরতের হাল্কা মেঘ—রৌদ্রে রঙ ধরে, কখনও হঠাৎ একটু অশ্রু গলিয়া পড়ে, আবার চোখের জলের মধ্য দিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। ললিতা নয়—অমিত যেন দেখে—সম্মুখে দার্জিলিঙের শাদা লঘু মেঘখণ্ড।

রাত কাটিয়া গেল। মণীশকে অনেক বুঝাইয়া সুনীল বাড়ি লইয়া আসিয়াছিল। ললিতা কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এই কথা কি মণীশ বিশ্বাস করে? পিস্তলকে সে মাদুলী বলিয়া ভুল করিবে, এত কাঁচা মেয়ে? সারারাত তৈয়ারি হইয়া মণীশ বিছানার উপরে বসিয়া রহিল—কিছুতেই শুইবে না, ঘুমাইবে না। পাহাড়ের নিস্তব্ধতাই যেন চাপিয়া আসিতেছে।

সকালে ললিতা চায়ের জন্য ডাকিতে গেল। অনিল টেবিলে নাই। তাড়াতাড়ি চা শেষ করিয়া সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। অবস্থাটা নূতন—ললিতারও মুখ একটু গম্ভীর। সুনীলের ভাল লাগিতেছে না। বলিল, দশটায় কিন্তু আমরা কার্শিয়াং যাচ্ছি, দাদাকে বলেছ তো? তার পূর্বে তিনি ফিরবেন বোধ হয়?

ললিতা কহিল, বলেছি। কিন্তু ফিরবেন কি না কিছুই বলেন নি।

কখন কার্শিয়াং থেকে ফিরবে তোমরা?—ললিতা জিজ্ঞাসা করিল।

রাতের গাড়িতে—না হয়, কাল। তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না।

ললিতা বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। অন্য দিন ললিতা এরূপ কথার উত্তরে রাত্রিতেই ফিরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, প্রতিশ্রুতি আদায় করিত, শেষে ভয় দেখাইয়া শাসন করিত। আজ সে একটু গম্ভীর ও অন্যমনস্কা।

ললিতাকে গম্ভীর হইলে কেমন মানায়?—অমিতের ভাবিতেও কৌতূহলের উদ্রেক হইল।....একটা রাঙা চঞ্চল পাখি—গাছের ফাঁকে ফাঁকে পলাইয়া বেড়ানোই তাহার স্বভাব—সবুজ পত্রান্তর হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া লোককে পাগল করিয়া তোলে।....হঠাৎ সে ডাক ভুলিয়া গেল, নাচ ছাড়িয়া দিল, নিস্তব্ধ নির্বাক পরম বিজ্ঞ হইয়া বসিল গাছের ডালে.... ললিতা গম্ভীর হইয়াছে।

এক ফাঁকে স্থনীলকে ললিতা শান্তভাবে আসিয়া কহিল, আমাকে সঙ্গে নেবে? একবার দেখে আসতুম তোমার বন্ধুর বান্ধবীকে।

স্থনীল কহিল, পাগল!

ললিতা আরও দুই-একবার অনুরোধটি জানাইল; তারপর আবার চলিয়া গেল, দেখে আসি, তোমাদের খাবার যেন আবার নষ্ট না হয়।

খাবার আবার কেন?

যাইতে যাইতে ললিতা বলিয়া গেল, শুধু রূপসুধায় না হয় তোমার বন্ধুর পেট ভরবে, কিন্তু তোমারও কি তাতেই ক্ষুধা মিটবে?—পুরানো হাসির একটু ঝলক খেলিয়া গেল ঘরে।

এই তো ললিতা! কিন্তু ইহা সেই শুভ্র, পরিপূর্ণ হাসি কি?

হাসি যেন মানুষের মনের ছবি, মানুষের সত্তার দীপ্তি। অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, শৈলেনের হাসি আজ দেখিলে তো? কেমন আত্মতৃপ্তির হাসি—যেন ক্ষুদ্র গর্ব ও ক্ষুদ্র 'সাক্‌সেস্‌' তাহার প্রত্যেকটি রেখায় রূঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। অথচ শৈলেনের হাসি একদিন ছিল গভীর আনন্দের; স্থূল আত্মসন্তুষ্টির নয়। ইহার অপেক্ষা স্থহৃদের হাসিতেও সৌন্দর্য বেশি। সহজ, মনোযোগী, শিল্পানুরাগী, স্বচ্ছন্দ, আরাম-প্রিয় স্থহৃদ; তাহার হাসিও তেমনই—তীক্ষ্ণ নয়, সহজ, বন্ধুবৎসল। সত্যি, হাসিতে মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপ আশ্চর্যরূপে ঠিকরাইয়া পড়ে, চুইয়া

বাহির হয়, শুভ্র শঙ্খধবল হইয়া দেখা দেয়, অপূর্ব আলোক বিকীর্ণ করে। শুধু হাসিতেই বা কেন? কথায়, চলায়, ভ্রূভঙ্গে—মানুষের সত্তা এই সব বহিরাবরণের মধ্যেও তাহার ছাপ রাখিয়া দেয়। রাজনারায়ণ বসুর হাসি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাসি···গোরার সেই উচ্চ হাসি···এইজন্যই কি হাসি একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য? মানুষেরই বোধহয় নিজস্ব সত্তা আছে, অন্য জীবের সম্বন্ধে সে প্রশ্নই উঠে না। তাই, man is a laughing animal—মানুষই হাসিতে জানে।····এ কথা কোথায় আছে? Leviathan-এ?···সব মানুষ কি হাসিতে জানে? পিউরিটান অধ্যাপকের হাসি মনে পড়ে? তাঁহার ছাত্ররা রেস্টুরেণ্টে যে বস্তু খাইতেছে তাহার নাম 'ডেভিল'। "They were eating Devils!" বেবুনের মত মুখবিকৃতি—এই তাঁহার হাসি। হাসিতে জানেন রবীন্দ্রনাথ —অপূর্ব-সুন্দর, জ্ঞান-তীক্ষ্ণ, মধুর, বুদ্ধিমার্জিত কৌতুক। কিন্তু বড় মাপা, বড় মার্জিত, নিক্তির ওজনে স্থিরীকৃত। No broad laugh of humanity। তাহা বরং গান্ধীজীর মুখে আছে—half-angelic, half-idiotic laughter। বের্গসঁ বলেন, জীবনের গতিবেগ যেখানে ব্যাহত হইতেছে, সেখানেই প্রাণধর্ম হাসিরূপে উথলিয়া উঠে।···কিন্তু কেহ কেহ কত অকারণে হাসে, তাহা কি নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ?···সুরো যখন হাসিত তখন কি বোকামি ধরা পড়িত? আর ইন্দ্রাণীর হাসি? সেই অতি লোভনীয় কমনীয় হাসি, যাহাতে মনে হয়, যেন সে আত্ম-বিমুগ্ধ—তাই কি পৃথিবীও সে-হাসিতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে? কিন্তু সত্যি, এ কি হাসি ইন্দ্রাণীর? আত্মজয়ের হাসি ইহা? 'কে বলিবে আমি আহত, এই দেখ, আমি সুন্দর শোভন কমনীয়, মধুর!' এ কি আত্মজয়, না, পৃথিবী-জয়? না, অমিত জানে, এ হাসি আত্মছলনার—পৃথিবী-ছলনার। অতি সচেতন ইন্দ্রাণীর এ হাসি, আত্মসচেতন। কিন্তু তথাপি তেমনই স্বাভাবিক, শোভন, মধুর; একটু লাস্যের আমেজ-মাখা,

পরিমার্জিত ; ইন্দ্রাণীর অন্তরের ভাষা—যে ভাষা তাহার নিজস্ব রূপ ইন্দ্রাণীর অবস্থাচক্রে আর পাইয়াও পায় না।...

না, হাসি ইন্দ্রাণীর স্বভাব নয়—তাহা ললিতারই নিজস্ব। হাসি ছাড়া ললিতা তো চলিতেই পারে না। ললিতার কথার গতি ঠিকরাইয়া উঠে হাসিতে, কথা হাসিতে ঠেকিয়া বাধা পায়—না, বাধায় সে-কথা হাসি হইয়া ঝরিয়া পড়ে—পুরাপুরি কথারূপেই আর ফুটিতে পায় না। ললিতার মুখে সেই সকালে হাসি ফুটিতে চাহিয়াও ফুটিতে পায় নাই—ক্ষীণ ঝলকে দেখা দিয়াছে। 'শুধু রূপসুধায় না হয় তোমার বন্ধুর পেট ভরবে।' অতি স্বাভাবিক হাসি, ললিতার সত্তার ধর্মই হাসি—হঠাৎ বাধা দেখিয়া আপনার সহজ উচ্ছলিত রণন্ হারাইয়া ফেলিতে ফেলিতে যেন সে-হাসি বাজিয়া উঠিতে চাহিতেছিল সেই সকালবেলাকার এই একটিমাত্র পরিহাসে।

পনেরো মিনিট পরে আবার ললিতা ফিরিয়া আসিল, শোন ঠাকুরপো, কাল বিকেলে তোমার দাদার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছে?

সুনীল কোন কথাই হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে না।

কে তাঁকে তোমাদের নামে লাগিয়েছে বলতে পার? সেই মিসেস ঘোষের বাড়িতে যে মেডিকেল কলেজের বাঁদর ছোঁড়াটা থাকে, সে কি?

সুনীল একটু শঙ্কিত হইল, কি হইয়াছে?

কি ক'রে জানব? আমার তো ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল—তিনি চা না খেয়েই বেড়াতে বেরিয়েছেন। দেখ না ঢঙ! কেমন অশোভন! বাড়িতে গেস্টও তো আছে।

তোমাদের কি নিয়ে ঝগড়া হ'ল আমি কি ক'রে বুঝব?

উনি কি সব ভয়ের কথা বলেন।

খানিক পীড়াপীড়িতে জানা গেল, অনিলের কেমন সন্দেহ হইয়াছে,

দেবব্রতবাবু ভাল লোক নহেন। প্রথম শুনিয়া ললিতা হাসিয়াই খুন। 'যেন তুমি বড় ভাল লোক! তবু যদি তোমার মিসেস সেনের প্রতি মনোভাবটা না জানা থাকত!'

মিসেস সেন—একদা তন্বী দীর্ঘাঙ্গী সুগৌরবর্ণা রমা—'এখন মুটিয়ে উঠেছে, হয়েছে মিসেস সেন,'—অমিতদের দুই ক্লাস মাত্র নিচে পড়িত। কলেজের দিনে অমিত অনিল তাহাকে লইয়া 'ডুয়েল' লড়িত; বেচারী রমা তাহার কি জানিত? অমিতের এখনও ভাবিলে হাসি পায়।... ললিতাকে অমিতই এই কথাটা বানাইয়া রঙ ফলাইয়া সেই কবে বলিয়াছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা চুকিয়া গেল না! অনিল ক্রমশই গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি দেবব্রতকে চেন না।

ললিতা চিনে না, আর চিনে অনিল? এই পাঁচ দিন ললিতাই দেবব্রতকে দেখিয়াছে, অনিল তো ঘুরিয়াই বেড়ায়। তবু কিনা অনিল বলে, 'তুমি তাকে চেন না।'

কি খুঁতখুঁতে মন, কি বিশ্রী সন্দেহ। বলতে হয়, তুমি বল না তাকে যেতে—। তাই বলবে? বেশ, আমিও ব'লে রাখছি—ভদ্রলোককে যদি অমন অপমান কর, তা হ'লে কালই আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে মার কাছে যাচ্ছি।

অনিল তবু শুনিতে চায় না—নানারূপে রাগ দেখাইল।

ললিতা অনেক দুঃখে, সঙ্কুচিত মনে, সুনীলকে সব কথা বলিল।

দাদার সন্দেহটা কি বিষয়ে, তুমি কি তা জান?

সে আমি বিশ্বাস করি না। বলেন—'ওরা ডাকাতি করতে পারে, হয়তো বা খুনও করবে।' সে কি ক'রে হয়, বল তো? ভদ্রলোকের

ছেলে ডাকাতি করবে কেন? আর অমন যার চেহারা, সে খুন করতে যাবে? দেখ তো তোমার দাদার বুদ্ধি! মানুষটাকে দেখেও অমন ভুল করে—চোখ থাকলে?

সুনীল একবার বলিল, হয়তো নিজের জন্যে না করতে পারে—

তবে কি পরের জন্যে চুরি করবে, খুন করবে?—ললিতা হাসিয়া উঠিল—তুমি যে বুদ্ধির দৌড়ে তোমার দাদাকেও ছাড়িয়ে যাও। চুরি আবার পরের জন্য কে করে? এমন বোকা আবার কে আছে? চুরি করবে নিজে, টাকা দেবে পরকে?

কেন? তোমাদের রবিন হুড—সেদিনও তো ফিল্ম দেখে এলে।

বাঃ, সে চোর হতে যাবে কেন? সে বীরপুরুষ—গরীব-দুঃখীর বন্ধু। তার মত হ'লে তো সে আমাদের পূজোর যুগ্যি।

কিন্তু আইন বলবে, সে চোর।

আইন-ফাইন তোমরা জান বাপু, আমি জানি না। তা তোমরা তো আর কেউ বনে গিয়ে রবিন হুড হও নি, তার জন্যে তর্ক ক'রে লাভ কি?

সুনীল একটু নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা বউদি, কেউ যদি দেশের জন্যে এসব করে?

ললিতা জিজ্ঞাসু মুখে বলিল, কি করে? বুঝলাম না।

এই মনে কর খুন, ডাকাতি, চুরি। দেখেছ তো, যুদ্ধে কি না লাগে? টাকাকড়ি চাই, নাহলে যুদ্ধ চলবে কেন—

ও! আই হেট, আই হেট তোমাদের যুদ্ধ। সেই বইটা তো পড়েছ—অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট?

কিন্তু শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, প্রতাপসিংহ—এঁরা দেখ মানুষ খুন করেছেন, টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছেন; এঁরা কি?

মহাপুরুষ। তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছেন।

সুনীল কহিল, কেউ যদি আবার দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে চায়?

বেশ তো, করুক না।

টাকা চাই যে।

চেয়ে নাও। চাঁদা তোলো।

জানাজানি হবে, ধ'রে অমনই জেলে পুরবে।

বাঃ জেলেও যেতে ভয়? আবার হবেন শিবাজী!

সুনীল তথাপি বলিল, তুমি 'মাদার' পড়েছ গর্কির। মনে আছে? কেউ যদি তেমনভাবে গরিবের জন্যে কাজ করে—

আনন্দে ললিতার চোখ নাচিয়া উঠিল, কেন করছে না ঠাকুরপো? করবে? এস তবে, আমরাই না হয় শপথ করি—আমি তোমার সঙ্গে থাকব—পারবে তুমি?

সুনীল হাসিয়া ফেলিল, যদি বলি, ডাকাতি কর, খুন কর? তখন পেছপা হবে না তো?

বাঃ! সে তুমি বলবে কেন? 'মাদার' তো কই কিছু চুরি করতেন না। কেবল সবাইকে ভালবাসতেন, কাউকে হিংসা করতেন না। সবাইকে বলতেন—'তোমরা জাগ, এস, বেঁচে ওঠ!' দুঃখকষ্ট তিনি বুক পেতে নিয়ে তাদের বুক তুলে নিতে চান।

উৎসাহে ললিতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—কথা ফুটিল। সুনীল তাহা দেখিতে লাগিল। ললিতা প্রশ্ন করিল, আমিও কি তেমন কাজ করতে পারব না ঠাকুরপো!

সুনীল মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারবে—যদি লোক পাও। আপাতত আমাকে তো তিন শো টাকাই দিতে পারলে না।

বলেছি তো, অফিস খুললেই টেলিগ্রামে পাঠাব।

বেশ, মনে থাকে যেন, তখন যেন আবার অন্য কোন আপত্তি মনে পড়ে না।

তুমি আমাকে তেমন ভাব নাকি ?—আবার ললিতার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

অমিতের বাস মোড় ঘুরিয়াছে—পার্ক সার্কাস। সব নতুন বাড়ি। ইহারই মধ্যে সাতকড়ি নূতন বাড়ি করিয়াছে।

বাস থামিল। অমিত নামিয়া পড়িল।—নূতন রাস্তায় মিনিট তিন-চার চলিলেই সাতকড়ির বাড়ি। বাড়ীওয়ালা বড়ঘরের ছেলে সাতকড়ি। ওকালতি ও অ্যাটর্নিশিপ পড়িয়া মানুষ হইয়াছে। খুব ভাল ছেলে ছিল না—কিন্তু চতুর সে বরাবরই।

সাতকড়ির নিকট ভরসা কম। বাজে ইয়ার্কি করবে—টাকা দিবে না। তবে যদি অমিতের পিতার নামের সেই টাকাটা আদায় হইয়া থাকে—যদুবল্লভ চাটুজ্জের তো ডিক্রী অনুযায়ী টাকাটা মাসখানেক আগেই কোর্টে জমা দেওয়ার কথা। তাহা হইলে এতদিনে সাতকড়ি তাহা তুলিয়া লইয়াছে—আজ পাইলে ভাল হয়। শতখানেক আপাতত হইলে বাড়ির খরচটা চলিয়া যাইবে। কিছু সুনীলকেও দেওয়া যাইবে। …সুনীল গেল কোথায়? পথে পথে ভাসিয়া বেড়াইবে! কতদিন আর এভাবে দিন চলিবে,—সেই দার্জিলিং ছাড়া অবধি—

অমিতের চিন্তাস্রোতে আবার সেই পর্বটি জাগিয়া উঠিল।

দাদা তো এলেন না? টাইম?

সাড়ে-ন'।—ঘড়ির দিকে তাকাইয়া ললিতা বলিল।

বেরুতে হয় তবে!—সুনীল জানাইল।

চল, আমি স্টেশন পর্যন্ত যাব—তুলে দিচ্ছি। দেখুন দেবব্রতবাবু, আসছে রোববার যেন মিস্টার মজুমদারও আসেন—আমার হয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন জানিয়ো সুনীল। অবশ্য মিস মজুমদারকেও বলবে, তা হ'লে আর দেবব্রতবাবুকে কার্শিয়াং ছুটতে হবে না।

স্টেশনের ঘণ্টা বাজিল। সুনীল বলিল, এঃ! বউদি,—যাঃ! বড্ড ভুল হয়েছে। ঘড়িটা রয়েছে বাড়িতে তোমার টেবিলের ওপর। আর তো ঘড়িও নেই। কিন্তু একটা ঘড়ি না থাকলে যে বড় অসুবিধে—

ললিতা তাড়াতাড়ি নিজের হাতঘড়ি খুলিয়া ফেলিল।

এ যে লেডিজ রিস্টওয়াচ!—হাত বাড়াইয়া সুনীল বলিল।

তোমার মত বীরপুরুষের রিস্টেও মানাবে। দাও দেখি হাতখানা। —ললিতা ঘড়িটা সুনীলের হাতে পরাইয়া দিয়া বলিল, ওঃ! যেন মর্কট-ভুজে মণির মালা!

বলিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিল। গাড়ি ছাড়িল।

দার্জিলিঙের পাহাড় মিলাইয়া গেল—অমিতের সম্মুখে এই যে সাতকড়ির বাড়ি।

…সাত দিন পরে একটা গুণ্ডার মারফৎ সে ঘড়ির তিন শত টাকায় ব্যবস্থা হইয়া গেল—অমিত তাহাও জানে।

তখন হইতেই সুনীল ভাসিতেছে—অমিতের চোখের সম্মুখে।… একটা আগুনের ফুলকির মতো ইতিমধ্যে মণীশ নিবিয়া গেল।…বিজয় ছাইচাপা পড়িয়াছে। রহিয়াছে শুধু সুনীল—বাত্যান্দোলিত অগ্নিশিখার মতো লেলিহান।

৬

সাতকড়ির বসিবার ঘর এখনও খালি। সে নিচে নামে নাই। ঘুম হইতে উঠিয়াছে কি?

আবি আসবেন, বাবুজী। বৈঠিয়ে।....আচ্ছা খবর দেও, বলো অমিতবাবু।

...সুনীলকে আঁটিয়া উঠা অসম্ভব হইতেছে। উপায় নাই—একবার যদি সেই ভবঘুরেদের সঙ্গ সে পায়—কি করিয়া উহারা পরস্পরের খোঁজ রাখে? না, এ পণ্ডশ্রম। ইন্দ্রাণীকে অমিত সেদিন বলিয়াছিল, ইন্দ্রাণী, এ তোমার পথ নয়।

যা কারুর পথ নয় সে পথই আমার, অমিত।

ইন্দ্রাণীও পা বাড়াইয়া দিয়াছে। কথা সে শুনিবে না; মনে করে, বুঝি অমিত তাহাকে বিশ্বাস করে না।—এই দুর্গম পথে, উদ্দাম-গতি ইন্দ্রাণী, তুমি প্রাণের আবেগে, আদর্শের আগ্রহে, আত্মদানের অহঙ্কারে কোথায় চলিয়াছ? দেখ, দেখ, চোরাবালু তোমার সম্মুখে।...চোরা-বালুতে অবসান—সুনীলের সেই অবসান, অমিত, ঠেকাইতে চাও তুমি? তুমি চাও—পথে উহারা অগ্রসর হউক, শেষ হউক—চোরাবালুতে কেন? কিন্তু বৃথা অমিত, বৃথা। পারিবে না, কিছুতেই পারিবে না ইহাদের গতিরোধ করিতে। ইহারা শেষ হইতেই চায়।...

কাচের 'ডুম'টার উপরে একটা বড় পতঙ্গ মাথা ঠুকিতেছে—সে আগুনকে চায়। লেলিহান বহ্নিশিখা তাহাকে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয়। মূঢ় 'ডুম', শুভ্রপ্রাণ 'ডুম', বলে—যাস নে, যাস নে।

...মাথা খুঁড়িতেছে পতঙ্গটা...বার বার মাথা খুঁড়িতেছে। তারপর একবার সব বাধা ডিঙাইয়া একেবারে আগুনের মধ্যে পথ খুঁজিয়া লইল। অপূর্ব উন্মাদনা! নিমেষকাল ছটফট, ছটফট ছটফট। শেষে পোড়া কুঁকড়াইয়া-যাওয়া পতঙ্গদেহ তেমনই পড়িয়া থাকে।

কে জানে, কেন এই অগ্নিদীক্ষা? এই baptism of fire? —কথাটা বোধ হয় কার্লাইলের।...পতঙ্গের সূক্ষ্ম স্নায়ু-তন্ত্রীতে আলোর স্পন্দনেই এই মৃত্যুতৃষ্ণার জন্ম? নিতান্তই একটা স্নায়বিক উত্তেজনা? মানুষও পতঙ্গেরই মত? তাহাদের মনের পক্ষতলে—দেহের নাড়ীতে —কি মৃত্যুর শিহরণ এমনই একটা স্নায়ুগত উন্মাদনা জাগায়? না হইলে কেন উহারা এইরূপে ছোটে সমস্ত জানিয়া, সমস্ত বুঝিয়া —এই অর্থহীন আহুতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াও? হয়তো সমস্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্য হইতে যে আঘাত উহাদের স্নায়ুমণ্ডলে পৌঁছায়, এই ক্ষিপ্ততা তাহারই প্রতিঘাত—পাভ্লোভের ব্যাখ্যাত সেই কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্‌স। ইহার রূপ এই, ধর্ম এই, নড়চড় হইবার উপায় নাই। বৃথা উহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা।—কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্‌স—প্রকৃতিনির্ধারিত পরিণাম? মানুষ কি একটি যন্ত্র মাত্র?

উল্টাপথের যাত্রী ফ্রয়েডিয়ানরা কিন্তু তাহা মানিবে না। অথচ তাহাদের বক্তব্যটাও প্রায় ইহারই কাছাকাছি—ডেথ উইশ—মরণেচ্ছা বাঁচিবার ইচ্ছারই ও-পিঠ, দুই বিরোধী বাসনার দ্বন্দ্ব আর জীবনেচ্ছার পরাজয়। কেন? ফ্রয়েড বলিবেন—মনের চিকিৎসা কর, উহাদের মৃত্যু-যজ্ঞ শেষ হইবে। উহাদের মনই বিকারগ্রস্ত। ধন্য ফ্রয়েড! বুঝিবার অবকাশ হয় নাই যে, মন জিনিসটারও সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভাঙাগড়া হয়; আর যেখানে সমাজই বিকারগ্রস্থ সেখানে ব্যক্তির মন, জাতির মনই বা বিকৃত হইবে না কেন?...

অমিত জানে সুনীলের ভাবিবার অবকাশ নাই—মানব-ইতিহাসের কোন্ পাতা হইতে কোন্ পাতার দিকে ইহারা অগ্রসর হইতে চায়, কঠিন সেই পথে চলিবার পক্ষে কোন পাথেয় প্রয়োজন।...

কিন্তু অপরাধ সুনীলদেরই বা কি? ইতিহাসের অধ্যাপক জানেন না, সমাজতত্ত্বের ছাত্ররা খুঁজিতে চাহেন না, অর্থনীতির পণ্ডিতেরা তলাইয়া দেখেন না—বর্তমান সমাজ কোন্ ভাঙা ভিত্তির উপর গড়া! ইহার পরে দোষ দিব এই শিশুদের? সমাজের দেহান্তরের সূত্রটি কেহই উহাদের চোখে ফুটাইয়া তুলিল না, তাই না শিশুর মত ইহাদের এই বিদ্রোহ।....

'মাপ করিস, অবস্থার চক্রান্তে আমার মন বেঁকে-চুরে যাচ্ছে।' —মণীশের কথা। পাব্লোভও কি তাহাই বলিতেন। তবে তাঁহার ব্যাখ্যা মনের অস্তিত্বও মানে না। একেবারেই জড়বাদী।...ফ্রয়েড বলিবেন —'অবস্থার চক্রান্তে' নয়, সেক্‌স রিপ্রেশনে।

হইবেও বা। কিন্তু অমিতেরই তো এই দেবাদিদেবের সম্বন্ধে ভাবিবার সময় নাই। আর উহাদের? উহাদের মনে সেক্‌স-জল্পনা পথ পাইবে কি করিয়া? অমিত মনে মনে হাসিল—'যুক্তি শোনো,— ভাবি না ব'লে আমিও আর শুকদেব হচ্ছি না। ওরাও হয় না। অতএব সেক্‌স-জল্পনাই আমার ও ওদেরও মনকে বিকৃত করছে।'...

বেশ চমৎকার যুক্তি। সেক্‌স, সেক্‌স, সেক্‌স—এ যেন লিঙ্গপূজার স্তব।...

সাতকড়ির বইয়ের আলমারিগুলি কী সুন্দর! অথচ ও হয়তো জন্মেও বই পড়ে না—বাদে আইনের বইগুলি। সাতকড়ির আসিতে দেরি আছে কি? একবার বইগুলিই দেখা যাউক।

অমিত বইয়ের কেসের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল।

ইতিহাস। ও, নূতন ইউনিভার্স্যাল হিস্টরির আট ভল্যুম। তোমারও যে সে বইয়ের ইন্‌স্টল্‌মেণ্ট বাকি পড়িতেছে অমিত! এবার টাকা পাইলেই দুই মাসের টাকা দিও,—আর লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটাও, ফাইন সুদ্ধ। কোথায় টাকা পাইবে?—গুচ-এর যুদ্ধেতিহাসের নূতন খণ্ড কেনা হয় নাই, আর টয়েন্‌বি'র সার্ভে অব ইণ্টারন্যাশানাল অ্যাফেয়ার্স নূতন খণ্ডের দাম এখনও বাকি। দোকানে বই আসিয়া পড়িয়া আছে। দোকানী তাগিদ দেয়; তুমি তাই পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতেছ; কারণ টাকা নাই।…কিনিয়াই বা লাভ কি? এমন ঝকঝকে তকতকে…বুক-কেসে না রাখিতে পারিলে বইগুলি ধিক্কার দেয়, অপমানে বাঁকিয়া উঠে। না, আর বই কেনা নয়। মার্শ্যালের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো তবু…কবে…কখন? কি উপায়ে? এই সাতকড়ির টাকাটা পাইলে। মোট আট শো টাকা। কিছুটা যাইবে বাড়ির খরচ, কিছুটা না হয় মার্শ্যালের বইয়ের জন্য—কিন্তু কিছুটা সুনীলকে দিতেই হইবে তো।…

কেন সুনীল টাকা চায়? জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, 'দিও না।' কিন্তু না দিলে চলিবে কেন? অনিলের মত তো অমিত বলিতে পারিবে না—'না'। পারিবেই বা না কেন? অনিল কি সুনীলকে কম ভালবাসে? সুনীলের বড়দাদা, মা, বড় বউদি, ললিত', ইঁহারা সকলেই অমিতের অপেক্ষা সুনীলের বেশি শুভানুধ্যায়ী; তাহাকে বেশি স্নেহ করেন; তাহার জন্য টাকাও তাঁহারা অজস্র ঢালিবেন—যদি সুনীল তাঁহাদের কথা শোনে। তবে কেন অমিত মনে করে সুনীলকে টাকা দেওয়া উচিত? কথা সে না শুনিলেও দেওয়া উচিত?

অমিত আবার সুনীলের কথা ভাবিয়া চলিল, সে তো বাড়ির দিকে আর ফিরিবে না। কারণ অনিল তাহার সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা'

করিয়াছে। অনিল তাহা করিতে পারে? অমিত কিছুতেই এ কথা মানিতে চাহে না।

দার্জিলিং ছাড়ার এক মাস পরে ছোট শহরে দুপুরে ললিতাকে একটি ছেলে ডাকিতেছে। ঘুম ছাড়িয়া ললিতা উঠিল, জানালা দিয়া একবার বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটিকে দেখিল। অপরিচিত, তবে বালক।

আর বিচারের প্রয়োজন নাই, ললিতা তাহাকে ঘরে ডাকিল।

কাঁচা মুখ, একটু ভীতু দৃষ্টি। সসঙ্কোচে ইতস্তত তাকাইয়া ছেলেটি একটি নমস্কার করিল। তারপর কুণ্ঠিতভাবে কহিল, এই চিঠিটা—প'ড়ে আবার আমাকে ফেরত দেবেন।

সুপরিচিত হস্তাক্ষর—ললিতার মুখে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়াই নিবিয়া গেল। পরক্ষণে হাত কাঁপিতে লাগিল। বুক দুড়দুড় করিতেছে। সে বুঝিল না, পড়িয়া চলিল—'অফিস তো খুলেছে; টাকা কোথা? টেলিগ্রামে না হয় না পাঠালে; এই ছেলেটির হাতে টাকাটা দিলেই হবে। আর ঘড়িটার জন্য দুঃখ ক'রো না—তুমি তা করবেও না জানি। তবে শুনে খুশি হবে, জিনিসটা খুব ভাল কাজে গেছে।'

ছেলেটি আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই। চিঠিটা ফেরত লইয়া তৎক্ষণাৎ টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ললিতা বাধা দিতে গেল, ছিঁড়লেন যে?

তা-ই আদেশ আছে।

কার?

আবার উত্তর নাই। সুনীলের বাঁকা-বাঁকা হস্তাক্ষর,—সেই সুন্দর সম্ভাষণ, কৌতুকপ্রিয়তা, সবই ওই অক্ষরের ছাঁদে বাঁধা ছিল—ছিন্ন হইয়া গেল। ললিতার ইচ্ছা হইল, চিঠির ছিন্ন টুকরাগুলি কাড়িয়া লইয়া যত্নে তুলিয়া রাখে।

অমিত মনে মনে হাসিল—এই কি সেক্স কমপ্লেক্স? কাহার? ললিতার, না, স্থনীলের?…গ্লোরি টু ফ্রয়েড! যাক, সাতকড়ির আলমারিতেও তিনি আসিয়াছেন। ফ্রয়েড নহেন, হ্যাভলক এলিস্। সাতকড়ির বিজ্ঞাননিষ্ঠা অপূর্ব্ব। ভূগোল পড়ে না, জানেও না, মাথা-ব্যথাও নাই; কিন্তু যৌনবিজ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ। শুধু এলিস নন, আরও অনেক আছেন।

সেক্স…সেক্স…সেক্স।—অমিত মনে মনে হাসিল। আবার ভাবিয়া চলিল।

দুপুরের রৌদ্রে নিষ্প্রভ-নয়না ললিতা ভাবিয়া চলিয়াছে স্থনীলের কথা। ঘড়িটা সে অমন করিয়া না লইলেই পারিত। 'তবু নিয়েছে নিক, স্থনীল—সে নিয়েছে,—স্থনীল—স্থনীল।' ললিতার পক্ষে নামটিই যথেষ্ট।

তুমি কাল এস দুপুরে। আমার হাতে টাকা নেই, যোগাড় ক'রে রাখব।—দণ্ডায়মান ছেলেটির কথা মনে পড়িতেই ললিতা তাহাকে বলিল।

আবার স্থনীলের খবর মিলিল। মনে কথাটা চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইতেছে। ললিতার মন আনন্দে ও বেদনায় শিহরিত হইতেছে। হাজার হউক, স্থনীল তাহাকে ভুলে নাই। অনিলকে ললিতা বলিতে চায়—এক্ষুনি, এই মুহূর্ত্তে। এমন আনন্দের বার্ত্তাটা কাহারও কাছে না বলিলে আনন্দই যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু অনিল তখনও অফিসে।

পরদিন তেমনই দুপুরের রোদ। মিসেস দত্ত এই সময়ে পথে বাহির হইলেন। একবার মহিলা-সমিতির গৃহে যাইবেন। দূরে পথের মাথায় একটি ছোট ছেলেকে দেখিয়া কি কথা বলিলেন, পরক্ষণেই ভয়ে ত্রস্তপদে ছুটিয়া চলিলেন।

সুনীল অমিতকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছে, তোমার বন্ধু অমি'দা, শোন তাঁর কীর্ত্তি। বউদি বললেন—টাকা তিনি দিতে পারবেন না—দাদার নাকি এমনই অনেক ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে। চাকরি নিয়ে টানাটানি। যে ছেলেটা গিয়েছিল, তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পাকা ব্যবস্থা ক'রে ঘরে দাদা ব'সে ছিলেন। বউদি পথেই ছেলেটাকে সে খবর দিয়ে দেন—ফাঁদে আর শিকার পড়ল না। দাদা আর তাঁর পুলিস-বন্ধুরা বড্ড হতাশ হয়েছেন।

সুনীল হাসিতে লাগিল, এর পরেও নিশ্চয়ই ভ্রাতৃত্বের বাঁধনেই, তুমি বলবে, আমাকে ধরা দিতে, না?

অমিত জানে—সুনীলের এ বিচার যথার্থ নয়। অনিল দত্ত বড় জোর ছেলেটাকে ধরিয়া ধমকাইয়া দিত—পুলিসের হাতে কিছুতেই দিত না। কিন্তু সুনীলকে সে কথা বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। সে বুঝিবে না, মানিবে না, তাহার নিজের আত্মীয়দের সে অনাত্মীয় করিয়া না তুলিলে নিজেই স্বস্তি পায় না। এমনই দ্বিধাবিভক্ত মন ইহাদের···ইহাদের কেন, মানুষের।

সাতকড়ি রীতিমত সেক্‌স-সাইকোলজির ছাত্র। সে হয়তো বলিবে, সুনীলের মনের গোড়ায়ও সেক্‌স। অমিতের হাসি পায়···সেক্‌স··· সেক্‌স···সেক্‌স। বিজ্ঞানের নামেও সেক্‌স! সাতকড়িও রীতিমত বৈজ্ঞানিক; হয়তো ফ্রয়েডের বুলিও জানে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই জানে। আজকাল কে না জানে? না জানিলে সে বিকৃতমনাঃ—যেমন তুমি অমিত।

জুতার শব্দ হইল। সাতকড়ি আসিতেছে কি?

সাতকড়ি প্রবেশ করিল। গোল আলুর মতো গোল গাল দুটি হাসিতে একটু কাঁপিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ বেশিক্ষণ হয়

নাই। মাংসের স্থূলতা ও নিদ্রার জড়তায় মিলিয়া সে হাসি চাপা পড়িয়া গেল। সত্যই হাসি ব্যক্তি-সত্তার জ্যোতিঃরেখা—এক নিমেষের জন্য কথাটি অমিতের মনে আবার খেলিয়া গেল। কিন্তু ততক্ষণ দুইজনের কুশলপ্রশ্ন চলিতেছে। খাঁটি বিলাতী ক্রিকেট ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবির উপরে দামী শাল, তাহারই ফাঁকে দেখা যায় হীরার বোতাম। সোনার সিগারেট-কেস খুলিতে খুলিতে সাতকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, সকালেই যে! কি মনে ক'রে?

মনে আর কি করব, বল? অন্নচিন্তা, ব্রেড-প্রব্লেম। যদুবল্লভের সেই ডিক্রির টাকাটা তো জমা হয়ে গিয়েছে। তা তুলেছ বোধ হয়। টাকাটা তা হ'লে দাও—কোনরূপে গেল মাসের বাড়িভাড়াটা দিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে মুখরক্ষা করি। নইলে বড় জ্বালাতন করছে।

যদুবল্লভ চাটুজ্জে? হ্যাঁ, সে টাকাটা জমা হওয়ার কথা। তুমি যেও দেখি একবার অফিসে—দেখতে হবে কাগজপত্র।

তা হ'লে এখন দিতে পারবে না?

এখন?—সাতকড়ি হাসিয়া বলিল, না, তোমাদের কাণ্ডজ্ঞানই নেই। সে টাকা জমা হবে, সে টাকা তুলতে হবে; তারপরে তোমাদের দেওয়া—এ কি চাট্টিখানি কথা হ'ল, হে অমিতবাবু?

তা হ'লে কি আজ হবে না? কাল—কাল হবে?

গরজ বড় বালাই। কাল কি, হপ্তাখানেক বাদে খোঁজ ক'রো। ইতিমধ্যে অফিসে একবার যেও না। আমি না থাকি বুড়ো হরিবাবুকে একবার তাগিদ দিও। বরং তাঁকে পাঁচটা টাকা কবুল ক'রো—তেমন তাড়া থাকলে। দেখবে, দুদিনেই টাকা বের ক'রে আনবে। বুড়ো একটি আস্ত ঘুঘু। হাইকোর্টে অনেক টুর্নি-কৌঁসুলি চরিয়ে খেয়েছে। হাইকোর্টে টাকা দাখিল করা যেমন সহজ, বের করা তেমনি শক্ত হে ভাই। সে খবর তো জীবনে নিলে না। ভাব, বুঝি মাস শেষ হ'লেই

কলেজের মাইনে যেমন পকেটে এসে যায়, তেমনি পাওনার দিন এলেই টাকা লাফিয়ে মানুষের হাতে এসে পড়ে। বেড়ে আছ ভাই। তোমাদের দেখলে হিংসা হয়। পৃথিবীর কোন তোয়াক্কাই রাখ না।

কর্ক-টিপ সিগারেটটি ধরাইবার জন্য সাতকড়ি ঠুকিতেছিল; একবার কথা বন্ধ করিল, দিয়াশলাই জ্বালাইতে গেল।

অমিত কৌতূহলভরা মনে ভাবিতে লাগিল—'হিংসা হয়'—সাতকড়ির হিংসা হয় অমিতকে। ওই নধর সুপুষ্ট দেহ, গোল মাংসল গাল দুটি, সারা গায়ে যাহার চিন্তাহীনতার স্থাণু আয়েশ আঁকা, সে তোমাকে হিংসা করে—তোমাকে,—ময়লা, রোগা, রেখাঙ্কিত মুখ ও ললাট, চোখে যাহার অস্থির বিক্ষুব্ধ চিন্তা, সেই তোমাকে—অমিত!

সম্মুখে আলমারির কাচে রৌদ্রের আঁচ আসিয়া পড়িয়াছে—বই-গুলিও যেন হাসিতেছে। চমৎকার বাঁধাই, চমৎকার সাজানো, অক্ষুণ্ণ পরিচ্ছন্নতা। মোটা মোটা ভল্যুমগুলি, ঝকঝক করিতেছে। শৌখিন সংস্করণ স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির বইগুলি। ওরাও বোধ হয় হিংসা করে অমিতের ভাঙা আলমারির ধূলিভরা সস্তা বইগুলিকে!—সেই জীর্ণ-জর্জ্জর অক্সফোর্ড কীট্‌সকে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড-কেনা কেরির দান্তেকে!....

কিন্তু কিছু টাকা না হ'লে যে ভাই চলে না। হিংসাই যদি কর, দয়া করে ও বস্তুটির যোগাড় ক'রে দাও না!

কেন? টাকা দিয়ে কি করবে? বই কিনবে, না বেড়াতে বেরুবে? কোথায় যেন—ওর কি নাম?—খেজুরদহ না কি—সেই ছত্তিসগড়ে?—সেই যে গেছলে—কি একটা পুরানো মন্দির দেখতে? নামটা কি, বলইনা হে!

না হে, বেড়ানো নয়, ওসব অনেকদিন ঘুচেছে। এখন বাড়িভাড়াই না দিতে পারলে বেরিয়ে পড়তে হবে।

কেন? বাড়িভাড়ার অসুবিধাটা কি?

কিছুই না। বাড়িতে আছি, ভাড়া চায়, এই হ'ল বাড়িওয়ালার অপরাধ।

ক'মাস বাকি পড়েছে?

এক মাস তো হয়ে গেল। দু দিন দারোয়ান এসেছিল—আজ আবার আসবে, তাই স'রে পড়েছি।

মোটে এক মাস! গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। কোর্টে যাক, ঘুরিয়ে নাও। নাজেহাল হবে। দেখবে, আর অত তাগিদ সইতে হবে না।

লাভ কি? টাকাটা তো দিতেই হবে?

দেবে বই কি। তবে দারোয়ানের তাড়া খাবে না, তখন সে ব্যাটাই হবে তোমার তাঁবেদার।

সত্যই, অমিত পৃথিবীকে চেনে না। এই তো সহজ সাধারণ পৃথিবীর কথা। কিন্তু অমিত মুসড়িয়া যায়। কেন মনে করে, ইহার মধ্যে একটা গ্লানি আছে, একটা হীনতা আছে।....আচ্ছা, কেউ যদি বস্তির ঘরওয়ালার ভাড়া ফাঁকি দেয়···হোটেলওয়ালাকে ছলনা করে,—হ্যাঁ, বউদির ঘড়িটা ঠকাইয়া লইয়া পলায়—তাহাতে বুঝি গ্লানি থাকে না? অমিতের ভাবিতে হাসি পায়। কিন্তু সত্যই এই সব সত্ত্বেও সুনীলের জীবনে সে গ্লানির দাগ দেখে না—দেখে না বলিয়া বিস্মিত হয়। নিজের পক্ষপাতিত্বে নিজেকে উপহাস করে, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠে।

কি হাসছ যে? অসম্ভব মনে হচ্ছে কি?

না ভাবছি, কাজটা তো সহজ। কিন্তু বুদ্ধিতে তো কুলোয় না, সাহসও হয় না।

হয় না কেতাবী বিদ্যার জন্যে ও প্রফেসরি মূর্খতার জন্যে।

অমিত ভাবিতেছিল, বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? টাকা পাওয়া না যাউক, সুনীলের জন্য একটা বাড়ি খোঁজা তো দরকার। এখানে বসিয়া তাহা সম্ভব নয়। কোথায় সুনীলের জন্য স্থান করিবে?

অমিত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু সে তো অনেক দূর। এখন চাই কিছু টাকা। দেখি আবার বেলা হচ্ছে।—বলিয়া সে উঠিতে গেল।

ক্লাস ক'টায়?

সাতকড়ি কেবলই ভুলিয়া যায় যে, অমিতের প্রফেসরি চাকুরি নাই। সে বর্ত্তমানে একটা সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক। হয়তো কাল আবার প্রফেসরি চাকুরী লইবে, পরশু ছাড়িবে, পরদিন ফ্রী ল্যান্স,—আবার কোন বড়লোকের বক্তৃতা লিখিয়া দিয়া মাসিক উপার্জ্জন বাড়াইয়া ফেলিবে তিন শত টাকায়। সাতকড়ি তাহা পূর্ব্বেও দুই-একবার শুনিয়াছে; কিন্তু ভুলিয়া যায়। কিছুতেই এই তুচ্ছ কথাগুলি তাহার মনে থাকে না। মনে রাখিবার মত কোন ইন্টারেস্ট তাহার জন্মায় না বলিয়াই কথাগুলি তাহার মনের ফাঁক দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যায়। সাতকড়িকে তাহা বলিলে, সে বলিবে, ওঃ, আমার 'মেমরি' এত খারাপ! অমিত জানে 'মেমরি' সাধারণত সকলকার প্রায় একই থাকে। যাহার সম্পর্কে ঔৎসুক্য-বোধ জাগে, 'মেমরি' তাহার কথা গাঁথিয়া লয়, স্মৃতিস্তরের মধ্যে তাহার আসনটি আপনা হইতেই পাকা হইয়া যায়। আর যাহাতে ঔৎসুক্য নাই, সে কথা যেন স্মৃতির পদ্মপত্রের উপর উছলিয়া গড়াইয়া গেল—স্মৃতির পাতায় পরক্ষণেও কোন দাগই তাহার আর রহে না। সাতকড়িরও মনে থাকে না—কিছুতেই মনে থাকে না, অমিত এখন প্রফেসর নয়।

অমিত মুখে বলিল, সে দেরি আছে। তবু উঠতে হবে তো। কিন্তু তাহার মনে জাগিয়া উঠিল শৈলেনের কথা—'কেমন লাগে পড়ানোর কাজ?' শৈলেন শোনেই নাই যে অমিত অধ্যাপক নয়—সাতকড়ি যেমন শুনিয়াও শোনে নাই। শৈলেন শুনিতেও চাহে নাই, সাতকড়িও মনে রাখিতে চাহে না। অমিতের সম্পর্কে তাহাদের ঔৎসুক্য নাই,

ইণ্টারেস্ট নাই। অথচ একদিন শৈলেনের সমস্ত ইণ্টারেস্টই ছিল তাহাকে ঘিরিয়া! একদিন···এই সেইদিনের কথা মাত্র। এমনই জীবন। শুধুই ছাড়াইয়া যাওয়া। শৈলেন আর সাতকড়ি এক হইয়া যাইতেছে; অথচ দেহ-মনে এমন স্বতন্ত্র প্রকৃতির দুইটা মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! বড়লোক, দরিদ্র; চতুর, মেধাবী; আয়েসী, পরিশ্রমী; worldly type, idealist type—একেবারে স্বতন্ত্র, দেহে পর্যন্ত ভিন্ন category-র।

তোমাদের সঙ্গ তো ভাই পাওয়া যাবে না।—সাতকড়ি হাসিয়া বলিল, আধঘণ্টা কথা ব'লে একটু বিদ্যাই না-হয় লাভ করি। Don't you grudge that to an old friend!

সেই হাইকোর্টের উকিল-টুর্নিস্থলভ ইংরেজী বুকনি! আবার শৈলেনকে মনে পড়িল। শৈলেন আর সাতকড়ি দুইজনের দেহ-মনের গড়নই আলাদা, স্বতন্ত্র।

সাতকড়ির গোল সুপুষ্ট মুখ পরিহাসে এবার দোলা খাইল। শৈলেনও যেন এইরূপ হইয়াছে দেখিতে, এমনই smug, self-complacent, worldy। অথচ দুইজনে কত তফাৎ!

তফাৎ? কোথায় তফাৎ?

মুখে অমিত উত্তর দিল, নাও নাও, এরকম বলে সবাই। একদিন 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' ক'রে ঘুরে বেড়াতে হ'লে দেখতে মজাটা।

তাহার মন বিদ্যুৎবেগে ভরিয়া গেল, তফাৎ নাই, তফাৎ নাই, শৈলেন ও সাতকড়ি এক।

কি করিয়া তাহা সম্ভব হয়? বিবাহ? ওয়্যান, ওয়্যান, ওয়্যান!

না না, সে নয়। সুরোর সহাস্য উজ্জ্বল মুখ মনে পড়িল; মনে পড়িল

ললিতার চঞ্চল দৃষ্টি; মনে পড়িল সুধীরার চিন্তা-বিষণ্ণ শান্ত মুখ; ইন্দ্রাণীর মৃত্যুজয়ী বাণ-বিদীর্ণ, উন্মাদনাদৃপ্ত মুখ…আর মায়ের স্নেহ-ক্ষরা যাতনাবিদ্ধ গভীর দৃষ্টি…না না, ওম্যান in abstract, তোমাকে দোষ দিই সকলে। কিন্তু in concrete, মা, বোন, বান্ধবী, তোমরাই জীবনকে বাঁচাও, হয়তো নিজেরাই মরিয়া বাঁচাও, এ সমাজে পুরুষেরা বাঁচে তোমাদের মরণে।…

চা আসিয়া গেল। খাইতে খাইতে অমিত ভাবিতে লাগিল, তাহা হইলে সংসার! সংসারই শৈলেনকে সাতকড়িকে এক করিয়া ফেলে। সংসার! দুনিয়া-জোড়া একটা বিশাল চক্র—সুবৃহৎ, অতি সুবৃহৎ, কোনারকের রথ-চক্রের অপেক্ষাও বড়, অথচ ভয়াল হিংস্র কুটিল,—তাহার নিচে পিষিয়া গিয়া শৈলেন হয় সাতকড়ি।

ইহাই জীবন—'ইহা এইরূপই হয়।' কেন? 'কেন'র উত্তর— 'ইহা এইরূপই।'…অমিত বহুদিন পূর্ব্বে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর করিলেন—'মহারাজ, ইহা এইরূপই হয়।' অভ্রান্ত উত্তর…ইহা এইরূপই হয়—শৈলেন সাতকড়ি হইবেই। ইহাই জীবন।

অমিত ভাবিতে লাগিল—সেদিনকার সমাজে মানব-অদৃষ্টের প্রতি এই অবিশ্বাসের ও কর্ম্মকুণ্ঠার বাণীই বিঘোষিত হইবার কথা। এই নিষ্ক্রিয় যোগবাশিষ্ঠ ফিলজফিই সে যুগের প্রকৃতি-তাড়িত শ্রান্ত মানুষের ছিল সান্ত্বনা। কিন্তু যে সভ্যতা আকাশ-পাতাল জয় করিতেছে, সদা সক্রিয়, যা মূলত কর্ম্মযোগ,—বিজ্ঞানের নূতন নূতন যন্ত্রের সহায়ে জীবনকে করিতেছে উদ্দাম, বিজয়ী, সে কেন এই ফিলজফি স্বীকার করিবে—কেন বলিবে, 'ইহা এইরূপই হয়?' বরং এ যুগের সভ্যতা বলিবে, বলিবার

অধিকারী—"ইহা এইরূপ নয়; এইরূপ হইতে আমি দিব না।" কিন্তু সে বাণী তাহার মুখে নাই, সে সাহসও তাহার বুকে নাই। কারণ, বুকের তলায় তাহার আত্মবিরোধ; শক্তি তাহার স্ববিরোধী সমাজ-ব্যবস্থায় খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। আজ লোভের নিকটে বিজ্ঞানের দানও বলি পড়িতেছে। মানুষের দেহ-মন, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ, সব গ্লানিতে ভরিয়া উঠে এই লোভান্ধ সমাজে, এই bitchgoddess success-এর পূজায়; আর তাই সে সান্ত্বনা খোঁজে যোগবাশিষ্ঠের বচনে—'ইহা এইরূপই হয়',—এইরূপই জীবন।

ততক্ষণে সাতকড়ি কহিতেছে, এখনও গানবাজনা শোন তো? ওঃ, সুহৃদের সঙ্গে বুঝি ঘুরে বেড়াও? সুহৃদ বেড়ে আছে। আমার সঙ্গে তো দেখা হয় না, নইলে দু-একটা ভাল গানের বৈঠকে তাকে নিমন্ত্রণ করতাম। তুমি যাবে? চল না!

কোথায়? কবে?

বরানগরের একটা বাগান-বাড়িতে—আজ সন্ধ্যায়। ওই—বাগান-বাড়ি শুনেই তো মাথা নাড়ছ! ওহে, ভয় নেই, ভয় নেই, মেয়েমানুষ কাউকে গিলে খেতে পারে না। আর সত্যি সত্যি, খাবেই বা কেন? তারা তোমার মর্ত উপোসে ছারপোকাও নয় যে, রিপ্রেস্‌ড সেক্‌স হাঙ্গার নিয়ে বভুক্ষু ব'সে থাকবে। ইচ্ছা থাকলে বেশ সশরীরে ফিরে আসতে পারবে, সুবোধ ছেলের মতই ঘরে ফেরা চলবে; ওখানে ওদের আচরণেও একচুল ভদ্রতার হানি হবে না। বিশেষত, আজ তো কথাই নেই। পার্টিটার টাকা দিচ্ছে দিল্লীওয়ালা সওদাগর খুদা বক্‌শ—আমারই ক্লায়েন্ট। একটা বড় রকমের ফ্যাসাদে পড়েছে। এখন নবাবজাদা উসমান খাঁকে ধ'রে সরকারের দু-একজন লোককে তুষ্ট করা দরকার। আমি করছি পার্টি অ্যারেঞ্জ, নাম নবাবজাদার, আসবেন সবাই। খুব সিলেকট্, মাত্র

আধ ডজন লোক। গাইয়ে নাচিয়েও খুব বাছা—মমতাজ বেগম অব ইন্দোর ফেম, আর এখানকার নাচিয়ে চীনে পুতলী, আর শেষ গান সরস্বতীর। নো মিক্‌সিং,—আন্‌লেস ইউ ওয়াণ্ট ইট। তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছি। আর বেস্ট শ্যাম্পেন। কাল রাত দুটো পর্য্যন্ত বাড়িটাকে সাজাতে গেছে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা করিয়েছি। ট্রীটটা সাক্‌সেস্‌ফুল হওয়া চাই। অ্যাণ্ড ইট উইল বি এ ট্রীট।

অমিতের চোখের সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যটা ফুটিল, সেই সাতকড়ি, চতুর, আয়েসী—হইয়াছে অ্যাটর্নি। ঠিকই হইয়াছে, সংসার তাহাকে তাহার জীবনকক্ষে পৌছাইয়া দিয়াছে। জীবন ভুল করে না; পাকা জহুরীর মত মানুষকে বাজাইয়া লয়।

সাতকড়ি বলিতেছে, তুমি চল না আজ! দেখবে, কোন অসুবিধা নেই। পরিচয়ও হবে সব বড় বড় লোকদের সঙ্গে, আর তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই! তুমি সরকারী কলেজে যেতে পার—চাইলেই। দ্বিধারও কারণ নেই—আই অ্যাম রানিং দি হোল শো; অ্যাণ্ড আই ইন্‌ভাইট ইউ।

অমিত হাসিয়া বলিল, তা তো বুঝলাম, কিন্তু সন্ধ্যায় আমার জরুরী কাজ।

রাখো তোমার জরুরী কাজ।

চাকরিটাই খোয়াবো। জানিস তো সেই পিউরিটান প্রিন্সিপ্যালকে! তিনি আজ বিশেষ ক'রে প্রফেসরদের ডাকিয়েছেন। সামনেকার পরীক্ষায় ক বিষয়ে ফেল থাকলেও ছেলেদের 'সেণ্ট্‌-আপ্‌' করা যায়, আজ তাই স্থির হবে। জরুরী সভা, না গেলে চাকরিটিই যাবে।

ঢের ভাল চাকরি হবে।

আরে, যখন হবে, তখন না হয় ঝাঁটা মারব এসব পিউরিটান কর্ত্তাদের কপালে। কিন্তু এখন তো আর তা পারি না, হাতের একটা পাখিই তোমার বাগানের দুটো কেন, দুশো পাখির সমান।

সাতকড়ি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, তুমি তো ল পাস আছ। একবার চেম্বার পরীক্ষাটা দিয়ে অ্যাড্‌ভোকেট হও না! আমি বলছি, যাতে শ' চার টাকা পাও আমি তা দেখব, গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।

অমিত হাসিয়া কহিল, এ বয়সে আবার পরীক্ষা?

কেন? দেখ, কত দেরিতে এসেছে ডাক্তার মিত্র। সেও তো তোমাদের মত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। কত নবেল লিখছে, শরৎবাবুর পরেই এখন ওর প্লেস। অ্যাডভোকেট্ হিসাবে অবিশ্যি ওঁর কয়েকটা ডিফেক্ট আছে। ধরো—

অমিত শুনিতে লাগিল, অ্যাড্‌ভোকেসি—লিগ্যাল অ্যাক্যুমেন—অ্যাড্রেস।...যেন বাসে বসিয়া শৈলেনের কথা অমিত শুনিতেছে, অথচ এ সাতকড়ি।

অমিত বলিল, এবার চলি ভাই, সাড়ে দশটা। টাকাটা তবে একবার তুমি দেখো যেন তোলা হয়। হরিবাবুকে না হয় দু-পাঁচ টাকা দেব। আচ্ছা, আমিই বলব। যাব'খন অফিসে। আজ না পারি, কাল পরশু তক।

সাতকড়ি তাহার ভারী দেহটি চেয়ার হইতে কষ্টে টানিয়া তুলিয়া দুয়ার পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া কহিল, আসিস ভাই, মাঝে মাঝে আসিস। তোরা এলে তবু একটু ভাল লাগে। একেবারে তো নইলে সরস্বতীকে বয়কট করেছি।

অমিত দেখিল, বুককেসের বইগুলি সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল। সত্যি, বই রাখিতে হয় এইরূপেই। আর অমিতের বই কিরূপে না নষ্ট

হইতেছে! এখন তো সে তাহাদের ছোঁয় না, ছুঁইবার অবকাশও পায় না। আর সাতকড়ির এই রৌদ্রাভিষিক্ত বইগুলি!

অমিতের দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সাতকড়ির কথায় কান গেল, সত্যি বলতে কি, তোমাকে অ্যাড্‌-ভোকেট হতে বলতেও আমি দুঃখ পাই। হাইকোর্টের ত্রিসীমানায় না আছে ভদ্রতা, না আছে ভাল কথা। হয় ওকালতির কচকচি, না হয় ব'সে ব'সে নিন্দা—অমুক নেতা কত টাকা মেরেছে, অমুকের স্ত্রী কার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে কিংবা না বেরিয়ে আশনাই চালাচ্ছে, মিস্টার অমুক কত পেগ না হ'লে বিছানা ছাড়তে পারে না! এই দলেই আবার এক কালের ভাল ভাল ছেলেরা বেশি—যারা নেতা হবে, নাম করবে, টাকা লুটবে ব'লে হাইকোর্টে এসেছিল। একটু একটু ক'রে তারা পেছনে প'ড়ে গেল, শেষে রইল অতৃপ্ত রোষ—ভুয়া সুপিরিয়ারিটি কম্পলেক্‌স্‌, নিষ্ফল দর্প, আর নৈরাশ্যের ফলে শূন্যগর্ভ ঈর্ষা; পরনিন্দা, কুৎসা হ'ল এদের ফোকলা অলস দিনের চাটনি। অথচ তারাই ছিল এককালে তোমার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েল। তোকে কি বলবো ভাই, হাই-কোর্টে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তার চেয়ে ছেলে ঠেঙিয়ে খাচ্ছিস—খাচ্ছিসই বা কই, আধপেটা চলছে, তা মানলাম—তবু তাই অনারেবল। তাই তো বলি, আসিস ভাই—একটু-আধটু অন্য জগতের স্বাদ পাব।

মুখে অমিত হাসিয়া কহিল, রাখ রাখ তোর ঠাট্টা। কিন্তু অমিতের মন বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

শীতের রৌদ্র সাতকড়ির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। পুরো গাল দুটিতে এখন চাতুর্য্যের আন্দোলন-চেষ্টাটুকুও নাই—সমস্ত হারাইয়া স্থাণু মাংসপিণ্ডের মত তাহা জড় হইয়াছে; চোখ তাহার দীপ্তিহীন; ফর্সা রং ঔজ্জ্বল্যহীন, লাবণ্যহীন;—সেই সাতকড়ির মুখে এ কি কথা? মনে হইল, যেন শৈলেন ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছে—'I sing the

tragedy of this life'।—কিন্তু এ তো শৈলেন নয়, এ যে সাতকড়ি।

এমনই সংসার, এমনই তার অক্ষম ছলনা—কাহারও তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

সভ্যতার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে—লোভের বাঁধন, আরামের মোহ তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দুঃস্বপ্নের মত এই ব্যবস্থা চাপিয়া বসিয়া আছে বটে, এক-একবার তবু মানুষ সচেতন হয়, বিদ্রোহ করিতে চায়। সে এক-একটি অদ্ভুত নিমেষ। তখন সাতকড়িও বলে, 'আমি অন্য জগতের স্বাদ চাই।' কিন্তু আজ সন্ধ্যায়ই যখন তাহার পার্টি জমিবে, তখন অভ্যস্ত জগতের অভ্যস্ত বিলাস-লালসায় এই নিমেষের কথা সাতকড়ির আর মনেও থাকিবে না! তারপরে আবার একবার হঠাৎ কোন্ দিন, অসিত, তোমাকে দেখিবে, দেখিয়া মনে পড়িবে—কিংবা হয়তো বা আর ঐ কথা মনেও পড়িবে না। অলস পরাশ্রয়ীর সমাজে এইরূপ ভাব-বিলাসই হইয়া উঠে স্বাভাবিক। ইহাই ইহাদের জীবন—পরশ্রমভোগীর সমাজে ইহাই জীবন; এই জীবন-বিমুখিতাই ইহাদের জীবন—তাই, লাইফ্ এখন ট্রাজিডি; তাই 'ইহা এইরূপই হয়—মহারাজ, ইহা এইরূপই'।

৭

বেলা এগারোটা প্রায় বাজে। অমিত ভাবিতেছে, এখন কোথায় যাওয়া যায়! বাড়ি ফিরিলে দেরি হইবে। মা আছেন, বাবা আছেন, তাঁহারা তখনই বলিবেন, 'আবার বেরুবে কোথায়?' না, বাড়ি নয়। তাহা ছাড়া বাড়িতে বলিয়াই তো আসিয়াছে, আজ সে বিকাশের ওখানে খাইবে, তাহার সঙ্গেই আর্ট একজিবিশনে যাইবে। অতএব বাড়ি ফেরার তাড়া নাই, বরং না ফেরাই সুবুদ্ধির কাজ। তাহা ছাড়া বাড়ি ফেরা এখন সম্ভবও নয়। সুনীলের একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে-- বেলা এগারোটা বাজে। সাতকড়ির কাছে তো টাকাও মিলিল না। মিলিবে না জানা কথাই, তবু দেখিল একবার। কিন্তু সমস্ত সকালটা নষ্ট হইয়া গেল—বাজে গল্পে। এমনই করিয়াই অমিত দিনগুলি খোয়াইয়া ফেলে। অথচ তাহার এত কাজ! এভাবে সময় লইয়া ছিনিমিনি খেলা তাহার এখন সাজে না। চোখ মেলিতেই সে দেখে দিনের আলো, আর সারাদিন অক্লান্ত ছুটাছুটি করিতে থাকে—কাজ হয়তো এক পাও অগ্রসর হয় না,—চোখ তুলিতে আবার দেখে, নিশীথরাত্রির গভীর স্তব্ধ অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। কাজ এগোয় না, কোন কাজই হয় না। সকালটা নষ্ট হইয়া গেল।

অমিত মোড়ে আসিয়া গিয়াছে যে—কোথায় যাইবে? ডালহৌসি? মন্দ নয়। এগারোটা, পৌঁছিতে পৌঁছিতে সাড়ে এগারোটা হইবে। নিশ্চয় যুগলকে পাওয়া যাইবে, সাড়ে দশটাতেই সে অফিসে আসিবে। দুপুরে টিফিনের পরে যুগল অন্য অফিসের হিসাব-পরীক্ষায় বাহির হইবে, ইন্‌কর্পোরেটেড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের সে আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক। তাহাকেই

এবার সুনীলের কথা বলিতে হয়। কিন্তু বলিবেই বা কি? দেখা যাউক, যদি কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়, সেই যুগলই আছে, দুই বৎসর পূর্ব্বে যে সাইমন কমিশনের পাহারা-পুলিসের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া সায়েন্স ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসে, সেই সাহসী যুগল, তাহা হইলেই বলা উচিত।

অমিত বাসে চাপিল। বাস যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে; কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে নিশ্চয়তা নাই।

সেই যুগল আছে কি? কথাবার্ত্তায় তো কতদিন মনে হইয়াছে সে বদলায় নাই। ডক-কুলীদের ইউনিয়নের হিসাব বিনা পয়সায় পরীক্ষা করা, তাহাদের নানারূপ তুলনামূলক স্ট্যাটিস্টিক্‌স তৈয়ারি করা, এখনও তো যুগল পরমোৎসাহে তাহা পালন করে। শুধু পালন করে কি? কার্টার স্ট্রাইকের পরে সে গোপনে গোপনে কম কাজ তো করে নাই। কতবার তো অমিতকে বলিয়াছে, 'কাজের মত কাজ দাও অমিদা। সংখ্যার টোটাল দেওয়া মানুষের সাজে না। এভাবে এসময়ে হিসাব পরীক্ষা করতে আমার গ্লানি বোধ হয়। চা-বাগানের কুলী মরে পিলে ও কালাজ্বরে, মুনাফা শতকরা পঁচাশী পার্সেণ্ট। কিন্তু দেখাতে হবে তা আঠার পার্সেণ্ট—নির্ভুল হিসাব। পরীক্ষা ক'রে নাম সই করবার সময় রক্ত আমার মাথায় উঠে বসে। এই সই ক'রেই কর্ত্তব্য চুকে গেল কি আমার? শুধু হিসাবই করব? আর কিছু নয়?'

সেই যুগল আছে কিনা কে জানে? সুনীলের নাম শুনিলে হয় তো আপত্তি তুলিবে—বাড়িতে ঘর নাই, বাবা আছেন, এই সব রক্তাক্ত নির্ম্মমতায় আত্মার অকল্যাণ হয়, আন্দোলন সত্য পথ হারাইয়া ফেলে;—এমনই সব কত কিছু। না, আপত্তির কারণ অনেক জুটিতে পারে—যদি যুগল সে-যুগল না থাকে।

তাহা থাকিবেই বা সে কিরূপে? মানুষ তো এক-মানুষ থাকিতে পায় না।

সংসার মানুষকে টানিয়া সমভূমিতে আনিয়া লয়। সংসারে ঢুকিলে মানুষ প্রথমে যেন বেলাভূমির নাগাল পাইয়া হাঁপ ছাড়ে। একটা settled life পাওয়া গেল; আর ডুবিয়া-ভাসিয়া মরিতে হইবে না। তারপর দেহ চায় বিশ্রাম, মন চায় আরাম। তারপর পরিণাম—ইহাই নিয়ম, ইহাই জীবন—ধীরে অতি ধীরে, চোরাবালুতে আটকাইয়া যাওয়া,—প্রথম পা ডুবিয়া যায়, পরে মন আবৃত হয়, চেতনা মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, বালুর তলে চিরসমাহিত হইয়া পড়িয়া থাকে এককালের কোলাহল-মুখর, জীবন্ত, জাগ্রত মানবাত্মা—যেন sand-buried cities of Khotan! ইহাই জীবন····মরুশয্যায় ধীর-সমাধি।

একদিন হঠাৎ কোন সন্ধানীর চোখে পড়ে সেই লুপ্ত জীবনের ভগ্নচিহ্ন—যেমন হঠাৎ আজ সাতকড়িকে অমিত দেখিল।···

তথাপি শেষ পর্য্যন্ত কেহই ভোলে না। কেহ বা নিজেকে ভুলাইয়া রাখে, কেহ বা সেই ভুলের জ্বালায় পুড়িয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়—হয়তো ভয়ে, দর্পে, নিতান্ত বলিবার শক্তির অভাবে তাহা বলিতে পারে না। দুই-একজন বুঝি ইন্দ্রাণীর মত সংসার-জ্বালাকে অস্বীকার করিয়া আদর্শের আগুনে দেহে মনে আত্মায় জ্বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়—'আমরা ভাস্বর, আমরা জ্যোতির্ম্ময়।' তাই বলিয়া জ্বালার ক্ষত কি তাহাদের প্রাণে দগদগ করে না?···

সাতকড়ি এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্নানের আয়োজন করিতেছে। খানিক পরেই যাইবে অফিসে—অমনই সলিসিটর সাতকড়ি ঘোষ। তাহার পর আজ সন্ধ্যায় সেই আপ্যায়নরত, প্রিয়ভাষী, হাস্যগলিত-কপোল সাতকড়ি; বরানগরের বাগান-বাড়িতে সুচতুর সাতকড়ি!···সাতকড়ি বলে কিনা, 'নিশ্চয়ই আসিস ভাই, একটু অন্য জগতের স্বাদ পাব।' আর অমিত তাহা আবার মনে করিয়া রাখিয়াছে। এতক্ষণে সাতকড়ি নিশ্চয়ই প্রাকস্নানীয় সিগারেটটা টানিতেছে। এখন যদি কেহ তাহাকে

জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলিয়াছিলে—'আসিস ভাই, একটু অন্ত জগতের স্বাদ পাব,' তাহা হইলে সাতকড়ি প্রথমটা কথাটার অর্থই বুঝিবে না! তাহার মনেই পড়িবে না—কখন কাহাকে কি সূত্রে এইরূপ কথা সে বলিয়াছে। এই কথা তাহার স্মৃতিতে জমে নাই—যেমন সেখানে জমে নাই অমিতের জীবন-যাত্রার কথা। দুইই তাহার নিকট সমান অর্থযুক্ত, অর্থাৎ কোন অর্থই নাই, মাত্র কথার কথা।···

আজই হয়তো নিশীথরাত্রের অন্ধকার চিরিয়া তারার আলো আসিয়া নিমীলিত-নয়ন শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'অমিতকে দেখলে?' জিজ্ঞাসা করিবে আকাশ-পারের পরিচিত নক্ষত্র-লোক, 'তোমাদের ছয় শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস কতদূর, শৈলেন?' হয়তো শৈলেনের অর্দ্ধজাগ্রত বক্ষে চকিতে একটা দুর্ভার বেদনা জাগিবে। পরক্ষণেই চোখ সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইবে। অমনই মুখ ঢাকিয়া, পিছন ফিরিয়া, সেই তারার আলো আঁধার আকাশ-পটে ছুটিয়া পলাইবে।—আর শৈলেনের চোখে পড়িবে বুকের পাশে সুপ্তা, সালঙ্কারা রায়বাহাদুর-কন্যা। তারপর থাকিবে একবার সেই নিদ্রিত দেহপিণ্ডকে বাহুবন্ধনে আঁকড়াইবার সুনিবিড় চেষ্টা—আবার তৃপ্তিপূর্ণ সুষুপ্তি।···

ইহাই সংসারের ধর্ম্ম—শৈলেনকে, সাতকড়িকে একই ছাঁচে ঢালিয়া এইরূপ responsible citizen সে করিয়া তোলে।···

কে জানে, যুগল আজ কি হইয়াছে—তেমনই responsible citizen হইয়াছে কি না। অনিলের মতও হইতে পারে। কে বলিবে?

তাহা হইলে সুনীলের ব্যবস্থা কি হইবে? পাঁচটায় সুনীল অমিতকে ফোন করিবে অফিসে। কিন্তু অমিত অফিসে আজ যাইতে পারিবে না। সুনীলের জন্যই ব্যবস্থা করা দরকার। তবু একবার সাড়ে চারটায় যাইতে হইবে—ফোনে সুনীলকে বলিতে হইবে, কি

ব্যবস্থা হইল। যুগলের অফিস হইতে ফোনে অমিতের কাগজের অফিসের কর্ত্তব্যও খানিকটা করা হইবে। তারপর আবার বিকালে আছে ইন্দ্রাণীদের শোভাযাত্রা।

যুগলের সঙ্গে বন্দোবস্ত না হইলে অমিতকে যাইতে হইবে—ডক-মজুরদের অফিসে। খিদিরপুরের একটা অন্ধকার ঘরে সেই অফিস। তিনটায় সেখানে অনেকে আসিবে—দীমু আর মোতাহেরও থাকিবে। উহাদের সঙ্গে একবার আলোচনা করা যাইতে পারে। উহাদের সঙ্গে সুনীলের পরিচয় হইলে মন্দ হয় না। হয়তো উহাদের সাহচর্য্যে সুনীল কাজের সত্যকার পথও চিনিয়া লইবে। কিন্তু সুনীল উহাদের প্রথমটা পছন্দ করিবে না। হয়তো উহারাও সুনীলকে পছন্দ করিবে না—সুনীল উহাদের চোখে রোমাণ্টিক, ইম্পেশেণ্ট, নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক কর্মী।

ড্যালহৌসি স্কোয়ার। লাফাইয়া লাফাইয়া যাত্রীরা নামিতেছে—এক পা পরে নামিলে যে দেরিটা হইবে পাছে তাহাতেই চাকরি হারাইতে হয়।

আশ্চর্য্য জনস্রোত। জীবনধারা ফেনাইয়া উঠিয়াছে—শত পথে, শত আয়োজনে, শত অনুষ্ঠানে, কত শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সাগর-সন্নিকটস্থ গঙ্গার মধ্যে আপনার উদার পরিপূর্ণ আবেগকে মুক্তি দিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে। এখানে দাঁড়াইয়া যেমনই বিস্ময়ে মন ভরিয়া উঠে, বিপুল আয়োজনের ক্ষণিক কোলাহল চৈতন্যের উপর আসিয়া পড়ে, তেমনই মনে জাগে কৌতুক। মন দেখিতে পায়—বর্ত্তমান-কালের বৈশ্য ব্যবস্থা এই সনাতন দেশেও আসিয়া পড়িয়াছে। তারপর মন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, ইহার মানে কি? অর্গানাইজেশন, ক্রেডিট, টেক্‌নিক।...সমস্ত দুনিয়াকে পাইয়াই বা কি হইবে যদি মানুষ আপনাকেই ফেলে হারাইয়া?

হারাইয়া ফেলিয়াছে, হারাইয়া ফেলিয়াছে—এই গুটি গুটি মানুষ-কীটের দল এক-একটা উইঢিপির চূড়ায় বসিলে কি হইবে? ইহারা আপনাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের চোখে জীবনই নাই। জোর তাহা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারও নাই।—আছে ক্রেডিট, ইণ্টারেস্ট ভাউচার, ব্যাঙ্ক-ব্যাল্যান্স।···

জীবনের তাড়া আশ্চর্য্য ব্যাপার। জীবিকার যূপকাষ্ঠে সে মানুষকে বাঁধিয়া দেয়, মানুষ বলি যায়, জীবনেই পড়ে ফাঁক। জীবিকার শূন্যতা জীবনকেও ঢাকিয়া ফেলে।

ইহাই জীবন—যদি না জীবনের সত্য রূপ কেহ প্রত্যক্ষ করে।

কিন্তু কি সেই সত্য রূপ জীবনের? এই ফেনায়িত উদ্দাম প্রয়াস নয়; তবে কি চিন্তা, সাধনা? অর্থাৎ, 'শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন'? অমিত নিজের মনে হাসিয়া উঠিল, অর্থাৎ ফাঁকি, আত্মছলনা—যা মূলত স্বার্থ-ছলনা। মনন, মনন কি? বিকৃত ঐশ্বর্য্যের চাপ হইতে পলাইয়া বিকৃত অবাস্তবতার মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা। টেক্‌নিককে অবিশ্বাস কেন? তার পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেওয়ার শক্তি নাই বলিয়াই না সে ব্যাহত, বিসদৃশ। নহিলে টেক্‌নিক মানে—সৃষ্টি-প্রকরণ। আর সৃষ্টিই জীবনের পরম বাণী, চরম রহস্য।

ভাবিতে ভাবিতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়াছে অমিত, দেখিল সম্মুখে বেয়ারা। ভাবনা ছুটিয়া গেল, কাগজে নাম লিখিয়া যুগলকে পাঠাইল। কেদারায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে দেখিল, কোণে একটা লম্বা বেঞ্চে একটি বেয়ারা ঢুলিতেছে; ওদিকের চেয়ারে একটি ভদ্র যুবক উপবিষ্ট, বোধ হয় উমেদার; পার্শ্বের ঘর হইতে ভারতীয় কণ্ঠে ইংরেজী উচ্চারিত হইতেছে। মোটা সবল কণ্ঠ; শুনিয়াই মনে হয়, বক্তার অর্থাভাব নাই; সে এখানে বেশ সহজ, সুপ্রতিষ্ঠিত, হয়তো অফিসের একজন কর্ত্তা

যুগল আসিয়া উপস্থিত।

এ সময়ে যে ? অফিসে যাও নি কেন ?

এমনিই। আজ একটু কাজ আছে। ডকের মজুরদের সঙ্গে খানিকটা কথা বলা দরকার। ডিমনস্ট্রেশন বার করতে হবে।

কি ব্যাপারে ?

কদিন ধ'রে কংগ্রেসের সঙ্গে কথা চলছে, ওদের একটু সাহায্য করব। কনডিশনালি। ওরাও আমাদের 'ইউনিয়ন' চালাতে কিছু সাহায্য করবে।

কত ? পেয়েছ টাকাটা ? ওদের মন স্থির নেই। আগুন নিয়েই খেলা করবে, কিন্তু আগুনের আঁচ যেন ঠিক গায়ে না লাগে—এই হ'ল ওদের প্ল্যান।

নো প্ল্যান, বল।

যাগকে সে তর্ক। দেখ কি হয়। ডিমনস্ট্রেশন কবে ?

দিন দশ পরে। বিলিতী জাহাজের মাল নাবাতে মজুররা অস্বীকার করবে। তাদের অভাব অনেক, দাবিও খাঁটি। অবশ্য এখনও কিছু ঠিক নেই। জান তো শরফুদ্দিনকে। সে আঁচছে, জেনেভায় যাবে। ওই জেনেভা সর্ব্বনাশ করলে। কর্ত্তাদের সে দুবেলা তোয়াজ করছে। একে তার বাড়ি বাঙাল দেশে, তাতে মুসলমান। মজুর-মহলে ওর প্রতিপত্তি ভয়ানক। সে কিছুতেই ডিমনস্ট্রেশন ঘটতে দেবে না। বলে, 'ওসব পলিটিক্স; ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।' এদিকে মোতাহের আছে। তবে সে আবার বিষম কম্যুনিস্ট; কংগ্রেসের বা স্বদেশীর নাম শুনলেই ক্ষেপে যায়। সে রাজি হ'লে খানিকটা কাজ হবে।

দেখা হ'ল ওদের সঙ্গে ?

না, ওরা দেড়টায় আসবে। তার আগে কেউ আসে না।

তা হ'লে ততক্ষণ এখানে বসবে ?

আপত্তি নেই।

তবে চল আমার ঘরে। আর কোন কাজ নেই তো ?

না, তবে অফিসে একটা ফোন করব।

বেশ, এস, ক'রে দাও।

অমিত ফোন তুলিয়া অফিসে বলিয়া দিল, আজ শরীর ভাল নাই। বিশেষ জরুরি কাজ যাহা থাকে যেন তৈয়ারি করিয়া রাখে। সাড়ে চারটায় সে একবার আসিবে।

তারপর যুগলকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কাজ নেই যুগল ?

আছে বইকি। করব এখনই, ভেবো না। এখানে সচরাচর থাকে একটি পার্সী শিক্ষানবিস—এখন বেরিয়ে গেছে। চা খাবে তো ?

বেয়ারা চা লইয়া আসিয়াছিল, রাখিয়া গেল। চা খাইতে খাইতে অমিত কথা পাড়িল, তোমার কি মনে হয় যুগল কিছু হবে ?

কিসের কথা বলছ ?

এই ডিমন্‌স্ট্রেশন।

না হবে কেন ? শরফুদ্দিনগুলোর হাত থেকে তো মজুরদের বাঁচাতে হবে। ওরা হ'ল আসল এক্সপ্লয়টার্স। আর ওদের সাহায্য করে এম্‌প্লয়ার্স ও সরকার দুইই। ওরা হ'ল মজুরশক্তির বিরুদ্ধে পাকা দেওয়াল। ওদের তাড়াতেই হবে।

অমিত কথায় মগ্ন হইল। আলোচনা চলিতে লাগিল।

কিন্তু বার বার মনে মনে অমিত অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল—কি বলিতেছ তুমি ? মজুর নয়, তুমি সুনীলের কথা বল। বল, দেরি করিও না। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে—দেরি হইতেছে, আর দেরি করিও না।...যুগল বলিতেছে, তবে দেখ, লীডারশিপ যেন কংগ্রেস-

ওয়ালাদেরও হাতে না পড়ে। তাদের না আছে ওটা চালাবার সাহস, না আছে তার মত আয়োজন।…

অমিত নিজেকে তাড়া দিতেছে—স্থনীলের কথা তুলিতে হইবে; দেরি করিয়া অন্যায় করিতেছ তুমি, অমিত।

যুগলকে সে বলিল, সবাই বোঝে না। যতগুলো শক্তিকেন্দ্র আছে সবগুলো যে একযোগে দাঁড় করিয়ে একটা বড় ফ্যালাঙ্কস গড়তে হবে, নাহলে হবে না—এ কথাটা সবাই বুঝতে চায় না, তারা মানেও না। প্রত্যেকেই ভাবে, একমাত্র তার দলের কিংবা তার একান্ত বিচ্ছিন্ন চেষ্টাতেই কাজ হবে। অন্তত, অন্যের চেষ্টাতে কিছুতেই হবে না—হওয়া উচিত নয়। এই নিয়ে তর্ক ক'রেই ওরা নিজেদের শক্তি খুইয়ে ফেলছে।…

এক মুহূর্তের মত অমিত স্থনীলের কথাও ভুলিয়া গেল। এই নানা মতের চেষ্টাকে একটা সম্মিলিত চেষ্টায় গড়া দরকার—ইহাদের মধ্যে যেখানে মিল আছে সেইটুকুকে অবলম্বন করিতে হইবে। কি তাহা? স্বাধীনতা-সূত্র। আজ কতমাস যাবৎ কত ভাবে অমিত এই কথাটা বিভিন্ন মতবাদীদের বলিতে চাহিতেছে, কিছুতেই কেহ তাহা মানিতে চাহে না। মোতাহের তো তাহাকে 'পেটি বুর্জোয়ার বেইমানী' বলিয়া মারিতে বাদ রাখিয়াছে। স্থনীলদের কাছে তো কম্যুনিস্ট প্রায় 'স্পাই'-এর সমতুল্য। আর ট্রেড ইউনিয়নের অনেকেই এসব বিপদের পথে পা বাড়াইতেও অস্বীকৃত। তথাপি অমিত বুঝিতেছে, এই অগ্রগামী শক্তিগুলিকে একত্র করিয়া পরিচালিত না করিলে কাজই হইবে না। এ শুধু তাহার বিশ্বাস নয়, এ তাহার বাস্তব-দৃষ্টির ফল। কিন্তু কে তাহা বুঝিবে? বরং উল্টা অমিতকেই সকলে সন্দেহের চোখে দেখে। অমিতের নিকট এই বিষয়টা তাই বড়ই দরকারী আলোচনা।

যুগল উত্তর করিল, একটা উগ্র বিরুদ্ধবাদী মনোভাব দেশবাসীর মধ্যে জন্মেছে। তুমি বলছ, 'তার শক্তিটা সংহত করা দরকার। একটা সমবেত প্রয়াসে তাকে গ্রথিত করে দাঁড় করাতে হবে। নাহলে প্রতিকূল শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।' বেশ। কিন্তু এই যে তোমাদের স্বদেশীরা, দেখছ তাদের মধ্যে এরূপ কোন চেতনা ?

যুগল কথা বলিতেছে। অমিতের মনে পড়িয়া গেল—ঠিক ইহার উল্টা কথা বলিবে সুনীল। সুনীলেরা হার মানিবে না।

মনে পড়িল সুনীলের কথা।…ওঃ! সুনীল! দেরি করিও না, অমিত। এবার প্রথম সুনীলদের কথা তোল, তারপরেই সুনীলের কথা, শেষে আসল কথা—কোথায় এখন তাহাকে রাখা যায়। দেরি করিও না, আর বাজে বকিয়া সময় নষ্ট করিও না। এবার সুনীলদের কথা তোলা খুব সহজ।…

না, যুগল বদলায় নাই।

অমিত কহিল, কিন্তু কথা হচ্ছে, ছেলেটাকে এখন রাখি কোথায় ? আজ তো এখন পথে ঘুরছে। এখন কি করি ? আমার বাড়িতে থাকবে না—

থাকা উচিতও নয়।

কোথায় থাকা উচিত বল তো ? কে সাহস ক'রে রাখবে ? কাকেই বা বিশ্বাস করা চলে ?

যুগল বুঝিল। নিজে হইতে বলিল, ওঁর আপত্তি হবে কি না জানি না, নাহলে আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন। আমাদের ঘর আছে তিনখানা। আর একটা বাইরের ঘর। বাবা থাকেন একটাতে ;

বুলু আছে দ্বিতীয়টাতে ; আরটাতে আমি। আমার সঙ্গে থাকলে কি অসুবিধা হবে ?

থাকার পক্ষে তার ফুটপাথেও অসুবিধা হয় না, সে তো জানই। অন্য কোন আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে হয়। তা ছাড়া বুলুকে বা তোমার বাবাকে কী বলবে ?

বুলু বুঝলেও ক্ষতি হবে না। বাবাকে বলব, 'জলপাইগুড়ির যে চা-অফিসে আমি হিসাব পরীক্ষায় গেছলাম, তাদের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। এখানে হিসাবপত্র নিয়ে এসেছেন। আমিও ছিলাম ওঁর বাড়িতে অতিথি, কাজেই ইনিও আমার এখানেই থাকবেন।' আপাতত এই কথা। তারপর দেখা যেতে পারে।

অমিত সকৃতজ্ঞ চোখে যুগলের দিকে তাকাইল। বলিল, কিন্তু দায়িত্বটা বুঝেছ তো ?

আমার যতটুকু, ততটুকু বুঝেছি। এখন সুনীলবাবু রাজি হন কি না দেখ। তাঁরও তো দায়িত্ব আছে।

যুগল সেই যুগলই।···

কিন্তু অমিত তুমি কি কাজটা ভাল করিতেছ ? উদারপ্রাণ যুবক —তাহার পিতা, বোন, সকলের নিকট তাহাকে ছলনা করিতে শিখাইতেছ ; তাঁহাদের মাথার উপর কঠিন দুর্ভাগ্য চাপাইয়া দিতেছ— পিতার নিকট হইতে, ভগ্নীর নিকট হইতে সরাইয়া আনিতেছ, কাড়িয়া লইতেছ তাহাকে !···

Woman what have I to do with thee ? মাতার নিকট হইতে সত্য কাড়িয়া লইল যিশুকে। আইডিয়াল যেন খড়্গ-- জন্মের বাঁধন, নাড়ীর বাঁধন, সৌহার্দ্দ্যের বাঁধন—সব কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। পরকে মনে হইবে আপন, একান্ত আপন, সকলের

চাইতে আপন, সর্ব্বস্ব ; আর আপন হইয়া যাইবে দূর, বিচ্ছিন্ন, পর হইতে পর।...

Who is my mother ? And who are my brethren ?

অমিত আজকাল চা খাইতে বসিয়া পিতার সঙ্গেও গল্প করিতে পারে না। বাড়ি ফিরিয়া মায়ের সঙ্গে গোলমাল করিতে চাহে না। তাঁহারা আজ অমিতকে বুঝিতেই পারেন না।...

যুগলের মা নাই, বাঁচিয়াছেন। 'মা বড় বাধা, বড় জঞ্জাল। মরেও না।'—মণীশের কথা। অমিতের মা বোধ হয় এতক্ষণ ভাত কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেও শুনিবেন না। 'মা বড় বাধা, বড় জঞ্জাল, মরেও না।'

যুগল জিজ্ঞাসা করিল, চুপ ক'রে রইলে যে ?

অমিত কহিল, স্বনীলকে জিজ্ঞাসা করতে হয় তো। আর সম্ভব হ'লে কখন থেকে সে তোমার বাড়ি থাকবে ?

কেন ? আজ থেকেই।

তুমি আমাকে স-পাঁচটার সময় অফিসে ফোন করবে—আমি স্বনীলের মতামত জানাব।

তাই হবে।

আর তা না হ'লে আজ সন্ধ্যাটা বাড়িতেই থেকো। এখন তা হ'লে চলি। স্বনীলকে খুঁজতে যেতে হবে। একটা বাজছে।

প্রকাণ্ড অফিস হইতে বাহির হইয়া অমিত মুক্তবায়ুতে একবার নিশ্বাস টানিয়া লইল। মাথা যেন অনেকটা হালকা হইয়াছে। এখন যাইবে কোথায় ? ডকের মজুরদের ইউনিয়ন-অফিসে ? মন্দ নয়। কিন্তু একবার মিনুর সঙ্গে দেখা করিবার কথা ছিল। এখন ভবানীপুরে মিনুদের বাড়ি

ছুটিলে আর ইউনিয়ন-অফিসে ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। মিনুর সঙ্গে বরং কাল দেখা করিবে—তাহার সঙ্গে দেখা করার হাঙ্গামাও তো কম নয়।

বড়লোকের বাড়ি। সেকেলে জমিদারী চাল। দেউড়িতে দরোয়ান না থাক, বাহিরের মহলে একপাল পোষ্য আছে। তাহারা কেহ চাকরি খোয়াইয়াছে, কেহ চাকরি খোঁজ করিতেছে। কেহ কলেজে পড়ে, কেহ পড়িবার ইচ্ছায় টিউশনির খোঁজ করে—একটা বড় হোটেল। ঘরগুলিতে ইহাদের ময়লা ভিজা কাপড় শুকাইতেছে। দুই দিকে দুইটা মজলিস। একটায় বয়স্করা তামাক পোড়াইতেছেন, মেঝে তামাকের গুলে ও টিকায় কলঙ্কিত; আর একটায় ছোকরারা তাস সহযোগে বিড়ি টানিতেছেন বা বিড়ি সহযোগে তাস খেলিতেছেন। আধঘণ্টায় বাড়িতে খবর পৌছানো যায় না। ইহারা কথা কানেই তুলিবে না, চাকরেরা ঘুম ছাড়িয়া উঠিবে না! মিনু আবার বাড়ির বউ। তাহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে শ্বশুর বা শাশুড়ীর নিকট প্রথম এত্তেলা পৌছে। তারপর বউমা অনুমতি পান। অনেক করিয়া বুড়াকে ভজাইয়া অমিত তবু এখন এই সুবিধাটুকু করিয়াছে যে, দুপুরে দেখা করিতে গেলে কর্ত্রী নিদ্রা ছাড়িয়া না উঠিয়া খাস ঝির পাহারায় বউমাকে অন্দরের নিচের একটা ঘরের সম্মুখে কথা বলিতে দেন। ঝিটিকেও মিনু হাত করিয়াছে, কথাগুলি কাজেই অবাধে চলে। তবু আজ এখন তাহাদের বাড়ি গেলে আর এপাড়ায় কোনও কাজ হয় না। মিনুরও এখন সুবিধা হইবে না। আর গিয়াই বা কি হইবে?—তাহার কথা রাখা অসম্ভব। বরং সুনীলের সঙ্গে মিনুর দেখা হইলে সুনীল যাহা করিবার করিবে, অমিত পারিবে না।

শ্বশুরবাড়িতে মিনুকে সুনীলের জন্য অনেক খোঁটা সহিতে হয়, ভাইয়ের নাম করিবার উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ী তো যাহা ইচ্ছা

বলেনই, ভাসুর এবং ভাজ, ননদরাও টিটকারি দিতে ছাড়েন না। কেহ বলেন দেশোদ্ধারী ভাই 'জীবানন্দ', কেহ বা বলেন গ্যারিবল্‌ডি কিংবা ডি ভ্যালেরা ; 'বোনকেও কি দাদা সঙ্গী করিবে নাকি ? তাহারও যে খদ্দর ছাড়া শাড়ি পরা চলে না। কে জানে, শান্তি না কল্যাণী, না দেবী চৌধুরাণী, কোন্ দেশপ্রেমিকা !'

মিনু নিরীহ মেয়ে—মনে মনে খানখান হইয়া যায়, মাথা তুলিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে না। এই পরিবারের আবহাওয়াই এমন জমাট-বাঁধা নিশ্চল জড়পদার্থ যে, কাহারও ইহার মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো অসম্ভব কথা। এই বাড়ির ইতিহাসে তাহা নূতন ঘটনা হইত। কিন্তু মিনু সে প্রকৃতির মেয়ে নয়। তাহার ধাত অন্যরূপ। তাই তাহার সুন্দর মুখে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছে, এবং শান্ত চোখে নিথর বেদনা জমিয়া রহিয়াছে ! তাহার মনে পড়ে সেই ছোট ভাইয়ের সুকুমার মুখ।

ছোট বউদির ঘড়িটা সুনীল নিলে কেন ? কিছুতেই মিনু মনে শান্তি পায় না। সামান্য একটা ঘড়ির লোভ সে সামলাইতে পারিল না ?

মিনু সুযোগ বুঝিয়া অমিতকে একদিন তাহা জিজ্ঞাসা করিল। অমিত সংক্ষেপে বলিল, জান না যে, টাকার কত দরকার ? না খেয়ে, দিনের পর দিন কলের জল খেয়ে ওরা চলে। কেন ? শুধু তো টাকা পায় না ব'লেই।'

মিনুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। ইহার পর যেদিন অমিত আসিল, সেদিন ঝিকে সে একবার দোকানে পাঠাইয়া দিল খাবার আনিতে। সেই অবসরে বস্ত্রান্তরাল হইতে মিনু ছোট্ট একটি পুঁটলি বাহির করিল। অমিত জিজ্ঞাসা করিল, কি ?

কিছু নয়, ওকে দিও। যেন না খেয়ে থাকে না ওরা। পারে তো যেন বউদির ঘড়িটা ফিরিয়ে দেয়।

অমিত বুঝিল খান কয় গহনা। সে হাত সরাইয়া লইল

ভয় নেই দাদা, এ বাড়ির একখানাও নয়। এঁদের জিনিস দিয়ে আমি ওদের অপমান করবো না! এসব আমার মায়ের জিনিস—মায়েরও নয়, ঠাকুমার। পুরনো দিনের ভারী সোনার জিনিস। বউ-বয়সে ঠাকুমা পান, ঠাকুমা দেন মাকে, মা দিয়েছিলেন আমাকে। লক্ষ্মী জিনিস—কেউ পরে না, তোলা থাকে। ও ওদের কাজে যাক—তাতেই সার্থক হবে।

অমিত কথা বলিল না। সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

শিগগির নিয়ে যাও দাদা, ঝি মাগী এসে যাবে এখনি।

অমিত কহিল, তুমি রাখ, আমি এ ছোঁব না।

দেখ ক্ষ্যাপামি! এ সেকেলে জিনিস, এখনকার দিনে কেউ পরে না। মাথার সিঁথি, হাতের অনন্ত, বাউটি, এ আবার কেউ রাখে নাকি?

ইচ্ছা হয় সুনীল নেবে, তাকেই দিও। আমি ছোঁব না।—অমিত কিছুতেই গ্রহণ করিল না।

সেদিনকার এই কথাটা অমিত সুনীলের নিকটও গোপন রাখিয়াছে। কারণ সুনীল তাহার এই শুচিবায়ুর আদর্শকে বড় জ্ঞান করে না। সংবাদ পাইলে এখনই সে মিনুর সঙ্গে দেখা করিতে ছুটিবে।

অমিত ভাবিতে লাগিল, আজ মিনুর সঙ্গে আর দেখা করা চলে না; কালই দেখা করিবে। ততক্ষণ বরং এই মজুর-অফিসে দীনু আর মোতাহেরের সঙ্গে কাজকর্ম্মের ফাঁকে একবার সুনীলের কথাটা পাড়িয়া রাখিবে—ভবিষ্যতে এইরূপ তাড়াতাড়ি দরকার হইলে যেন সুনীলকে একটা স্থান দেওয়া যায়। দীনুর ও মোতাহেরের মনোভাবটাও এখনই বুঝিয়া রাখা উচিত।

মজুর-অফিসে থাকিবার মধ্যে আছে কতকগুলি সস্তা হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র। কয়েকখানা আবার বিভিন্ন মজুর-সমিতির মুখপত্র। ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও তুমুল তর্ক, কথা-কাটাকাটি গালাগালি চলিতেছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলিতেছে 'এক্সপ্লয়টার', 'দালাল'; প্রত্যেকে নিজেকে জাহির করে মজুরের এক-মাত্র স্বার্থরক্ষক বলিয়া। 'চটকল' কাগজের কর্ত্তারা 'মজুরে'র কর্ত্তাদের সঙ্গে মসীযুদ্ধ চলাইতেছেন। এই সংখ্যায় তাহার তেত্রিশ দফা তালিকা বাহির হইয়াছে, একেবারে মোক্ষম! 'মুজুরে'র কর্ত্তা মুকসুদ রিষড়ার কলের সাহেবদের থেকে কত দফায় কত টাকা পাইয়াছে, কম্‌রেড শ্যামসুন্দর ঠিকাদারি বা দালালি করিয়া টাকা পায় কি না, কেশোপ্রসাদ বড়বাজারে মারোয়াড়ী স্পেকুলেটারের টাকায় পোষা নহে কি?—এই সব বসিয়া বসিয়া অমিত খানিকক্ষণ পাঠ করিল। কোথায় তাহার সম্মিলিত সংগ্রামশীল দল গড়িবার স্বপ্ন?

মোতাহের বলিল, 'মজুরে' এ সকলের একটা তেড়ে জবাব দিতে হবে। তুমিই না হয় লিখবে, কম্‌রেড অমিত।

আমি? আমি যে এসব তর্কবিতর্কের কিছুই জানি না!

জানার দরকার নেই। জান তো, 'চটকলে'র কর্ত্তা হ'ল সেই সিঙ্গি সাহেব, যিনি সাহেব ও বেনে দরবারে লেবার লীডার সেজে খানা খেয়ে বেড়ান। আইনসভায় তিনি নমিনেশন পেয়ে মজুরের প্রতিনিধি হন। এসব লোকদের কিছুতেই আমরা এই কর্ম্মক্ষেত্রে থাকতে দিতে পারব

না। ওঁদের না তাড়াতে পারলে মজুরদল মাথা খাড়া ক'রে উঠতে পারছে না। প্রথমেই ওঁদের সরাতে হবে।

কিন্তু সরাতে পারছ কই?

চেষ্টা না করলে পারব কেন? চেষ্টা করেছ? ক'রে দেখই না, উঠে-পড়ে লাগ, দরকার হয় মার দিতে হবে। সেজন্যে লোকের অভাব হবে না।

সে কি মোতাহের, মার?—অমিত বিস্ময় প্রকাশ করিল।

নিশ্চয়ই। দরকার হ'লে দু-দশটা খুন ক'রে ফেলতে হয়; ইউনিয়নকে খাড়া রাখতে হ'লে ওসব ভয় করলে চলবে কেন? নইলে তো ইউনিয়নই গিয়ে পড়বে ধনিকদের আওতায়, তাদের ফ্লাঙ্কিদের কর্ত্তৃত্বে। পুঁজিওয়ালা স্থতো টানবে, আর কলের পুতুলের মত মজুর-গুলো ঘুরবে, ভাববে নেতার কথায় সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। ইউনিয়ন সর্ব্বাংশে মজুরদের হাতে আনতে হ'লে এসবে ভয় করলে চলবে কেন?

কিন্তু এ যে ভায়োলেন্স। মজুরদের কাজের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি?—ট্রেড-ইউনিয়নিস্টই হও আর আমার মতো সোশ্যালিস্ট-মজুর-সেবকই হও, বা কম্যুনিস্টই হও, আমরা তো মারধর করতে পারি না। আমাদের টেক্‌নিক, ইডিয়লজি, মত, পথ, সবই যে স্বতন্ত্র।

মোতাহের তর্কের সূক্ষ্ম প্যাঁচ বোঝে না! তাহার মন উগ্র। মোটামুটি লক্ষ্য ও পদ্ধতি তাহার জানা আছে, তারপর পথ ও পাথেয়ের জাতিবিচার সে ঠিক রাখিতে পারে না।

ভাগ্যক্রমে কম্‌রেড দাশ আসিয়া গেলেন। জার্ম্মানি হইতে কেমিক্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিতে অভিজ্ঞ হইয়া তিনি আসিয়াছেন। এখানেই কোথায় কাজ করেন। কিন্তু মনের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছেন থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের শিক্ষা। মজুর-আন্দোলনের ইডিয়লজি তাঁহার

সুস্থির জানা আছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও ভাল জানা আছে টেক্‌নিক। মজুর-বিপ্লবের টেক্‌নিক তাঁহার নখদর্পণে। তিনি বলিলেন, ওয়েল, কমরেড্, আমরা প্যাসিফিস্ট বা সোশ্যালিস্ট নই, যখন দরকার দু-চারটেকে আমরা সরিয়ে পথ কেটে নেব। বাট উই অ্যাব্‌জিওর ইন্‌ডিভিডুয়াল টেররিজম্।

অমিত বলিল 'স্বদেশী'-রাও যে ঠিক এমনই বলে—'আমরা অহিংস অসহযোগী নই; দরকারমত দু-চারটেকে সরিয়ে দিলে দুশোটাই ভয়ে পালাবে। তখন আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে সব ভেঙে গড়ে তুলব, এক্সপ্লয়টেডকে মুক্তি দেব।'

দাশ কৃপার হাসি হাসিয়া কহিলেন, নন্‌সেন্স! আইডিয়া একেবারেই ক্লিয়ার নয়, মেথডও ক্রুড। তাই ওদের সব খিচুড়ি পাকিয়ে যায়।—বলিয়া তিনি ইডিয়লজির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, টেক্‌নিকের মাহাত্ম্য বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। অমিত তাঁহার মতে নারোদ্‌নিক বা সোশ্যাল রেভল্যুশনারি।—'তাদের রোলটা কি ছিল জানেন তো?' দাশ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

অমিত ভাবিল, মন্দ নয়। দাশের কথা কহিবার উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু দাশ তো কথা কহিতে শুরু করিলে থামিবে না। সুনীলের কথাটা যে অমিতের একবার মোতাহের দাঁদুর সঙ্গে বুঝিতে হইবে।

দাশ কি বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিল, সামনের সংখ্যা 'জাহাজী'তে তুমি কি লিখবে?

আমি?—অমিত হঠাৎ উত্তর করিতে পারিল না, কিছুই মনে পড়ে না যে, কি লিখিবে।

কিন্তু তুমি অনেকদিন লিখছ না, প্রায় মাস তিন লেখনি। এবার কিছু লিখতেই হবে।

ভাবছিলাম, এ প্রব্লেমেই লিখব। লেবার, ন্যাশনাল ও ইণ্টারন্যাশনাল।

আমার মনে হয়, এখনও সাধারণ মজুরের দেশগত চৈতন্য লুপ্ত হয়নি, আরও অনেকদিন থাকবে। আর এদেশে এখনও সত্যিকারের ক্যাপিট্যালিজ্‌ম পাকা হয়নি। এদেশের ধনিক যুদ্ধের পরে সবে জন্ম নিয়েছে, তাকে বাধা দেয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ—last stage of capitalism'। সে বাধাকে দূর ক'রে আগে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার গণতান্ত্রিক জাতীয় বিপ্লব। না না, কমরেড দাশ, কথাটা শেষ ক'রে নিই। আপনারা বলবেন, চীন দেখে, অন্যত্র দেখে, আপনারা বুঝেছেন, জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্রের শত্রু। বলুন। আমি বুঝছি—এদেশে মজুরদেরও এখন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্যে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া ক'রে চললে ভাল হয়। ইণ্টারন্যাশনাল মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে এক পংক্তিতে দাঁড়াবার জন্যে এও একটা দরকারী কাজ। কিন্তু আপনারা কি তা অস্বীকার করবেন?

নিশ্চয়ই। কোন দিনই আমরা মজুরকে জাতীয় বিপ্লবীদের হাতে পড়তে দেব না। সে একটা বর্জোয়া কুমতলব। তা ছাড়া, জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মজুরদের জুটিয়ে লাভ নেই, এই হ'ল আমাদের মত। আমরা অনেক ঠকে বুঝেছি, তাতে মজুরের ক্ষতি হয়, বরং বুর্জোয়ার জোর বাড়ে।

অমিতও ছাড়িবে না। ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে ডিমনস্ট্রেশনের কি হবে? কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে একটা বিরোধিতায় যোগ দেওয়া যে আমরা ঠিক করেছি।

এক্ষেত্রে দাশ তাহাতে স্বীকৃত। কারণ এই উপলক্ষ্যে শরফুর সঙ্গে একটা শক্তি-পরীক্ষা হইবে। শরফুকে তাড়ানো সম্ভব হইতে পারে। 'এটা পিওর ট্যাক্‌টিকস-এর প্রশ্ন—স্ট্রাটিজির নয়, ট্যাক্‌টিক্‌সের—যেমন স্পেকুলেটারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্ট্রাইক চালাতেও আমার আপত্তি নেই।' খানিকটা ব্যাখ্যা চলিল, তারপর—

তা হ'লে ডিমনস্ট্রেশনের আয়োজন কর। তুমি একটা অ্যাপীল লিখে ফেল। আগে বাংলায়, পরে হিন্দী, উর্দ্দু করে দেওয়া যাবে।

কথা ঠিক হইয়া গেল। ছাপার ভার লইল দীনু। অমিত কাগজ-কলম লইয়া বসিল, বলিল—দীনু, এক পেয়ালা চা ও একটা ডিম আনিয়ে দিস ভাই। আজ চান-খাওয়া হয় নি।

দাস চলিয়া গেলেন। অমিতের লেখা চলিল—'সর্ব্বহারার দল, এবার তোমাদের দিন এসেছে। তোমাদেরই গায়ের রক্ত শুষে এতদিন বয়লার চলেছে—তোমাদেরই প্রাণের বায়ু জাহাজের চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া হয়ে বেরুচ্ছে; তোমাদের আগুনে-পোড়া কঠিন শবের উপর খাড়া হয়েছে ধনিকের গগনস্পর্শী লোভ।...'

কিন্তু সুনীলের কথাটা একবার আলোচনা করা দরকার। মোতাহের চলিয়া গেল না তো? না, কাগজের কাটিং কাটিতেছে। দীনু একটা উর্দ্দু মজুরের কাগজ পড়িবার অসাধ্য সাধন করিতেছে। এখনই বলিতে হয়—না হয় পরে আবার কেহ আসিয়া পড়িবে।

মোতাহের, তুমি খুন-খারাবিতে বিশ্বাস কর?

অবিশ্বাস করার কি আছে? মারলে মানুষ মরে, এবং না মরলে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়ে না। এই তো সহজ কথা।

তা নয়। মানে এইটাতে মুক্তি সম্ভব হবে ব'লে মনে হয়?

কোন কোন বিষয়ে মোতাহেরের সুবিধা আছে—নিজের ভাবিয়া জবাব দিতে হয় না। এই সব জবাব অন্যের মুখে শুনিয়া শুনিয়া তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পড়িতে পড়িতে পরের কথাকে সে নিজেরই সিদ্ধান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। 'পেটি বুর্জোয়ার রোমান্টিক আত্মোৎসর্গ দেখতে চমকপ্রদ—কিন্তু অকেজো। এরা বরং ভাবী কালে শ্রেণী-সংগ্রামের দিনে মজুরশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে।'

কেন?

নিজ নিজ শ্রেণীবুদ্ধিতে।

এখন সে শ্রেণীবুদ্ধি সত্ত্বেও তারা নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থের কথা তো বলে না। আর তখনই বা কেন বলবে?

মোতাহের শুনিয়াছে, বলে এবং বলিবে। অতএব তাহার দ্বিধা নাই যে, পেটি বুর্জোয়া নিঃস্ব মজুরের শত্রুরূপে দেখা দিবে।

অমিত ভাবিয়া চলিল—কেন? এই বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত খাইতে পায় না, পরিতে পায় না; মজুরের অপেক্ষাও বাস্তবপক্ষে ইহারা বেশী দুরবস্থাপন্ন। শুধু মনে আছে একটা ভদ্রতার ছাপ। সেই মনের ছাপটাই কি বাস্তবের অপেক্ষাও বড় হইবে? এই তো আজ দেখিতেছে অমিত সুনীলদের—

মা বাবা, দাদা বন্ধু সব পর হইয়া গেল, পরমাত্মীয় দূর হইল, সব ছাড়িতে পারিল—নিশ্চিন্ত দিনরাত্রি, তৈয়ারি আহার, অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা,—সবই চুকাইয়া দিল....পথে পথে ঘুরিতেছে, কলের জলে পেট ভরিতেছে, ফুটপাথে ঘুমাইতেছে,....শেষে কি ইহার তুলনায় বড় হইবে পেটি বুর্জোয়ার ছোট চাকরি, মহাজনির পুঁজি বা সামান্য জমিজমার সামান্যতর আয়? শুধু দেশীয় বুর্জোয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এই বিপ্লব ইহাদের? জীবনের অপেক্ষাও তাহাই বড় হইবে? মায়ের কোলের অপেক্ষাও বড় হইবে?...

কিন্তু না, নিবেদনটা শেষ করিতে হয়। 'মজুরের বন্ধু সেজে অনেকে তোমাদের শোষণ করছে। তারাও হচ্ছে ধনিকের দালাল। ধনিক তার শোষণ-কাজ চালাবার জন্যে এদের পাঠায়। এরা নিজের স্বার্থের খাতিরে ধনিকের স্বার্থের কাছে তোমাদের বলি দেয়। এদের পকেট ভ'রে ওঠে ধনিকের ব্যাঙ্ক-চেকে এবং ইয়ুনিয়ন-ফাণ্ডের চুরি-করা টাকায়। এরাই তোমাদের সর্ব্বদা বলবে আপোষ-রফার কথা। এরা উপদেশ

দেবে, ধনিকের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক সহশ্রমীর সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক; আর এরা নিজেরা সে বন্ধুত্বের মধ্যদূত। এই বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের কথায় কান দিয়ে তোমরা তোমাদের প্রাণ ওদের হাতে তুলে দিচ্ছ, ধনিকের বুটের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে দিচ্ছ। মনে রেখ, ধনিক আর শ্রমিক দু জাত। দু জাতের দুই স্বার্থ; তোমাদের না মারলে ওরা বাঁচে না; তোমরা বুক পেতে না দিলে ওরা মোটর-গাড়ি চালাবার পথ পাবে না।' ..

শেষ হয়ে আসছে। এবার শেষ আবেদনটুকু খুব জোর কলমে চালিয়ে দাও।

কলম চলিল। 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক' !—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমিত মুখ তুলিল।

দীনু কহিল, শেষ হ'ল ?

হ্যাঁ, শোন।

অমিত পড়িয়া গেল, দীনু মোতাহের শুনিল। দুইজনেই কহিল. চমৎকার !

ঘড়িতে তিনটা বাজিতেছে। অমিত বড় ক্লান্ত বোধ করিল।

কিন্তু এবার একবার সুনীলের কথাটা ভাবিয়া দেখা যাউক। কি ভাবে তোলা যায় ? প্রথমে আসিবে পদ্ধতির ভালমন্দের তর্ক, তারপর দলের বিচার, তারপর তাহাদের একজনের কথা—এইভাবে আসল কথাটায় একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া পৌছিতে হইবে। ডিরেক্‌ট নয় ফ্ল্যাঙ্ক মু্যভ্‌মেণ্ট।

ধীরে ধীরে অমিত অগ্রসর হইতে লাগিল। মোতাহের প্রথমটা গোঁড়ামি দেখাইল। তারপর কথা উঠিয়া পড়িলে ক্রমশ তাহার ডগমায় যেন সে নাগাল পাইল না, তাহার স্বরও নরম হইল। শেষে সে বলিল—

ইহাদের দোষ নেই। ঠিকমতো কেউ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে না। পথ ঠিক পেলে ওরা কী না করতে পারে? ওরাই আসল জিনিস, খাঁটি মাল। আমাদের সমস্যা গ্যয়ডেন্‌সের সমস্যা। এদের সত্য গ্যয়ডেন্‌স দিতেও চেষ্টা করতে হবে।

তা হ'লে তাদের বুঝতে চেষ্টা কর—কাছে আন। অবশ্য সেও কম রিস্‌ক্‌ নয়।

হ'লই বা। তা ব'লে চুপ ক'রে থাকব? আমি তার জন্যে সব ঝক্কি নেব। যদি দেখি, কেউ নিতান্ত পাগল নয়, ভেবে-চিন্তে প'ড়ে-শুনে কাজ করতে তার ইচ্ছা আছে—আমি তাকে ছাড়ব না—হোক সে সন্ত্রাসবাদী।

অমিত ভাবিল—আর না, এবার ফিরিতে হইবে। আজ ইহার বেশি আলোচনা করিব না। মোতাহেরকে শুধু বোঝানো দরকার যে, একক বা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে শক্তি নষ্ট হয়; সকলকার একত্রিত, সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়াসেই কাজ সম্ভব। দূরে বসিয়া বড় বড় কর্ত্তারা যত বড় থিসিস আর উপদেশ তৈয়ারি করুন, বাস্তব কাজে এমনই মিলিয়া মিশিয়া না চলিলে চলে না। সকল কেন্দ্র হইতে শক্তি আয়ত্ত করিতে হইবে। পাথেয় নষ্ট হইতে দেওয়া কাজের কথা নয়।···আগুনকে যে ভাবে পাই, সেই ভাবেই সে প্রমিথিয়ুসের আশীর্ব্বাদে—সেইরূপেই তাহা গ্রহণ করিব। স্থির প্রদীপশিখা, তীক্ষ্ণ প্রদীপ্ত বহ্নি, খড়কুটার দাউ-দাউ-জ্বলা আগুন, ধপ করিয়া জ্বলিয়া তেমনই থপ করিয়া যা নিবিয়া যায়, সামান্য স্ফুলিঙ্গ—সকলকে নমস্কার। আমাদের হোমানল জ্বালাইতে সকলকেই চাই।

এবার উঠি তবে, একবার অফিসে যেতে হবে।—বলিয়া অমিত গা মোড়া দিয়া দাঁড়াইল।

দীনু বলিল, দাঁড়াও। কোন্‌ দিকে যাবে? কলেজ স্ট্রীট? চল, আমিও যাব, লেখাটা প্রেসে দেব। কিন্তু অনেক টাকা প্রেসে বাকি

পড়েছে, এবার আর ছাপতে চাইবে না। গুটি পনেরো টাকা না হ'লে যে ছাপার কাজও বন্ধ হতে চলল। শরফুদ্দিন তো ফাণ্ড আগলে ব'সে আছে। কি যে করব!

টাকা—টাকা—টাকা। সুনীলের টাকার দরকার—'শ দেড়েক টাকা চাই অমিদা।' অথচ, সে টাকার কি হইবে কে জানে? হয়তো নিতান্ত অদ্ভুত একটা কিছু! কি হইবে তাহাতে?

জনগণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এসব প্রয়াসে অমিত বিশ্বাস হারাইয়াছে অনেকদিন; অথচ সে জানে, ইহার রোম্যান্টিক অ্যাপীল মধ্যবিত্তদের পাইয়া বসিয়াছে। প্রকাণ্ড পৃথিবীর ভিত্তি অবশ্য তাহাতে বিন্দুমাত্রও নড়িবে না। ছেলেটাই শুধু পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। এই সব অমিতের ভাল লাগে না। তাহার বুদ্ধি, চেতনা, জীবন, অতীত অভিজ্ঞতা দিয়া সে বিচার করিয়া দেখিয়াছে, সুনীলের কোথাও সুযুক্তি নাই। আছে একটা দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা—নিজেকে নিঃশেষে ডালি দিবার নেশা। অথচ সে বলি হাত তুলিয়া কে লইবে? 'সে দান কি নিবেন জননী প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?'

দীনু ও অমিত বাসে চড়িয়া বসিল। অমিত ভাবিতেছিল, এ যেন হাউই—আঁধার চিরিয়া একটা আগুনের টান টানিয়া দিয়া যায়। ক্ষণকালের জন্য চোখ ধাঁধিয়া দেয়—পরক্ষণেই আবার গর্জ্জমান তিমিরস্রোত পৃথিবীর চারিদিকে খলখল করিয়া হাসিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।....

দীনুদেরও টাকা চাই। তাহাদের দাবিটা কম। কিন্তু সেই টাকায় আগুন জ্বলিবে।......না, খড়কুটার এ আগুন কবে জ্বলিবে, সে ভরসায় সুনীল বসিয়া থাকিবে না। ইহাদের লক্ষ্য দূর—এখনো যোগাড় তাই সামান্য। তাহার ফলও তেমনই অনিশ্চিত। আয়োজনটা এমনই তুচ্ছ। এত তুচ্ছ যে, ইন্দ্রাণী দেখিয়া বিশ্বাসই করে না। সুনীল এই সব কথা

শুনিলে হাসিয়া গড়াগড়ি যায়। 'কাগুজে বিপ্লব—ও আবার একটা বিপ্লব!' অথচ বিপ্লবের সত্যিকার মানে সুনীল ওরাই কি জানে?—যে বিপ্লব প্রকৃতিরই একটা ধর্ম্ম?

অমিত জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা কবে পেলে চলে, দীনু?

কাল পেলেও চলে।

কাল সন্ধ্যায় হ'লে হবে?

হতে পারে।

কাল সন্ধ্যায় আমি অফিসে দেব।

অমিত হিসাব করিল—সাতকড়ির টাকাটা না পাওয়া যায়, 'রঞ্জন' পত্রিকার প্রবন্ধের টাকাটা পাওয়া যাইবে। তেইশ-চব্বিশ টাকার পনের টাকা গেল এইখানে, টাকা সাত দিতে হইবে পুরানো পুস্তকের দোকানে ইসাককে। লোকটা ভাল, অমিতের কাছে বোধ হয় ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পায়—একবারও তাগিদ দেয় না। এই পৃথিবীর সমস্ত পাওনাদারগুলি যদি এমনই ভদ্রলোক হইত!...

দীনু ধীরে ধীরে কহিল, অমিদা, সেই তাদের কারও সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?

কাদের সঙ্গে?

যাদের কথা বলছিলে?

কেন? কি হবে?

দেখতাম।

কেন? জীবনে দেখিস নি নাকি?

দেখেছি। দেখে কেবলই হতাশ হয়েছি। ওদের কথায়, লেখায় যেন সস্তা সেন্টিমেণ্ট—আসল জিনিস পাই নি। নিশ্চয়, আসল জিনিস থাকলে এত কথা—এত বীরদম্ভ করে না। তাই, আসল লোক এক-আধটা দেখতে চাই।

আসল না নকল চিনব কি ক'রে? আর চিনলেই বা কি লাভ? যে আসল, সে হয়তো আরো গোঁড়া।

অমিত আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করিল, চিনেই বা কি লাভ? দীনু উত্তর দিল না।

হঠাৎ সে কহিয়া চলিল, লাভ হবে কিনা জানি না। হয়ত হবে—একটা উৎসাহহীন, উদ্যমহীন, সুদূর স্বপ্নের জন্যে চলেছি। হয়তো দূরের স্বপ্নটা নিকট হয়ে উঠবে, বুকের মাঝখানে তার স্বরূপ দেখতে পাব, চোখ বুজলে তার স্পন্দন অনুভব করতে পারব। হয়তো আর চোখ বুজতেই পারব না—চোখের ঘুম টুটে যাবে। কিন্তু চোখ জুড়োবে, প্রাণ এই ছটফটানি থেকে মুক্তি পাবে।

অমিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, কি বলছিস? অধীর হয়েছিস কেন?

কেন? সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলে দেখব মায়ের মুখ কালো—অন্ধকার। বাবা তো কথাই বন্ধ করেছেন। দাদারা আমার খাওয়া-পরা দিতেও অনিচ্ছুক। তখন মনে পড়বে সমস্ত দিনের কাজের হিসাব, কি করেছি? সকালে পড়েছি এক রাশ পুস্তিকা। দুপুরে ঘুরেছি ডকে ডকে। এখন চলেছি ছাপাখানায়। এর কোন্ কাজটুকু নিয়ে তৃপ্তি পেতে পারি? কি দিয়ে মনকে বোঝাতে পারি, বাড়ির গঞ্জনা সার্থক—সব গ্লানি মিথ্যা!

…'মা, বাবা!'….অমিত নিমেষ মধ্যে একবার তাঁহাদের মূর্ত্তি যেন দেখিতে পাইল। আজ অমিত বাড়ী ফিরে নাই, তাঁহাদের দুঃখ-দুর্ভাবনার অন্ত নাই। এখনও কি তাঁহার মা বসিয়া আছেন? হয়তো আছেন—অমিতের ঘরে খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া হয়তো নিকটেই খাটে শুইয়া পড়িয়াছেন মা—ঘুমে চোখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।…বড় অন্যায় অমিতের, কিন্তু অমিত করিবে কি?

বড় অন্যায় দীনুর। কিন্তু দীনুই বা করিবে কি? মা কাঁদিলে মেজাজ

খারাপ হয়। বাবা কথা বলিলে মাথা নোয়াইয়া রাগে ফুলিতে থাকে। দাদারা উপদেশ দিলে যাহা-তাহা বলিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসে। আবার মা খোঁজ করিয়া বাড়ি আনেন—এ সবই অমিত জানে। অমিতেরই সহ্য হয় না—দীনুর কিরূপে সহ্য হইবে? প্রাণ তাহার জ্বলিতেছে যে।···সাবধান, সাবধান অমিত, এ আগুনকে ব্যর্থতার পথ হইতে ফিরাও তুমি।

অমিত সান্ত্বনা দিল—ও রকম হয় দীনু। ওঁরা সাংসারিক লোক, নিজ নিজ বোঝা ঠেলতেই ওঁদের জিব বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমি ভাবি, ওঁদের কেন সেরূপ মনের প্রশস্ততা নেই? তা থাকলে সংসার একদিনেই অচল হ'ত; দুনিয়াটা ক্ষ্যাপার কারখানা হয়ে যেত। ওঁদের হাঁড়িকুঁড়ি, ছোট স্বার্থচিন্তার মধ্যে বেঁধে রাখাই হ'ল সমাজের কাজ, সংসারের কাজ। ওঁরা আছেন ব'লেই তুমি-আমি ওদের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সংসারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাই। এই ক্ষুদ্রচেতা মানুষগুলোর কাঁধে পা রেখে দাঁড়িয়ে নিজেদের উদার দৃষ্টির, প্রশস্ত মনের বড়াই করি। বেশ তো, শুনি না হয় দুটো কড়া কথা, দেখি দু ফোঁটা চোখের জল,— তবু দিনটা তো চ'লে যাচ্ছে, নিজেদের সামনেকার লক্ষ্যে তো আমরা এগিয়ে চলেছি—

না, তা চলছি না, দিন যাচ্ছে না—এই আমার আপত্তি। নাহলে ওদের বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। এখনও দু-তিন টাকা কাকীমা দেন; বাস-খরচ চলে, না থাকলে হেঁটেই ঘুরি। বাড়ির ধোপায় কাপড় কাচে, জামা-জুতো বাড়িতেই জোটে, চুল কাটতেও পয়সা-খরচ নেই। সকালেও বাড়িতে চা খাই—দুবেলা ভাতও পাই। কিন্তু, কি জন্যে তাদের এই দুঃখ দেওয়া আর আমার এই লাঞ্ছনা পাওয়া? কাজের জন্যে?—সে কাজ এগুচ্ছে কোথায়? এই ভাবে দিনের পর দিন ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে শেষ হওয়া যে অপমানকর, আত্মার অকল্যাণ!

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দীনু আবার বলিল, রাত্রে শুয়ে এক-একদিন ভাবি—ওই ট্রাম-লাইনের ওপর মাথাটা পেতে শুয়ে পড়ি—সব চুকে যাক, মাথার ভেতরকার সুতীব্র জ্বালা শান্ত হোক।

অমিত সকরুণ হাস্যে কহিল, ক্ষ্যাপামি করিস না। কাজ ঢের আছে, কিন্তু লোক তত বেশি নেই। মনের তৃপ্তি পাবি, এই আশাই যদি করিস, তা হ'লে একাজের দিকে না যাওয়াই ভাল। কারণ যে কাজে তৃপ্তি, সে কাজ কিছুতেই তেমনটি হয়ে ওঠে না। উঠলে কাজটাই খেলো হয়ে যেত। আইডিয়ালের অভিশাপ জীবনে লাগলে সে জীবন চিরদিনই শরশয্যা হয়ে থাকে, কিছুতেই তাতে তৃপ্তি থাকে না, প্রাণ এমনই পুড়ে যায়। সংসারই মানুষকে দেয় তৃপ্তি, আইডিয়াল দেয় তাড়না, যাতনা, আকুল বেদনা, আকণ্ঠ পিপাসা।···মনে মনে অমিত বলিল, the crown of thorns···

সংসারেই দেয় তৃপ্তি—অমিত ভাবিল,—যেমন শৈলেন পাইয়াছে তৃপ্তি। এখন আর নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের কথা তাহার মনেই জাগে না। যদি মনে জাগিত, তাহা হইলে শৈলেনের মাথায় সে তাড়না চাপিয়া বসিত, তাহার দেহ এমন পুষ্ট হইতে পারিত না, মন এমন স্থির রূঢ় হইতে পারিত না। সংসার শৈলেনকে তৃপ্তি দিয়াছে,—একমাত্র সংসারই মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে। আইডিয়াল দেয় crown of thorns···

সত্যই সংসার তৃপ্তি দিতে পারে কি? ইন্দ্রাণীকে, সুধীরাকে দিয়াছে তৃপ্তি? সাতকড়িকে, শৈলেনকে দিয়াছে কি? দুই-এক নিমিষে উহার সে মায়া ভাঙিয়া পড়ে না? সংসার তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারিত কি, অমিত? তুমি পারিতে সকালে কাগজ পড়িয়া, চা টোস্ট খাইয়া, নীরোগ দেহ আরামে দুলাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে কলেজে যাইতে? অধ্যাপক সহযোগীদের সঙ্গে চোঁয়া ঢেকুর তুলিয়া নূতন কপি ও গলদা-

চিংড়ির দর লইয়া গবেষণা করিতে? বাড়িতে ফিরিয়া টিফিন-শেষে সন্ধ্যায় হয় টিউশনি না হয় কালচারিস্ট মহলে আড্ডা দিয়া রাত্রির আহারে বসিতে? তারপর বড় জাজিম-পাতা নরম বিছানায় গৃহিণীর আলিঙ্গন-পাশ-বদ্ধ হইয়া শুনিতে, 'হ্যাঁগা, সেই লাল রঙের বেনারসী, খোঁজ করেছিলে?' পারিতে তুমি অমিত? এই পরম তৃপ্তিকর নির্ঝঞ্ঝাট কালচার্ড সাংসারিক জীবনে তৃপ্তি পাইতে? ভাবিয়া দেখ অমিত, কি চমৎকার prospect…

একটা গুমট দিনের অন্ধকার!—পৃথিবীর হাঁপ ধরিয়াছে, রাত্রির মুখও ছাইরঙের মেঘে ঢাকা—ইহাই সংসার। ইনফার্নো। অমিতই খেলাচ্ছলে বিবাহোদ্যোগী বন্ধুকে লিখিয়াছে—All hopes abandon ye who enter here.

দান্তের ইনফার্নো অমিতের মনে পড়িল।—না, সংসার তেমনতর বড় নরককুণ্ডও নয়;—এ একটা painless slaughter। উহার কবলে মানুষ আপন সত্তাকে হারাইয়া ফেলে। উহার ভিতরে এক জারক রস আছে,—যেন সেই জিঘাংসু বৃক্ষপত্র কীটপতঙ্গ যাহা পায় হাত বাড়াইয়া টানিয়া লয়, আপনার বৃক্ষতলে চাপিয়া ধরে। সংসারও তেমনই—মানুষ যেন দমে সিদ্ধ হইতেছে।

অমিতের মনে পড়িল—সুনীলের প্রসন্ন হাস্য। সংসারছাড়া উহাদের হাসি; চোখে অতৃপ্তির জ্বালা, কিন্তু সাংসারিকের জীবনের নিষ্প্রভতা নাই। মনে যেন উহাদের একটা কি'রঙ ধরিয়াছে! প্রেমে পড়িলে মানুষের জীবনে যে অতৃপ্তি আসে, যে রঙিনতা আসে, আই-ডিয়ালের আলিঙ্গনে তেমনই অতৃপ্তি, তেমনই নেশা, তাই না অমিত? একদিন তুমিও ইহার স্বাদ পাইয়াছ। আজ?…সুনীলদের দেখিলে তোমার তাহাই মনে হয় না? অতৃপ্তি! কিন্তু, কী তীব্র তাহার নেশা! না হইলে তুমিই বা ঘুরিয়া মরিতেছ কোন্ আনন্দে?

এইবার অমিতের নামিতে হইবে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দীমু কহিল, একটা কথা—একবার আমি তাঁদের একজনকার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁদের বুঝে না দেখলে হয়তো আমি নিজেকেই বুঝতে পারছি না। কোন দরকার হ'লে আমাকে ডাক দিও, অমিদা।

অমিত একটু বিস্মিত হইল, বলিল, তা হবে। এখন অতটা অধীর হ'স নে!

বাস হইতে নামিয়া মিনিট চার হাঁটিলেই অমিতের অফিস। অমিতের শরীরটা ক্লান্ত। ধীরপদে সে অগ্রসর হইল, মনে জাগিতে লাগিল দীমুর কথা।

দীমু প্রথমে ছিল অমিতের ছাত্র, এখন হইয়াছে বন্ধু। বছর খানেক পূর্ব্বে আন্দোলনের মুখে এই ছিপছিপে তীক্ষ্ণধী ছেলে হঠাৎ কলেজ ছাড়িয়া দিল। স্রোতোমুখে ছয় মাস দমদম জেলে কাটাইল। আর কলেজে ঢুকে নাই, কংগ্রেসের ছায়া মাড়ায় নাই। নানা কারখানায় ও অফিসের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সেখানেই সে অমিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়া উঠিল। কথা দীমু অল্প বলে। দেখিতে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা রোগা হইয়াছে—কপালের উপর শিরাটি জাগিয়া উঠিতেছে, চোখের দৃষ্টি স্থির উজ্জ্বল—কেবল মাঝে মাঝে তাহাতে কি জ্বালা জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সে বড় চাপা ছেলে—মুখে কথা ফোটে না। ফুটিলে ভাল হইত! তাহা না হওয়াতে তাহার অন্তরের মধ্যে বিক্ষোভ ও ভাবাবেগ আবর্ত্ত সৃষ্টি করে।...বাঙালীর সর্ব্বভোলা হৃদয়াবেগ উহাকে কি ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে? স্থির দীর্ঘদিনের কাজ ছাড়িয়া সেও কি চলিবে অস্থির বিক্ষুব্ধ আত্মাহুতির দিকে? এই কি বাঙালী-প্রকৃতি?

দীমু ছেলেটি ছেলেমানুষ; কিন্তু কোথায় গিয়া ঠেকিবে সে? তাহার চেহারা শীর্ণ হইয়াছে, মুখে কথা নাই; কিন্তু চোখে একটা অস্থিরতা অশান্ত বিদ্যুতের মত চমকাইতেছে।

না, দীমুকে লইয়া দুর্ভাবনা আছে। মোতাহেরের মত সে ডগ্‌মার কাছে নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারে নাই; দাশের মত আধা-শৌখিন, আধা-ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ইডিয়লজি ও টেক্‌টিকস্‌ লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; মজুর কর্ম্মীর উপযোগী স্থিরতা ও ধৈর্য্যও তাহার নাই। তাহার মনের গঠন স্বতন্ত্র; ইহাদের মন যেন বারুদের স্তূপ।...

বারুদের স্তূপ—বারুদের স্তূপ। বিজয়কে দেখিয়াও তাহাই মনে হইত; সুনীলকে দেখিয়াও তাহাই অমিত বুঝিয়াছে। একটা দুর্নিবার রুদ্ধ আবেগে যেন উহারা ফাটিয়া পড়িতে চায়—আপনার মধ্যে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিয়া আগুনের দীক্ষা মাগে—চাহে স্ফুলিঙ্গের প্রাণস্পর্শটুকু শুধু।

সমস্ত দেশে আজ আগুনের ফুলকি খেলিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে একটা ছুটিয়া একবার এই বারুদের স্তূপে পড়িলেই হইল, তারপর সুনীল ও দীমু এইরূপে জ্বলিয়া শেষ হইয়া যাইবে।

They also serve who only stand and wait। কিন্তু কেন এই সত্যটা দীমু বুঝিয়াও বুঝে না? সে মূঢ় নয়, রোমাণ্টিকও নয়। তথাপি কেন তাহার এই অধীরতা? অমিত, ইতিহাসের ছাত্র অমিত, তুমিই ইহা বুঝিতে পারিয়াছ?

ইহাই বুঝি বাঙালীর প্রকৃতি—উজ্জ্বল হৃদয়াবেগ কূল ছাপাইয়া উঠে, আপনাকে দিকে দিকে লুটাইয়া বিলাইয়া দিয়া শেষ হইতে চায়। আর, যদি প্রথম যৌবনের এই কোটালের জোয়ার একবার কাটিয়া যায়, তাহার পরে আর তাহার ভয় নাই, তাড়া নাই, অধীরতা নাই—কেরানীগিরির বাঁধানো তীর ও ক্ষুদ্র পরিবারের ক্রমবর্ধিষ্ণু বাঁধের মধ্যে জীবনের অগভীর স্রোত শান্ত মন্দীভূত হইয়া থাকে।

প্রমাণ দেখ, আজিকার সুনীল আর তাহার ভাই অনিল।...অকস্মাৎ

জলিয়া শেষ না হইয়া গেলে সুনীল ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে পোড়া অঙ্গারে পরিণত হইবে—সংসার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে।···

কিন্তু জীবনের দেবতা? প্রাণসূর্য্য? তিনি হাসিবেন, না কাঁদিবেন?

অফিসে প্রবেশ করিতে করিতে অমিত আবার একবার দীনুর কথা ভাবিল।

দীনু পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না—কে তাহাকে পথ দেখাইবে?···পথ নিজেকেই খুঁজিয়া লইতে হয়। কাহার পথ কোন্‌টি, সে নিজে ছাড়া কে বলিতে পারে? সুধীরার পথ—ইন্দ্রাণীর পথ—কে দেখাইবে?···

তোমার পথই কি তুমি চিনিয়াছ, খুঁজিয়া পাইয়াছ, অমিত?

৯

সিঁড়ি বাহিয়া অমিত উপরে উঠিতেছিল—নিচেকার মেসিন-ঘরে মেসিন সশব্দে চলিতেছে। অন্ধকারে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে—সেই ঘরটায়। তাহার পিঙ্গলাভা সিঁড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে! কাজ চলিতেছে পূর্ণগতিতে—সময় নাই। অমিতেরও ভাবিবার সময় নাই। এখনই কলম লইয়া বসিতে হইবে। তবু চকিতের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত মনে প্রশ্নটা আবার খেলিয়া গেল—তোমার পথই কি তুমি চিনিয়াছ? ইতিহাসের গবেষণা, শিল্পের আরাধনা, গান, বই, সুন্দর আলোচনা? ভাল কবিতা, তারাভরা আকাশ, দুকূলহারা নদী, তুষারমৌলি পাহাড়? সমাগত শ্রমিক-বিপ্লব, ইন্দ্রাণীর উন্মাদ গতি, সুনীলের ক্ষ্যাপামি?....

সিঁড়ি ফুরাইয়া গিয়াছে। দুইখানা লম্বা টেবিলের দুই দিকে চারিজন যুবক মাথা গুঁজিয়া লিখিতেছে, প্রূফ দেখিতেছে, কাগজের কাটিং কাটিতেছে—মুখে বিরক্তির রেখা।

অমিত প্রবেশ করিতেই একজন চোখ তুলিল।

ওঃ, এসে গেছে যা হোক। নাও তোমার কালকের প্রূফ। দেখে দাও, ভাই, চট ক'রে। মেসিনে এখনই উঠবে—চারটে বেজে গেছে।

তুমিই দেখে দাও না।

মাপ কর ভাই! তোমার 'উর' আর ক্যাল্‌ডিয়ান সভ্যতার সঙ্গে—সুমার-কুমার কোনো সভ্যতার সঙ্গেই—আমার পরিচয় নেই। আর মার্শ্যালের হরপ্পা বা মোহেঞ্জোদড়োর ছবি আমি চোখেও দেখিনি। এক মার্শ্যালকে চিনতাম—কলেজে থাকতে, সে ইকনমিস্ট। ভুলে গিয়ে এখন বেঁচেছি।

অমিত প্রূফ লইয়া বসিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মনও বিরক্ত হইয়া উঠিল। উঃ, এত ভুলও হইতে পারে! বাংলা ভাষায় না হয় বানানের নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইংরাজীতে এখনও লেখক ও মুদ্রাকরের সেই স্বরাজ বিঘোষিত হয় নাই। আর অমিতই বা এ কি লিখিয়াছে? বাসি খাদ্য, এঁটো পাতা। কিছুই নাই। সবই কোন-না-কোন গবেষকের লেখার চর্ব্বিত চর্ব্বণ—মেসোপটেমিয়ার নদীতীরে ও সিন্ধুর নদীতীরে সুপ্রাচীন সম-জাতীয় সভ্যতার নিদর্শন—মোহর, বৃষ ও অজ্ঞাত লিপি; এই অভিনব পৌর-সভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় প্রাচীন সভ্যতার যোগাযোগ; ঐ দক্ষিণাপথের প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার-মালা; জালায় সমাহিত শব, বালুচিস্তানের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মুসলমান ব্রাহুই জাতের অস্তিত্ব;—এই সমুদয় তথ্যকে এক প্রশস্ত দৃষ্টিতে সুগ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে অমিত—ইহাই তাহার প্রবন্ধ। ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য্য যুগের ইতিহাসের যে পাতাটা খুলিয়া গিয়াছে, সেই পাতাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা—এই হইল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অতি সস্তা, অতি বাজে কাজ; শুধুই পরের কথাকে আবৃত্তি করা, পরের চিন্তার জাবর কাটা—ইহাতে মন বুদ্ধির কি সার্থকতা আছে? কিন্তু ইহাই জার্নালিজম্। অর্থাৎ চিন্তাশক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া কথার পর কথা গাঁথিয়া যাওয়া।...

প্রূফ দেখিতে দেখিতে অমিত ভাবিতেছিল, কি গ্লানিকর এই কাজ! নিজের চিন্তা ও চেতনাকে কেবলই ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার চিন্তা মুক্তি, চেতনা আত্মপরিচয়? এই পৃথিবীর জীবিকার হাটে তাহাদের সে সুযোগ জুটিতে পারে না। অমিতের মনে পড়িল, 'জীবিকার যূপকাষ্ঠে মানুষ আপনাকে বলি দেয়।' সত্যই তাহাই। মনে করো কলেজের সেই দুই শত ছেলের মুখ—চারিটা বাজে—তাহাদের মুখে ক্লান্তি, চোখে হয় নিদ্রা, না হয় শ্রান্তি; শুষ্ক,

ভাবলেশহীন, বুদ্ধিদ্যুতিহীন দুইশত মুখের সামনে দাঁড়াইয়া তুমি চেঁচাই-তেছ—'ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ নাই, ট্রপিকের জলবায়ুতে তাহা নষ্ট হইয়াছে, বার বার আক্রমণকারীর হাতে তাহা ধ্বংস হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতবাসীর ঐতিহাসিক বোধও ছিল না।'...১৯২৮এ ইহা বলিবে, ১৯২৯এ ইহাই বলিবে, ১৯৩০এও আবার বলিবে ইহাই। ছাত্রের দল বদল হইতেছে, তথাপি বছরের পর বছর তেমনই নিষ্প্রভ মুখ, শ্রান্ত নয়ন তোমার সম্মুখে থাকিয়া যাইতেছে। আর তেমনই একটু লজ্জা ও বেদনামিশ্রিত স্বরে তুমি চেঁচাইতেছ—'ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ নাই, ট্রপিকের জলবায়ুতে তাহা নষ্ট হইয়াছে।' একই গল্প, একই প্রশ্ন, একই কৌতুক পর্য্যন্ত। বছরের পর বছর একই কথা আবৃত্তি করিবে, ইহারই নাম প্রফেসরি। একই ভাবে মাথা নাড়িয়া, ঘাড় একটু কুঁচকাইয়া, চোখ একটু বাঁকা করিয়া, সেই ইংরেজী অধ্যাপকের মত—যিনি তোমাদের দাদাদের সময়ে, তোমাদের সময়ে ও এখনকার দিনেও, একই রূপে চসারের প্রোলোগ পড়াইয়া ছেলেদের একই বাঁধা রঙ্গ-কৌতুকে হাসাইতেছেন,—নিজের একই হিউমারে তুমিও নিজে হাসিবে। অথচ পৃথিবী চঞ্চল গতিতে উন্মাদপ্রায়, আর তুমি সেই ডায়লেক্‌টিক-এর ছাত্র।...

কোথায় পাইবে চিন্তা মুক্তি, চেতনা পাইবে আত্মপরিচয়?

অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া বলিল, অমিত, চা-টা খাওয়াবে?

নিশ্চয়।

এই অফিসে অপূর্ব্ব অমিতের সান্ত্বনা। দেখিতে সে কালো, মোটা, কিন্তু তাহার নিজের বিশ্বাস, সে একহারা, সুশ্রী, 'ঠাকুরমূর্ত্তির মত'। গলা তাহার মন্দ নয়, কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে সে অজ্ঞ; তথাপি তাহার বিশ্বাস, সে গাহিলেই সকলে—বিশেষত মেয়েরা—বিমুগ্ধ হয়। সিম্ফনি, হারমনি, মেলডি, ইহাদের বিশেষত্ব কি, তাহা তাহার জানা নাই; কিন্তু সে

প্রাণপণে নোট টুকিতেছে, একটি উপন্যাসের বিলাতফেরত নায়কের মুখে বসাইয়া দিবে। ড্রইং-রুম ও বিলাতফেরত জীবন তাহার অচেনা; কিন্তু লোভের মাথায় সে উহাদের আজব চিত্র আঁকিয়া ফেলে। ঘর হইতে দুই পা বাহির হইতে সে ভয় পায়, কিন্তু ভ্রমণকাহিনী তাহার প্রিয়, বিশেষত অভিযাত্রীদের গল্প। বিবাহ হইয়াছিল সাধারণ ভাবেই; কিন্তু বন্ধুদের মহলে বলিতে ছাড়ে না যে, উহার পিছনে একটা রোমান্স আছে। স্বগ্রামে বহু বালিকার সহিত একসঙ্গে সে বাড়িয়াছে—স্বচ্ছ সাধারণ সেই গ্রাম্য ভদ্রঘরের বালকের জীবন। যৌবনের এপার হইতে এখন সে ভাবে, সেই সকল গ্রাম্য সঙ্গিনীদের প্রত্যেকরই সহিত তাহার একটি রোমাণ্টিক মধুর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হইয়া আছে। সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ করিয়া গল্প করিবার, বড়াই করিবার—নিজের কথা বাড়াইয়া বলিবার বিদ্যা তাহার আছে। সকলেই জানে, তাহা মিথ্যা; সে নিজেও তাহা জানে; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—সে বলিয়াই খুশি। তথাপি তাহার বিশেষত্ব এইখানে নয়, অন্যখানে। সে দুঃখের হাতে ঘা খাইয়াছে, বহুভাবে বহুবার ঘা খাইয়াছে। অনেক ছোট ছলনার, সামান্য ভীরুতার আশ্রয় লইয়া নিজেকে দুঃখের হাত হইতে অপূর্ব পরিত্রাণ করিয়াছে। তাই টাকার মূল্য সে বাধ্য হইয়াই চিনিয়াছে। সে জন্যই আজ চা-টাও পরের পয়সায় খায়, বই পড়ায় নেশা পরের উপর মিটায়। এই সবই সত্য, অমিত জানে—তবু অপূর্বর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে—তাহার জীবন-বোধ কাঁচা নয়।—ক্ষুদ্রতাই জীবনের সত্য পরিচয়—মুহূর্তের দেখা, সামান্য হাসিগল্প, ক্ষণস্থায়ী মিলন, বহুলোকের যাওয়া-আসা, অর্থহীন কথাবার্তা, অকারণ ভয়, অনিচ্ছায় ছলনা—এই সকল লইয়াই জীবন। কারণ জীবন-দেবী এই সকলের মধ্যে দিয়াই, ইহারই ফাঁকে ফাঁকে, মধুভাণ্ড লইয়া দাঁড়াইতেছেন—তাহাও পান করিতেই হইবে। যুগের পর যুগ এমনই জীবনস্রোত একই রূপে বহিয়া

চলিতেছে—সকল দেশে, সকল কালে, সকল মানুষের চিত্তভূমিতে। দীনু বুঝিবে না, কিন্তু অপূর্বর এই জীবনবোধ নিতান্ত মিথ্যা নয়। অমিত ইহা বুঝে বলিয়াই অমিতের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্দ্য।

অপূর্ব বলিল, চা-টা খাওয়াবে?

নিশ্চয়। কিন্তু 'টা'-টা কি হবে বল তো? শরীর ভাল নেই, আজ খাইওনি কিছু।

অপূর্ব বলিল, চানও করনি দেখছি।

ঠিকই দেখছ।

কি হয়েছিল?

শরীর ভাল নেই।

অথচ বাড়ী ছিলে না।

কে বললে?

তোমার খোঁজে এসেছিল।

কে?

আমি ছিলাম না তখন, চিঠি রেখে গেছে।

অমিত চিঠি লইল। ইন্দ্রাণী চৌধুরীর চিঠি। অমিতকে তাঁহার চাই—আজ বিকালের পূর্বেই। ইন্দ্রাণী তাহাকে সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। 'কোথায় তুমি? শীঘ্র এস। বড় জরুরি।' অমিত ভাবিতে লাগিল, বিকালের পূর্বে সে কি করিয়া যায়? কোথায় বা পাওয়া যায় ইন্দ্রাণীকে? পাওয়া চাই-ই যে।···অন্তরের উৎসাহবশে কোথায় ইন্দ্রাণী ধাবিত হইতেছে, নিজেই সে জানে না। কিন্তু তাহার এই অনভিজ্ঞাত যাত্রার পথে যতটা সম্ভব সে অমিতের পরামর্শ লাভ করিবে, ভুল হইতে থাকিলে অমিত তাহাকে রক্ষা করিবে—এ নৈতিক দায়িত্ব কখন হইতে দুইজনেই তাহারা মনে মনে যেন মানিয়া লইয়াছে।

ইন্দ্রাণীর এত কি দরকার? দরকার তাহার বড় ছোট নানা কারণে

প্রায়ই, অমিত তাহা জানে। অর্থাৎ দেখা অমিতের করিতেই হইবে। তবে সুনীলের কাজ মিটাইয়া—সে দরকারের কাছে ইন্দ্রাণীর দরকারও বড় নয়। অমিত বলিল, আজ যে আমার সময় হবে, তা তো মনে হয় না।

অপূর্ব বলিল, আর এক ভদ্রলোক তোমার খোঁজ করতে এসেছিলেন অফিসে। তাই জানলাম।

অমিত বুঝিল, তাহার ছলনা টিকিতেছে না; বলিল, কে এল? নাম জান?

নাম বললে না। বললে, 'আমার সঙ্গে দেখা হবে।'

কি রকম দেখতে?

ময়লা রং, গায়ে লম্বা শার্ট।

অমিতের সকালবেলার কথা মনে পড়িল। কিন্তু কত লোকই তো এরূপ থাকে—অমিত ভাবিতে লাগিল।

কি, তোমাদের মজুর-অফিসের কেউ নাকি?—অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল।

হবে। কিন্তু কে, বুঝতে পরছি না।

তা গেছলে কোথায়?

অমিত হাসিয়া বলিল, সে তোমার শুনে কি হবে?

শুনিই না।

মিস্টার বসুদের বাড়ি—মিস বসু ডেকেছিলেন। আবার এখানেও দেখছি চিঠি পাঠিয়েছেন তারপর।

মিছে কথা।

বেশ, তাই।

মিস বসু বিদুষী, সাহিত্যিকা। তাহার সহিত কি একটা মজলিসে অমিতের পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু অপূর্বের বিশ্বাস—মিস বসু ডাকিলে একমাত্র তাহাকেই ডাকিবে, তাহার লেখার প্রশংসা করিবার জন্য—

'অপূর্ববাবু, কি চমৎকার আপনার লেখা! আমি যে কতদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি '···না, অপূর্ব বিশ্বাস করতে চাহে না যে, মিস বসু অমিতকে ডাকিয়াছে। বিশ্বাস করিতে সে পারেও না।

অমিত তাহা বুঝিত। বুঝিয়াই অমিত তাই একটু রঙ্গ করিতেছিল, দেখিতেছিল অপূর্বর কাণ্ড। ইতিপূর্বেই অমিতের নামীয় চিঠিখানার খামের উপর স্ত্রী-অক্ষরের লেখা অপূর্ব দেখিয়াছে; আগ্রহে তাই সে অধীর হইয়া রহিয়াছে এতক্ষণ।

অপূর্ব এবার খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তারপর কহিল, এখন কি খাবি? ওঁদের যা আদর, তা তো বুঝেছি, খেতেও বলে নি।

অমিতের সৌভাগ্যটা বিশেষ কিছু নয়, মিস বসু তাহাকে তেমন সমাদর করিতে পারে না, অপূর্ব এই কথার দ্বারা তাহাই ভাবিতে চেষ্টা করিল, নিজেকে অন্তত বুঝাইতে চাহিল। অমিত মনে মনে তাই হাসিল, কহিল, বলবেন না কেন? আমি বললাম, এইমাত্র খেয়ে এসেছি।

এখন কি খাব তা হ'লে?—অপূর্ব মিস বসুর কথাটা ভুলিতে চায়, অন্য কথা পাড়িতে চায়, অথচ কথাটাকে সে ভুলিতেও পারিতেছে না।

অমিত মনে মনে হাসিল। বেয়ারাকে ডাকিয়া অমিত খাবারের হুকুম দিল। অপূর্ব কহিল, জগু, আমার সে টাকাটার কত ফেরত আসবার কথা?

এগারো আনা।

এগারো আনা কেন? সাড়ে এগারো আনা থাকবার কথা—বেয়ারা হিসাব দিল, দু'পয়সার পান খেলেন যে সে বাবু।

তাকে পান দিতে কে বললে?—আমি বলেছি?—বেয়ারা হতবুদ্ধি হইল; বলিল, না, তবে আপনি খাচ্ছিলেন তাই অমনি তাকেও দিতে হল। অপূর্ব ইহা মানিবে না—সে অফিসের মালিক দেবে। তাদের কাজে এসেছিল সেই ভদ্রলোক। বেয়ারা বিভ্রান্ত দৃষ্টি। কিন্তু অপূর্ব

টাকা-কড়ি হিসাব করিয়া খরচ করে, সে ঠকিবে না। অমিতই শেষে বলিল, জগু, তুই এখন যা ত। ও আমি দেখব পরে। অপূর্ব এবার জগুকে বলিল, যা ওই পয়সা থেকে এই সব খাবার নিয়ে আয়।

অমিত বলিল, সে কি অপূর্ব ? আমার টাকা আছে যে।

অপূর্ব তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, থাক। নিজের পয়সায় তোর তো নানা ভূত পুষতে হবে, নিজে খেলে চলবে কেন ?

অমিত জানে, তুই পয়সার হিসাবে অপূর্ব যতই পাকা হউক, এইরূপ দুই-একটা খরচও মঝে মাঝে অপূর্বের করিতে হয়, না হইলে তাহার নিজের মনে সে শান্তি পায় না। তাই অমিত মনে মনে হাসিলেও আর আপত্তি করিল না। সত্যই, ছোট জিনিসেই মানুষের পরিচয় মিলে।

কিন্তু কি লাভ ?—অপূর্ব তখন কহিল, এই তোমার অর্থহীন ঘোরা-ফেরায় কি লাভ ? কি এ সব ? মেয়েদের পেছনে ঘোরা-ফেরায় তোমার লোভ আছে, অথচ তুমি বিবাহও করবে না। এর চেয়ে একটু দেখে-শুনে—

তাতেই বা কি ? জানিস তো ভাই, আমার চোখ নেই। দেখা-শোনা করতে হ'লেও তোকেই টানতে হবে।

চোখ থাকলে কেউ মিস বসুর ছায়া মাড়ায় ?

আসিয়া গিয়াছে আবার মিস বসু—অপূর্ব ভুলিতে পারে নাই। অমিত মনে মনে হসিল, বলিল, কেন ? সে তো দেখতে বেশ।—কথাটা খুব সত্য নয় ; কিন্তু অমিত এই মুহূর্তে তাহা প্রকাশ করিবে না।

বেশ ! শুনেছি ময়লা, রোগা—

ঠিক তা নয়, তন্বী শ্যামা, ব্রুনেট্ এবং সুরসিকা ; দেখলে বুঝতে।

অপূর্বের মুখ আবার খানিকক্ষণের জন্য অন্ধকার হইল। পরে সে বলিল, যাক ওসব। এখন জানতে চাই—তুমি এসব ছাড়বে কিনা ?

কোন্ সব ?

মজুর আর মেয়ে-সমাজ—তোমার স্বদেশী আর সর্বনাশীদের।

কেন? তারা করেছে কি?

তোমার সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক? তুমি ঐতিহাসিক, ইন্‌টিলেকচুয়াল। তোমার মন দেশ-বিদেশের, যুগ-যুগান্তরের কথা নিয়ে আলোচনা করে। তুমি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে ধ্যানের চক্ষে দেখে আমাদের গোচর করবে। মানবশক্তির জয়-পরাজয়, উন্নতি-অবনতির চিত্র আমাদের সামনে ধরবে—Philosopher of Life, Examiner of Ages—তুমি হ'লে আলোকের পূজারী। তুমি আপনার মনবুদ্ধিসত্তা সব এভাবে ভাসিয়ে দেবে কেন? এই ইকনমিক্‌স, পলিটিক্‌স্, ফ্যানাটিক্‌স—আরও কত টি্‌ক্‌স আছে, কে জানে?—জানই তো এসব স্রোতের বুদ্‌বুদ। কিছু ওদের মানে নেই—ভুয়ো, ফাঁকি, হম্‌বগ। কেন এ সব নিয়ে সময় নষ্ট করছ? শরীরও তো যাচ্ছে—টাকার কথা না-ই বা বললাম।

অমিত হাসিয়া বাধা দিয়া কহিল, কি অফিসে চেঁচামেচি করছ! ক্ষ্যাপার মত ব'লেই যাচ্ছ।

বাড়িতে তো পাওয়া যাবে না, তাই অফিসেই বলতে হয়।

দয়া ক'রে বাড়ি গেলেই হয়।

বেশ, দেখা যাবে—দয়া করে বাড়িতে থেকো তবে সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায়? আজ? আজ যে কাজ আছে—

অপূর্ব একটু ক্ষুব্ধ হইল: কাজ! কাজটা তোমার কি, শুনি?

অমিত পরিহাসে হাল্কা করিতে চায় হাওয়াটা—মিস্ বোসের সঙ্গে দেখা করব।

অপূর্ব বুঝিল, বলিল, বাজে কথা রাখ। একটু নীরব রহিল, তারপর—কিন্তু you are false to your own talents, অমিত।

অমিত বাধা দিয়া বলিল, আবার?

You are false to *yourself*!—বেশ জোর দিয়াই অপূর্ব বলিল।

অমিত সজোরে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল। বাঃ! বাঃ! তারপর?

অপূর্ব চুপ করিল। তাহার বন্ধু-হৃদয় ক্ষুব্ধ, মনও রুষ্ট।

খাবার আসিল; দুইজনে নীরবে খাইতে শুরু করিল। ধীরে ধীরে অপূর্ব আবার কহিল, সুহৃদ আমাকে বললে—কাল রাত্রিতে তোমাকে এগারোটা পর্যন্তও খুঁজে পায়নি। তাই আজ বলছিলুম। অমিত, যা তুমি নিজে বিশ্বাস কর না, যাতে তোমার বুদ্ধি সায় দেয় না, তাতে তুমি নিজেকে এমন নষ্ট করছ কেন? আপত্তি ক'রো না। অমি বেশ বুঝি, তুমি যা করছ, তা তোমার লেখাপড়ার, এমন কি, তোমার সমস্ত শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ। কেন এই বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে? তুমি সাত কাজে ছুটে নিজেকে খানখান ক'রে ফেলছ। এতে কি তোমার আত্মার integrity ঠিক আছে? না, তা কখনও থাকতে পারে? মানুষের মন আজ এমনিই তো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে; তার ওপরে তুমি যদি তাকে ইচ্ছা ক'রে disintegrate ক'রে দাও, তা হ'লে আর কি হবে?

কিন্তু আমি নিজেকে খণ্ড খণ্ড করছি, এ কথাই যে মিথ্যা।

তোমার চৈতন্য যে মালিন্যপ্রাপ্ত হচ্ছে—দেখছ না?

ফোনের ঘণ্টা বাজিল, অমিত তুলিয়া লইল। তারপর কাহার সহিত কথা কহিতে লগিল। তাহার কথাগুলিই শুধু উৎকর্ণ অপূর্বের কানে গেল, অন্য দিককার কথা সে শুনিতে পইল না।

তুমি! শোন, ঠিক হয়েছে।

যুগল।

হ্যাঁ, সেই আজই দেবে।

সন্ধ্যার পর পারবে না?

বেশ, কিন্তু কখন?

রাত দশটায়!

ওখানে? আচ্ছা।

এদিকে কোনও অসুবিধা হয় নি।

আচ্ছা।

ফোন রাখিয়া অমিত নিজ হইতে অপূর্বকে কহিল, যুগলের কাছে ক'টা টাকা চেয়েছি। রাত দশটায় কি যাব? বরং কাল সকালেই যাওয়া ভাল, কি বল?

অপূর্ব গম্ভীরভাবে কহিল, যদি সত্যই টাকা পাও, এবং রাত দশটায় অন্য কোথাও না যাও।

অন্য কোথাও কেন? তবে সুহৃদের সঙ্গে বায়স্কোপে যেতে হবে—তা সে কালই ব'লে গেছে।

শুনছিলাম—মিস্ বোস্ তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। না, ঠিক সময়ে যেও। সুহৃদ যদি সত্যই বায়স্কোপে যায় তোমার জন্যে দেরি ক'রে ক'রে নিশ্চয়ই শো'র সময় সে খোয়াবে না।

অমিত হাসিয়া বলিল: না; তাকে আগেই খবর দোব।

অপূর্ব আবার কহিল, পাঁচটা বাজে। ওঃ! তোমাকে যে আজ বিকালে ব্রজেন্দ্রবাবু যেতে বলেছেন।

কখন বললেন?

কতদিন পরে এক ঝলকে অমিতের মনে পড়িল—সবিতাকে।

বেলা এগারোটায় ফোন করেছিলেন! তুমি ছিলে না—বলেছিলেন, এলেই যেন বলি।

অমিত আনন্দিত হইল, কিন্তু চিন্তিতও হইয়া পড়িল। ইন্দ্রাণীর কাজ বিকালের পূর্বে, শোভাযাত্রা বিকালে; আবার ব্রজেন্দ্রবাবুর আহ্বানও বিকালে। কি করা যায়? ইন্দ্রাণীকেই পরে বুঝাইয়া বলিবে—রাত্রিতে দেখা করিবে; পথে একবার শোভাযাত্রা দেখিয়া এখন ব্রজেন্দ্র-

বাবুর কাছেই তবে অমিত যাইবে। অমিত বলিল, খুব তো বলেছ? কেন ডেকেছেন, জান কি?

না। বোধ হয় কিছু কাজ আছে।

তা হ'লে তো যেতেই হয়। এদিকে সন্ধ্যায় আবার মিস বোসের ওখানে যেতে হবে—তুমি ত তা বিশ্বাস করবে না। চল না, বেরুই।

অপূর্ব ও অমিত অফিস হইতে বাহির হইল। অমিত কহিল, আমি বাস ধরি, আজ আর হাঁটতে পারছি না। সময়ও তাতে ঢের লাগবে।

নিশ্চয়ই। মিস্ বোসের এনগেজমেণ্ট্!—অপূর্ব প্রতিশোধ লইল।

হাসিয়া অমিত বাস ধরিতে চলিল।

বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায় অমিতের পিতার সহাধ্যায়ী। বড় সরকারী চাকুরি হইতে অবসর লইয়া গড়পারে বাড়ি করিয়া আছেন। আজীবন সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যানুশীলনেচ্ছু। কিন্তু সরকারী চাকুরির জ্বালায় কিছুই স্থায়ী লেখা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। চাকুরির আয়ে অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে, ছেলেদের ও মেয়েদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কিন্তু তাঁহার মুখে ছাপ পড়িয়াছে একটি সবিষাদ চিন্তার। অমিতকে তিনি ভালবাসেন, বলেন, 'নিজের কিছু পরিচয় রেখে যেও। এই তার সময়। নইলে পরে দেখবে, শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে। নানামুখী চেষ্টায় তার আর জোর নেই।'

অমিত জানে, এই বৃদ্ধের মুখ কেন বিষণ্ন। জীবনের পরিচয় অপূর্ণ রহিয়া গেল—এই বেদনায় তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। অথচ উহাই ছিল তাঁহার আজীবন স্বপ্ন। কেন এইরূপ হইল? এইরূপই সরকারী চাকুরি—এমনই জীবনের নির্মম ছলনা।....

জীবনের পরিচয়।

'এখনই তার আয়োজন করতে হবে, নাহলে দেখবে শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসছে। নানামুখীন কাজে আপনার অপচয় করতে করতে আর তার কিছুই থাকবে না।'

আজ বৎসর ঘুরিতে চলিল, একদিন গড়ের মাঠে অমিতকে ব্রজেন্দ্রবাবু এই কথা কয়টি কহিয়াছিলেন। নিজের জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা কেমন করিয়া ঝরিয়া গিয়াছে; দিনের পর দিন অলস উপেক্ষায় কেমন করিয়া তাহাদের তিনি শুকাইয়া পড়িতে দিলেন। হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের যে চিত্র আঁকিবার সঙ্কল্প লইয়া তিনি যৌবনের চূড়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন,—অনার্য আর্য বহু সভ্যতা-সংঘাতের সেই বিশাল দৃশ্যপট—অপূর্ব উপাদান,—কি করিয়া তাহার রঙ প্রথম ঝাপসা হইল, তাহার সুরের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল, তাহার সীমারেখা মুছিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ভাবকেন্দ্রের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল,—ভাব ও কল্পনা অস্পষ্ট হইয়া, অনির্দেশ্য হইয়া শূন্যতলে মিলাইয়া গেল,—ব্রজেন্দ্রবাবু তাহা শুনাইতেছিলেন। তখন সূর্য ডুবিতেছে। হেস্টিংসের নির্জন মাঠে কেহ নাই—গঙ্গার বুকে স্টীমারের ধোঁয়া ও ধ্বনি; ওপারের চিমনির অজস্র উদ্গীরিত ধূম্রকুণ্ডলী; তাহার উপর সূর্যাস্তের রক্তাভা। সমস্ত দৃশ্যটার মধ্যে যেন একটা ট্র্যাজেডির বিষণ্ণতা ছিল—যে ট্র্যাজেডিতে করুণার স্পর্শ নাই, আছে নিয়তির নির্বাক পরিহাস—মানুষের জীবন-স্বপ্নের উপর বাস্তব জীবনের রূঢ় হৃদয়হীন ব্যঙ্গ। কোথায় সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার কল্পনা? ব্রজেন্দ্র রায়ের স্ফুটনোন্মুখ স্বপ্ন?

'জীবনের পরিচয় রেখে যেতে হবে, এখনই তার আয়োজন করতে হবে।' অমিত আয়োজন করিবে কি? ব্রজেন্দ্রবাবু বন্ধুপুত্রকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। তিনি অমিতের নিকট খুব বড় জিনিস প্রত্যাশা করেন—শুধু নবম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস নয়, সমস্ত বাঙালী-জগতের

ইতিহাস। কতদিন অমিতের সঙ্গে তিনি গড়ের মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে আলোচনা করিয়াছেন—বাঙালীর মানসজীবনের মূল প্রেরণাগুলি কোথায়? তাহার জাতীয় মনের তলায় কোন্ জাতিসংমিশ্রণ রহিয়াছে; দ্রাবিড় মঙ্গোলেরও পিছনে কোন্ পলিমাটির অধিবাসী অস্ট্রিক জাতি তাহার মেরুদণ্ড যোগাইয়াছে? ধীরে, অতি ধীরে, কেমন করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্যের পর হইতে এখানে আর্য সভ্যতার পত্তন হইল? তাহার পর বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব প্রেরণার বিভিন্ন বিকাশ, পরস্পর সংমিশ্রণ। মধ্যযুগের প্রথম তমিস্র-স্রোতে শৈব নাথগুরুদের ও বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক ধর্মের সাক্ষাৎ ঘটিল।...বাঙালীর সমস্ত ইতিহাসই হয়তো এই তান্ত্রিক সাধনার ইতিহাস। তাহারই উপর নানা মতবাদ চলিয়াছে, সাধনা পরিবর্তিত হয় নাই। বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, ইসলামীয় দরবেশ, স্বফী—বাঙালীর অধ্যাত্ম-জীবন কত কি আকার লইতেছে। কিন্তু মূলে তন্ত্র—সেই শতমিশ্রিত জাতের মূল প্রেরণা ও স্বগুপ্ত সাধন-পদ্ধতিই মূল। অমিত যাহা শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে, তাহা বলিত; যে অন্ধকার স্রোতের উপরে কোন চিহ্ন পাইতেছে না, তাহার কথা আলোচনা করিত। ব্রজেন্দ্রবাবুর ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার জীবন মনে পড়িতেছে—হিন্দুর সামাজিক ইতিহাস। তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পড়িত। তিনি অমিতকে বলিতেন, 'যা করবার অমিত, এইবেলা। পরে বরং তাকে যাচাই করবে, ভাঙবে, গড়বে, কাটছাঁট করবে। নাহলে দেখবে, নানামুখীন কাজে সব ফিকে হয়ে যাবে।'

বাসে অমিত ভাবিতেছিল—নানামুখীনই আজ অমিতের জীবন। এই তো অপূর্ব সেই একই কথা বলিতেছিল—'কেন নিজের অপচয় করছ? কার ওপর তোমার এই প্রতিশোধ তোলা? কেন এই আত্মদ্রোহ? এই আত্মঘাতী ভাব-বিলাসিতা?'

কাহার উপর? কাহার উপর?—অমিতের কি মনে পড়িল, হাসি পাইল। অপূর্ব ওরা ভাবে—cherchez la femme। হয়তো ওরা

তাহাকে খুঁজিয়াও বাহির করিয়াছে। কাহাকে? বছর তিনেক পূর্বে হইলে ভাবিত—ললিতা। ছয় মাস পূর্বে—সবিতা। আরও সাহস থাকিলে মনে করিত—মনে করিত—হাঁ, মনে না করিবে কেন?—মনে করিত—ইন্দ্রাণী। অমিত তখনি কথাটা মন হইতে সরাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দ হইতে চাহিল, বলিল, আর আজ হয়তো অপূর্ব বলিতেছে, মিস বসু।

অমিত একটু হাসিল। কিন্তু আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এদের কোনো অনুমানে কি সত্য আছে অমিত?' নিজেই তাহার জবাব দিল, 'এক বিন্দুও না।' কিন্তু মনের একটি গোপন কোণে যেন অমিত নিজেকে প্রশ্ন করিল, 'নেই? তুমি তা হ'লে কত দুর্ভাগ্য হতে, অমিত?...কিন্তু না, না, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বিচার থাক,—থাক, এসব থাক—তুমি ইতিহাসের ছাত্র, মানব-ভাগ্যের দ্রষ্টা।'...

অপূর্ব আজ রাগ করিয়াছে, বোধহয় সুহৃদের নিকট কিছু শুনিয়া থাকিবে। সুহৃদ নিজে বলিয়া বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে—'কেন তোমার এই আত্মদ্রোহ, অমিত?'

অমিত মনে করে তাহাকে উহারা চিনে না। উহারা মনে করে, অমিত নিছক একটি শিল্পানুরাগী লোক। কেহ মনে করে, অমিত ইনটেলেকচুয়াল, আইডিয়ার পসরা মাথায় লইয়া ফিরি করাই তাহার জীবিকা হওয়া উচিত। ব্রজেন্দ্রবাবু মনে করেন, অমিত একটি ডেডিকেটেড্ স্পিরিট—আত্মনিবেদিত সাধক। জীবন তাঁহাকে ঠকাইয়াছে, কিন্তু নবযুগের এই ব্রজেন্দ্রদের যেন আর সে ঠকাইতে না পারে—ইহাই তাঁহার কামনা। অপূর্ব মনে করে, অমিত তাহার নিজ জাতের, হোক একটু নিচুকার পর্যায়ের, তবু অমিত সাহিত্যিক, সাহিত্যের প্রেরণা লইয়াই জন্মিয়াছে।

তখন গান্ধীজীর ডাণ্ডীর অভিযান সুরু হইয়াছে—অপূর্ব অমিত দুজনেরই মন দোদুল-দোলা খাইতেছে। এক সপ্তাহ তাহাদের চোখে

ঘুম নাই, কেবল তাহারা নিজেদের পথ খুঁজিতেছে। হঠাৎ একদিন অপূর্ব কহিল, ওসব বাজে। আমাদের কাছে শুধু বাজে নয় অমিত, ওসব আমাদের জগতের বাইরেকার জিনিস। আমরা সাহিত্যিক, আমাদের কাজ সৃষ্টি, আমাদের কাজে এসব কোলাহলের কোন মূল্য নেই। সত্যকার জীবনবোধের দিক থেকে এগুলো বরং ক্ষতিকর—মনকে বিক্ষিপ্ত করে। আমাদের আসল স্থান হ'ল ধ্যানের আসন, বক্তৃতার মঞ্চ নয়।

ভাবিয়া আজ অমিতের হাসি পাইল। কিন্তু অমিতকে উহারা চিনে, জানে, ভালবাসে—অমিত তাহা অস্বীকার করিতে পারে না।...তুমিও এই সব কিন্তু ভালবাস অমিত। গানে, বিশেষ করিয়া ভাল ধ্রুপদে, তোমার সম্মুখে যেন সহস্র-স্তম্ভ, সহস্র-দ্বার দেবমন্দির খুলিয়া যায়। এলিফ্যাণ্টার ত্রিমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হও। এস্কাইলাস বা সোফোক্লিস পড়িতে পড়িতে এথেন্সের সমুদ্র-স্বনিত বেলাবালুকায় বা এক্রিপোলিসের এথেনা-মন্দির-তলে তুমি লুটাইয়া পড়। বাঙালীর ইতিহাস অনুসন্ধানে তোমার মনের অন্তঃপুরে প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষার মত এক সুগভীর পবিত্র নিষ্ঠা জাগিয়া উঠে। শেক্স্পীয়র খুলিয়া এখনও তুমি জীবনের সত্যজিজ্ঞাসার উত্তর পাও।...অমিত, তোমার বন্ধুরাও তোমাকে ভুল দেখে নাই। সত্যই, তুমি জীবনের পরিচয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছ—সত্যই তুমি আত্মভ্রষ্ট—তুমি আত্মদ্রোহী!

অমিতের মন শিহরিয়া উঠিল। ওই অমঙ্গলময় চিন্তা দুই-একবার দিনের মধ্যে তাহাকে নাড়া দেয়। তখনই সে মনের চোখ মুদিয়া এই চিন্তাকে এড়াইতে চেষ্টা করে।

অমিত তাই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।...

তোমার সমস্ত ইতিহাস-চর্চার, সমস্ত বাস্তব-দৃষ্টির এই পরিণাম, অমিত? শেষে তুমি সস্তা মেটাফিজিক্যাল ফিলজফি ও সেন্টিমেন্টি-লিজ্‌মের চোরাবালুতে আটকাইয়া যাইতেছ? তুমি না মানবেতিহাসের পৌর্বাপর্যের মধ্য দিয়া সমাজ-বিকাশের গতিচ্ছন্দকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছ? তুমি না মানব-মহাকাব্যের বিপুল কাহিনীর প্রেক্ষাপটে এই যুগের অবসান-প্রায় ও সমাগত-প্রায় অধ্যায়টিকে পড়িয়া লইয়াছ? বুঝিয়াছ, পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কেন নবজন্মের সুতীব্র বেদনা, মানুষের চক্ষে কেন এত আশা, এত আশঙ্কা, এত অস্থির ব্যাকুলতা? তুমি না সমস্ত জানিয়াই সমাগত বিপ্লবের স্বাগত-সম্ভাষণ গাহিবার স্পর্দ্ধাকে নিজের পরিচয় বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছ? এই এতবড় সমগ্রবোধের পিছনে, সমাজ-বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের এমন ব্যাপকদৃষ্টির ফলে, শেষে কিনা তুমি এমন করিয়া বিচলিত হও! ভাব্‌—নিজের পরিচয় বুঝি তোমার গুলাইয়া গেল! তোমার পরিচয় অমিত,—তুমি কি জান না, কিসে তোমার পরিচয়?—উদয়-সূর্যের সম্বর্দ্ধনায়—নিশীথের তিমির-পার হইতে সবিতার আহ্বানে।...

'জীবনের পরিচয় রেখে যাও।'—অমিত তাহা রাখিয়া যাইবে বইকি। হ্যাঁ, গ্রন্থের পাতায়ও রাখিয়া যাইবে। সে তো শৈলেন নয়। একটু সময় পাইলেই সে পরিচয় রাখিতে পারিবে—একটু মাত্র সময়। জোর তিন-চার মাস। এই ঝঞ্ঝাটগুলি মিটাইতে পারিলেই সে আপনার মণীষার ঋণ চুকাইয়া দিবে; বন্ধুদের দাবি মিটাইবে, অন্তরের the still small voice আর কহিতে পারিবে না—'কোথায় তোমার পরিচয়-পত্র অমিত?—তোমার যে পরিচয় একান্ত তোমার—সমাজ-পরিপুষ্ট অমিতের নয়, একটি বিচিত্র সত্তার?'

কেমন একটা ভিড় পথের চারিদিকে বাড়িতেছে—তাকাইতেই তাহা অমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অমিত বাঁচিয়া গেল; আর সেই দ্বিধাময় চিন্তার পীড়ন সহ্য করিতে হইল না। ব্যাপার কি? লোকগুলি কেন এমন উত্তেজিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে? বাসের আরোহীদের কণ্ঠে একই প্রশ্ন—'কি হয়েছে মশায়?' কিন্তু 'মশায়দের' কেহ ঠিক উত্তর দিতে পারিল না—হস্তপদ ছুঁড়িতে লাগিল। একজন কহিল, 'গুলি চলেছে সামনে।' 'গুলি'! কেন? 'শোভাযাত্রা,'—বে-আইনী জনতা। অমিতের মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের ঝলক খেলিতে লাগিল। অমিত বাস হইতে নামিবার জন্য উঠিল। কিন্তু বাস থামে না, বৃথা সে ঘণ্টা দিতেছে। সম্মুখের জনতা হঠাৎ "ওই" "ওই" বলিয়া দৌড়িতে শুরু করিল—বাস গতি বাড়াইয়া দিল।—এক মিনিটের মধ্যে প্রায় পথ পরিষ্কার,—শুধু ফুটপাথে পলায়মান ত্রস্ত পথিকদের উপর একদল গোরা সার্জেণ্ট ব্যাটন চালাইয়া তাড়া করিয়া আসিতে লাগিল। মিনিট তিন-চার পরে রক্তমুখো, ঘাতকের মত বীভৎস-দৃষ্টি গোরারা ফিরিয়া গেল। ফুটপাথে পড়িয়া রহিল তিনটি রক্তাক্ত দেহ, হত-চেতন পথিক—দুইটি দরিদ্র কেরানী-শ্রেণীর দুর্বলদেহ প্রৌঢ়, আর একটি হয়তো সাধারণ কলেজের ছাত্র।

চোখের সম্মুখে কাণ্ডটা অমিত দেখিল। বারে বারে ঘণ্টা দিল, বাস থামিল না। তারপর বাস পৌঁছিয়া গেল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কোণে হ্যারিসন রোডে। সম্মুখে সাঁজোয়া গাড়ি, একশত গজের মধ্যেও জনপ্রাণী নাই। পার্শ্বেই একটা কালো কয়েদী-গাড়িতে জনকয়

খদ্দরশোভিত পুরুষ। বাসটা দেখিয়া তাহারা একবার চেঁচাইল। কিন্তু বাস-চালক মূর্খ নয়, এঞ্জিনের শব্দে চীৎকার দাবাইয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল।

মেয়েদের শোভাযাত্রা সওয়ার পুলিসে ঘেরাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায়, কেহ জানে না। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—যাহার যেমন ইচ্ছা বলিল। পুলিস গ্রেপ্তার করে নাই—কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। অমিত শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। ইন্দ্রাণীর পরিচালিত শোভাযাত্রা আর অবশ্য দেখা হইল না। অমিত যেন তবু একটু আশ্বস্ত হইল—তাহারা চলিয়া গিয়াছে, নির্বিঘ্নেই পুলিসের বাহিনী অগ্রাহ্য করিয়া সসম্মানে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।...গৌরবোৎফুল্ল ইন্দ্রাণীর তেজোদৃপ্ত মুখ অমিতের চোখে ভাসিতে লাগিল—রাত্রিতে সে উহা নিশ্চয়ই দেখিবে, নিশ্চয়ই শুনিবে—'তুমি এলে না অমিত। তোমার উপর রাগ করেছি, ভয়ানক রাগ করেছি। কোথায় ছিলে? সওয়ার ফৌজ এল, সাঁজোয়া গাড়ি এল—ভেদ ক'রে আমরা পতাকা নিয়ে ছুটে চললাম, রক্তমুখো মেগু সাহেব হাঁকছে; 'স্টপ ছাট, স্টপ ছাট'—ঠেলে চললাম আমরা।' অমিত শুনিবে—রাত্রিতে একবার নিশ্চয়ই শুনিতে যাইতে হইবে ইন্দ্রাণীর সগর্ব সে বর্ণনা।....

অমিতের মুখে এক মুহূর্তের জন্য রক্ত ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তখনই মাথায় রক্ত চাপিয়া বসিল। চোখের সম্মুখে জাগিল সেই প্রৌঢ় রক্তাক্ত-দেহ ভদ্রলোক দুটির ছবি, আর সেই কালান্তক যম-সম সার্জেণ্টদের চেহারা। ইন্দ্রাণী কোথায় গেল? দেখিয়াছে তাহারা এই দৃশ্য? তাহাদের শোভাযাত্রা যে আঘাত পায় নাই, সে আঘাত অপরের উপরে দ্বিগুণ হইয়া পড়িতেছে—দেখিয়াছে কি তাহা তাহারা? এই রক্তমুখ ঘাতকদের দেখিয়াছে? সমস্ত শক্তি দিয়া ইহারা মারে—মারিয়া ফেলিবার জন্যই মারে।....খুনীর রূপ অমিত এই দেখিল আজ!

বীভৎস !—মানুষের মুখ এইরূপ হইতে পারে—এত রক্ত-লোলুপ, এত মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত ?

অমিতের রাগ হইল। কেন সে আগে এখানে পৌছিতে পারিল না ? কেন সে আবার বাসের ভিতর বসিয়া রহিল ? কেন ? একবার সে নিজেকে বুঝাইল—বাহির হইলেই বা কি হইত ? মাথাটি যাইত, এই পর্য্যন্ত। তাহা ছাড়া তোমার অন্য কাজ আছে—সুনীল রহিয়াছে, দীনু রহিয়াছে, মোতাহেররা রহিয়াছে, ইন্দ্রাণীর মত একটি মানুষেরও চাই তোমার কাছে পথ-জিজ্ঞাসা।

অমিতের মন মানিল না, ব্যঙ্গভরে কহিল, আরও আছে, তিন শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস, না ? তুমি সাহিত্যিক, না ? তোমার জীবনের পরিচয় রাখিয়া যাইতে হইবে, না ? গণবিপ্লবের নতুন সূর্য্যের উদয়-বন্দনা গাহিতে হইবে, না ?—কাওয়ার্ড ! কাওয়ার্ড এ্যাণ্ড চীট !

হঠাৎ একদল রাস্তার ছোকরা বাস ঘিরিয়া দাঁড়াইল—চেঁচাইতে লাগিল, 'নেমে পড়ুন। নেমে পড়ুন।' কেন ? 'সার্জেণ্টরা লোকদের ঠ্যাঙাচ্ছে।' কিন্তু তাহার কি এই প্রতিবিধান ? এই প্রশ্নেরই বা কে উত্তর দেয় ? ছোকরার পাল ছোট ছোট লাঠি দিয়া বাসের গায়ে আঘাত করিতে লাগিল, নানারূপ চীৎকার করিতে লাগিল—যেন একটা পরমোৎসব লাগিয়াছে। ইহাদের অঙ্গভঙ্গি দেখিলে হাসি পায়, অমিতের লজ্জা হয়। অপূর্ব্ব থাকিলে বলিত, 'এসব বাজে লোকের সঙ্গে তুমি চাও মিলতে, অমিত ? এদের কোন জ্ঞান নেই।'

বাস চলিল। আবার অপূর্ব্বের উপর অমিতের ক্রোধ হইল। অপূর্ব্ব একদিন বলিয়াছিল, 'মিসেস চৌধুরীর কথা বলছ ? তাঁর জেল হওয়াই উচিত। দেখতে যেমন বিশ্রী !' এই তো অপূর্ব্ব ! তাহার সহিত অমিতের কি যোগ আছে ?....

না, অমিতকে তাহারা চিনে না, জানে না। তোমার পরিচয় কেহই পায় নাই, অমিত। শুধু উহারা নিজ নিজ মনগড়া একটা রূপ আঁকিয়া তাহাই তোমার পরিচয় বলিয়া নিজেরা স্থির করিয়া লয়। আর মূঢ়ের মত তুমিও তাহাতে খুশি হইয়া উঠিয়াছ। না, অমিত, তুমি শিল্পানুরাগী নও। উহাদের স্পষ্ট বল, তুমি witty নও, culturist নও, intellectual communist নও, সাহিত্যিক নও, আত্মনিবেদিত সাধকও নও ;—তুমি ইহার কিছুই হইতে চাও না। তুমি সাধারণ—অতি সাধারণ বাঙালী, যাহার অদৃষ্টে এমনই লাঞ্ছনা আজ সাধারণ ঘটনা। সে ভাগ্যলিপি স্বীকার করিয়া লও, সেই লাঞ্ছনা উহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গ্রহণ কর, অমিত। উহাতেই তোমার দেহের তৃপ্তি, তোমার প্রাণের আরাম, তোমার আত্মার মুক্তি। অমিত, ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও—ওই রক্তরঞ্জিত পশুলীলার সম্মুখে একবার ফিরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াও—চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া ওই লাঞ্ছনা গ্রহণ কর। ফিরিয়া যাও।

কিন্তু বাস শিয়ালদহের মোড়ে আসিয়া গেল। ডেলি প্যাসেঞ্জারেরা তেমনি ছুটিয়াছে। হাতে একজোড়া কপি ঝুলিতেছে, কিংবা ভাঁজ-করা খবরের কাগজ। ইহাদের নিকট তো সাধারণ বাঙালীর এই গ্লানিকর লাঞ্ছনা এত বাস্তব নয়,—বাস্তব হইতেই পায় না।··· তোমার কেন এইরূপ হইল, অমিত?···তুমি ডেলি-প্যাসেঞ্জার নও?—জীবনের পথে তুমি তীর্থযাত্রী।···তীর্থযাত্রী···কই, সুহৃদ তো এই লাঞ্ছনার জন্য বায়োস্কোপের টিকিট ফেরত দিবে না; শৈলেন শ্বশুরগৃহে আহার্য্য বর্জ্জন করিবে না; সাতকড়ি বরানগরে সন্ধ্যার উৎসব মুলতুবি রাখিবে না; অপূর্ব্ব নিশ্চয়ই জীন্‌সের Mysterious Universe হইতে কল্পনার নূতন উপকরণ খুঁজিতে ভুলিয়া যাইবে

না। ইহাদের নিকট তো সাবারণ বাঙালী-জীবনের এই গ্লানিকর লাঞ্ছনার অস্তিত্ব নাই। ইহাদের অনুভূতির তীব্রতা কি করিয়া ভোঁতা হইল ?—সংসার ?

সংসার, সংসার !

সংসার সকলকেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার করিয়া ছাড়ে—কাহাকেও আর 'পিলগ্রিম' থাকিতে দেয় না।…কিন্তু তীর্থের পথ কি শুধু বাঙলা দেশ বা ভারতবর্ষেই মুক্ত হইয়াছে ? এ গ্লানি তো বাঙালীরও একা নয়। স্যর্ বিপুলানন্দও বাঙালী ; এই গ্লানি কি তাঁহাকে স্পর্শ করে ? আবার, সাংহাইয়ের পথের উপরে চিয়াং কাইসেক যে সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণীর ছিন্নদেহ সাজাইয়া রাখিতেছে, সেখানেও কি এমনিই গ্লানি আকাশের তলে জমিয়া উঠে নাই ?….গ্লানি আজ মানুষের, গ্লানি মানব-সভ্যতার। সে আপনার পথ আপন বাধায় পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে, তীর্থের পথকে করিয়াছে রুদ্ধ।…

না না, অমিত, তুমি তীর্থযাত্রী, ইহাই তোমার পরিচয়। চাই না অন্য পরিচয়। পৃথিবীব্যাপী যে তীর্থের পথ গিয়াছে, তুমি তাহারই যাত্রী, অমিত, তেমনই তোমার যাত্রা।…

সেই নন্দলালের আঁকা 'বাপুজী' !….ঋজু কঠিন দেহের সেই সজীব দৃঢ়তা—অমিতের চোখের সম্মুখে সে-চিত্র ফুটিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা, দ্বিধাহীন দৃঢ়তা—তীর্থযাত্রীর মূর্ত্তি। এই দেশে এই মুহূর্ত্তে এই পথ কি তোমারও জন্য নয় ?

মনে পড়িল, সুনীল শুনিলে হাসিয়া উঠিত, বলিত—বাপুজী ! 'বানরসেনা' !—যেমন সেনা তেমনই সেনাপতি।

বালক সুনীল ! অমিত মনে মনে মাথা নাড়িয়া কহিল—অশান্ত উদার বালক। আপনার অনুভূতির সুতীব্র দ্যুতি তাহাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে পথই দেখে না,—দেখিতে চাহেও না ; সতীর্থ

পথিককে চিনিবে কি করিয়া? সার্চ-লাইটের আলোকফলা যেমন চোখ ধাঁধিয়া দেয়—দুই পার্শ্বের ছোটবড় স্নিগ্ধোজ্জ্বল সমস্ত প্রদীপ-জ্যোতিকে তিমিরে লেপিয়া ফেলে—সামনের পথটাকে অতি-দীপ্তিতে দুর্গম করিয়া তোলে—সুনীলের পথ তেমনই আলোক-বিচ্ছুরিত। যে আলোকে পথ ভুল হয়, ইহা সেই আলোক—সেই নয়ন-ধাঁধানো, চেতনা-বিভ্রান্তকারী অস্বাভাবিক আলো; তাহার পার্শ্বে আঁচলে প্রদীপ ঢাকিয়া যে চলিয়াছে ধীরপদে, সে-ই হয়তো পথ দেখিতেছে স্থির।...

কে জানে কাহার পথ ভুল? কিন্তু তীর্থের পথে হাত মিলাইতে হইবে, ইহাই বড় কথা। অমিত, তুমি তীর্থযাত্রী—অমিত, ইহাই তোমার পরিচয়। সেই পরিচয় রাখিয়া যাও। দেরী করিও না—নানামুখীন চেষ্টায় নিজের শক্তির অপচয় করিও না।

সুকিয়া স্ট্রীটের মোড় যে আসিয়া গিয়াছে! অমিত বাস্ হইতে নামিল। মাত্র দুই-তিন মিনিটের পথ—অমিত হনহন করিয়া পরিচিত পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

তীর্থের পথকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—এবার মানিয়া লও—ছবি, গান, সাহিত্য-চিন্তা, এই সকল দিয়া নিজের সত্তাকে আর ভুলাইবে না।...সত্তা অমলিন হইলে তাহাকে এইরূপে ভুলাইয়া রাখা সম্ভবও নয়।... চিন্তার মুক্তি কর্ম্মে—কর্ম্মই চেতনার মোক্ষ। প্রাণ কর্ম্ম-প্রেরণায় আপনা হইতে উৎসারিত হইয়া পড়ে; সে প্রাণ শুকাইয়া আসিলেই মানুষ চিন্তার মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। চিন্তা কিছু নয়—প্রাণের একটা পরাজয় মাত্র।

ব্রজেনবাবুর এটি ভাড়াটে বাড়ি। একেবারে উপরে উঠিয়া যাইতে হইল। এই বাড়িতে অমিতকে সকলেই চিনে—মাঝে মাঝে দেখিয়াছে।

বাবুর সে স্নেহভাজন সঙ্গী। একবার 'ছোড়দিদি' সবিতার সঙ্গে ইহার বিবাহের কথাবার্ত্তাও উঠিয়াছিল। বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল; সকলেরই মত ছিল; কিন্তু ভবঘুরে ছেলেটিই পাশ-কাটাইয়া গেল—বিবাহ আর হইল না। সবিতার বিবাহ হইল একটি বিলাতযাত্রী, ডাক্তারি-পরীক্ষার্থীর সঙ্গে—বেশ ভালো ছেলে।

অমিতকে লইয়া চাকর উপরে চলিল। অমিতের এবার হঠাৎ মনে পড়িল—তাহার চোখ-মুখ হয়তো স্বাভাবিক নাই। মাথার চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, হাতে ঠেলিয়া দিতে গিয়া মনে পড়িল—আজ আবার স্নানও করা হয় নাই। মুখেও সমস্ত দিনে সাবানের স্পর্শ ঘটে নাই। নিশ্চয় কলিকাতার ধোঁয়া ও কালি দুই-এক পোঁছ জমিয়াছে। যদি ব্রজেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিতে পড়ে? না পড়িবারই কথা; একে সন্ধ্যা, তাহাতে তিনি ক্ষীণদৃষ্টি। কিন্তু,—একটু স্বচ্ছ গোপন আনন্দে তাহার মন সচকিত হইল, কিন্তু বাড়িতে অন্য লোকও তো আছে।—অন্য আর কে? তাঁহার মেয়েরা। তাহাতে অমিতের কি? তবু—তবু তাহারাই বা কি মনে করিবে? মনে করিবে, অমিত নিতান্তই বর্ব্বর, উজবুক—

ব্রজেনবাবু কহিলেন, তোমাকে আসতে বলেছিলুম একটু কাজে; কিন্তু কাজ আজ হবে না। আমার দু-একটি বন্ধু খানিক পরেই এসে যাবেন। তাঁরা সবাই আমার সহযোগী সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। এখন পেন্‌শন নিয়েছেন, মাঝে মাঝে গল্পগুজব করতে এক-এক বাড়িতে সমবেত হন। আজ আসছেন আমার এখানে। তোমাকে দিয়ে কাজটা আজ করানো হ'ল না। আর একদিন তোমায় আসতে হবে। আজ বরং ওঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব, দেখবে কয়েকটা আমাদের কালের নিদর্শন। ওদের মধ্যে দু-একজন কিছু কিছু লিখেছেনও।

একজন অনুকূল দত্ত—ছেলের নামে দু খানা আইনের নোট লিখেছেন। ল-এর ছেলেদের মহলে তা বেশ কাটছেও। আর একজন বঙ্কিম বাঁড়ুজ্জে—লিখেছেন দু খানা উপন্যাস। তোমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকা মন্দ নয়। তবে মাঝে মাঝে বিরক্ত করবে—লেখা পাঠিয়ে বলবে, তোমাদের কাগজে ছাপাও। ছাপতে দেরি হ'লে আবার মনে মনে রাগ করবে—দেরিটা লেখকের প্রতি অবিচার এবং সম্পাদকের মূঢ়তার ও 'স্টুপিডিটি'র দৃষ্টান্ত।

প্রশান্তমুখে একটু কৌতুকের হাস্য ফুটিল। অমিতও হাসিল। ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, একেই তো জান, আমরা সরকারী চাকুরে। তারপরে মফস্বলে হাকিমী-জীবন কাটিয়ে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিতে অপরিমিত গর্ব্ব অনুভব করতেই অভ্যস্ত।

অমিতের মনে পড়িল···শৈলেন ···শৈলেন মোটা হইয়া উঠিতেছে।

ব্রজেনবাবু বলিলেন, পরে দেখি, পেন্‌শন নেওয়ার শেষে কেউ মুখ তুলে তাকায় না। তখন দুনিয়াটাকে মনে করি স্টুপিড্, কৃতঘ্ন। এর পরে আবার যদি সংবাদপত্রে লিখি আর তোমরা মনে কর তা প্রকাশ করা তেমন জরুরি নয়—তা হ'লে তোমাদের কি ক'রে ক্ষমা করব?

অমিত কহিল, ক্ষমা কেন করবেন? কোন লেখকই কি আমাদের স্টুপিড ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন? যদি একটা দিনের ডাকও আপনাকে একদিন দেখাতে পারতুম, আপনি সাহিত্যিক বা লেখক-জগতের আর-একটা মানসিক মাপকাঠি পেতেন। সাধে কি মহীধর রাগ ক'রে বলে, The vanity of a peacock and the malevolence of an old monkey, combined with a divine accident, the gift of expression, make a literary man।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, না হে, না, অতটা কঠিন অবিচারও ক'রো না। ভুললে চলবে কেন, তাঁরাই মনীষী, 'বেস্ট থিঙ্কার্স'।

যদি তাঁদের চিন্তা আর একটু শুদ্ধ বাংলায় ও সহজ ইংরেজীতে লিখতেন, তা হ'লে না হয় এই দাবিটার আলোচনা চলত।

ব্রজেন্দ্রবাবু কথাটার তীব্রতায় একটু চমকিত হইলেন, বলিলেন, হ্যাঁ, দেখ, কথাটা আমারও মনে হয়েছে। আধুনিক লেখকদের অনেক লেখা আমি গত কয়দিন পড়েছি। সম্প্রতি স্পেঙ্গলার পড়ার পর থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-দীক্ষার রূপ ও প্রেরণাকেও আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। সত্যই কি পশ্চিমের সভ্যতা মরণোন্মুখ ? আমাদের সভ্যতা একটা মৃত গলিত শবমাত্র ? জীবনে তো কিছুই করতে পারি নি, তবু আমাদের পুরনো দিনের সভ্যতার একটা রূপ আমার মনে যেন দেখতে পেয়েছি! তারই সঙ্গে তার একালের রূপের তুলনা করতে সাধ গিয়েছে অনেক সময়। একবার তাই আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে দেখতে চাইলাম তোমাদের বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের বাংলা দেশকে—দেখলাম তোমাদের এই 'সমরোত্তর' বাংলা সাহিত্য ও চিন্তা। কতকটা পড়লাম—তোমাদের খানকয় বাংলা নভেল, কবিতাও দেখলাম। অন্যরূপ বই তো বাংলায় লেখা হয় না—হয় কি ? দু-একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ—সে তো আরও হিজিবিজি—একেবারেই অস্পষ্ট, কেবলই উচ্ছ্বাস। 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' হবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে পর্য্যন্ত একটা সত্যিকারের সাহিত্য-বিচার কোথাও খুঁজে পেলাম না। নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখা চিন্তার কুয়াশায় ও স্টাইলের বক্রতায় বুঝে উঠা শক্ত। তা ছাড়া, ও লেখা ধ্বনি নয়, অরবিন্দের প্রতিধ্বনি। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় অজস্র তথ্য অফুরন্ত কৌতূহল,—গাছ চিনতে চিনতে বনের রূপ বুঝি আর চোখে পড়ে না। ওদিকে কি অদ্ভুত ঢঙ তোমাদের 'অভিজাত' সাহিত্যের। না, চিন্তায় বা লেখায় এত আড়ষ্টতা কেন ? ক্লাসিক্‌এর প্রধান ধর্ম্ম ত চিন্তার ও লেখার স্বচ্ছতা। তবু স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা দেখলুম অতুল গুপ্তের

কাব্যালোচনায়। কিন্তু তিনিও তো মধ্য জেনারেশনের—পশ্চিমের আকাশেই এসে পড়েছেন ; আর তার বড় চিহ্নই হ'ল তাঁর পূর্ব্বাকাশের দিকে, পুরনো ভারতীয় কাব্য-জিজ্ঞাসার দিকে অত লোলুপ ও মোহের দৃষ্টিতে তাকানো। প্রমথ চৌধুরী—চিন্তা ও লেখার ধার ক্ষয় হয়ে আসছে, অথচ কথা তোমরা তাঁকে বলাবেই ; তাই বলবার তাড়াতেই তাঁকে বলতে হয়। এ কি কম জবরদস্তি লেখকের ওপর—আর পাঠকের ওপরও? নতুন লেখক কই? পাতার পর পাতা পাতিপাতি ক'রে খুঁজলাম, গল্পগুলি পর্যন্ত পড়লাম। যেগুলো বুঝলাম, সেগুলোতে বোঝবার কিছুই নেই। যা বুঝলাম না, সেগুলো গল্প নয়, তা স্পষ্ট। হয়তো 'স্কেচ্', হয়তো একটা ঢঙ, একটা বিশেষ 'পোজ'—যা পাঠকের চোখে পর্য্যন্ত 'পোজ'ই থেকে যাচ্ছে। সবাই বলছে প্রেম, প্রেম, প্রেম। কেউ কেউ তা বলছে বেশ তাল ঠুকে, কেউ বলছে বিনিয়ে বিনিয়ে। কেউ আবার ভয়ানক সিনিক্যাল, যেন তাদের জীবনের পুঁজি সব উজাড় হ'য়ে গেছে, যুগ-যুগের জুয়াচুরি ধরা পড়েছে। কিন্তু সেটাও এতই ঢঙ্ যে, তাকেও মূল্য দিতে পারছি না। আমার কাছে তো ধরা পড়ছে বরং তাতে তাঁদের বর্ণচোরা সেন্টিমেণ্টালিজ্ম। আমি তো নতুন যুগের আর কোন সুস্পষ্ট রূপ ধরতে পারি না—আমার অবশ্য পরিচয়ও বেশি নেই। তোমরা তো খবর রাখ—বলতে পার, এই যুগের প্রধান লক্ষণ-গুলো কি? এই কথাটার জন্যেই তোমাকে মনে মনে খুঁজছিলাম। দিন পাঁচ-সাত আগে আমি Egon Friedell নামে একজন লেখকের A Culture of the Modern Age পড়েছি। আমাদের দেশে এই 'মডার্ণ এজ' এসেছে অল্পদিন—শ'খানেক বছর মাত্র। তার আগেকার দিকটা আমার কতকটা চেনা আছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরে ক্রমশই তা আমার থেকে দূরে স'রে গেছে—আমি রইলাম জমির স্বত্ব, খাজনা, বাকি-বকেয়ার মামলায় বদ্ধ হয়ে।

ব্রজেন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ থামিলেন। নীরবে ব্যর্থ অতীতের ম্লান দিগ্বলয়ের দিকে চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিলেন। ধীর কণ্ঠে অমিত কহিল, এই 'মডার্ন এজ' জিনিসটাকে আমি আর ওভাবে দেখিনা, সে তো আপনাকে বলেছি। কলেজের ইতিহাসে রেনেসাঁস রিফর্মেশন ও আমেরিকা-আবিষ্কার থেকে ওর সূচনা লেখা হয়, তা'ই অনেকদিন জানতাম। সেদিক থেকে দেখলে আমাদেরও মডার্ন এজ রামমোহনী রেনেসাঁস, ব্রাহ্মসমাজী রিফর্মেশন ও বিবেকানন্দীয় 'কাউণ্টার রিফর্মেশন' দিয়ে গণনা করা যায়—গোটা উনবিংশ শতাব্দীটা একটা নূতন মডার্নের পাতা হ'য়ে ওঠে। এমনই ভাবে দেখা একেবারে ভুল নয়, তবে ইতিহাসের দুই দূর স্তরকে গোলেমালে এক করে ফেলাও হয় এভাবে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা পড়তে গিয়ে নৃতত্ত্বের ধারা খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম, মানুষের সভ্যতাকে ঠিক চিনতে হ'লে চিনতে হয় তার বাস্তব ভিত্তি দিয়ে—যার ওপর মানস-সৌধ গড়া হয়, যে structure-এর ওপর ওঠে চিন্তাজগতের superstructure, বেদীর ওপর বসে বিগ্রহ। এই বাস্তব ভিত্তিটা জীবিকায়োজন দিয়ে তৈরি, উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে গড়া। পাথর, দস্তা, তামা, লোহা—সভ্যতা বল্‌তে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এসব দিয়েই পরিচয়। তারপর গোচারণ, কৃষি ;—এমনই ক'রে সভ্যতা সামন্তযুগ ছাড়িয়ে এল আজ যন্ত্রবাহিত ধনিকযুগে। এক-এক জাতি এক একটা অপরিবর্ত্তনীয় মানসিক ধর্ম্মে বাঁধা—এ কথার ত কোনো প্রমাণ নেই ইতিহাসে। বরং দেখছি সবই পরিবর্ত্তনশীল, বিকাশশীল। আমাদের দেশে বিকাশ চলেছিল নানা কারণে বড় ধীরগতিতে। আমরা বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম মধ্যযুগীয় জীবন-যাত্রায়, ধ্যান-ধারণায়। তারপর এল আবার বিদেশী বণিক রাজাদের বাধা। সেই মডার্ন এজ, যন্ত্রযুগ, যথার্থ দেখা দিয়েছে মহাযুদ্ধের শেষে। তার আগে আমাদের শাসকরা আমাদের রাখতে চেয়েছে

কাঁচা-মালের যোগানদার ক'রে আর তাদের কলের মালের খরিদদার রূপে। অথচ, এদিকে পৃথিবী গিয়েছে এগিয়ে ধনিকযুগের শেষ পাদে, তার ধাক্কাও আমরা পাচ্ছি।—

হঠাৎ পর্দ্দার ওপার হইতে একটি প্রশ্ন হইল, বাবা, খাবার?

চমকিত হইয়া অমিত একেবারে থামিয়া গেল।

হঁ্যা, নিয়ে এস মা।

ঘরে ঢুকিল সবিতা—হাতে খাবারের প্লেট, পিছনে চায়ের ট্রে হাতে চাকর।

কিন্তু একবার হাত-মুখ ধুতে হবে যে আমার—বলিয়া অমিত দাঁড়াইল—অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।

বিজলী বাতির নীচে সবিতাকে হঠাৎ বেশ লাগিল—পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত। তখনকার সবিতা—সে ছয় মাস পূর্ব্বের কথা মাত্র—ছিল আরও তন্বী, সামান্য একটু চঞ্চলা। কিন্তু এখন সে দেখিতে স্থির প্রদীপের মত, তাহার দেহ ঘিরিয়া একটি স্বচ্ছন্দ ঔজ্জ্বল্য, সৌম্য শ্রী; তাহার পদক্ষেপে যেন একটা নবজাগ্রত সহজ মর্য্যাদাবোধ। আপনা হইতেই ইহার সম্মুখে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হয়। আর দাঁড়াইতেই যখন হইল, তখন উপস্থিত-বুদ্ধিতে যোগাইল অমিতের এই কথাটা—

কিন্তু একবার হাত-মুখ ধুতে হবে যে আমার।

কথাটা অতিশয় খাপছাড়া, বোকার মত শুনাইল অমিতের কানেই। এতদিন পরে—সবিতার জীবনের এতবড় বিবর্ত্তনের পরে—সবিতার সম্মুখে অমিতের এই প্রথম কথা। এমনিতর সামান্য অর্থহীন একটা কথা—কিন্তু অমিতের আর কিছু কি বলিবার ছিল—কোন অর্থপূর্ণ কথা, অসামান্য কথা? কই, না। অমিত নিজেই মনে মনে বুঝিতেছে—না। তাহা ছাড়া, সবিতাই কি তেমন কথা প্রত্যাশা করিত? বিশেষ করিয়া

এখন করিত? এখন, যখন একটা নূতন ঔজ্জ্বল্য ও মর্য্যাদা ওর দেহ-মনে বিকাশ পাইতেছে,—আর সবিতা নিজেও দেখা যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

না না,—কিছুই বলিবার ছিল না, কিছুই না।

কিন্তু তাই বলিয়া এই কথাটা ভাবিয়াও অমিত নিজের উপর খুশি হইতে পারিল না।

চাকর লইয়া চলিল। স্নানঘরে অমিত ভাল করিয়া মাথা ধুইল, সাবান দিয়া মুখ মার্জ্জিত করিল। ইঃ! যা শ্রী হইয়াছিল—সারাদিন ঘুরিয়া না খাইয়া! লোকে কি না মনে করিয়াছে, একটা পরম গাড়ল। অথচ অমিতই আবার ছবি দেখে, সৌন্দর্য্য ভালবাসে বলিয়া নিজের মনেও নিজের কাছে বড়াই করে।...বেশ ভাল করিয়া অমিত মুখে সাবান ঘষিতে লাগিল, হাতে, পায়ে, গলার নীচে, কপালে। আজ সমস্ত দিন ক্ষৌরী করাও হয় নাই। যেন ক্ষৌরী হইলে তাহার সময় বহিয়া যাইত।...

সবিতার মুখ ভাল করিয়াও দেখা হইল না। দেখার কি দরকার? কোন কাজ ছিল কি? কতবার দেখিয়াছে, গত ছয় মাস তো মাত্র দেখে নাই। তখন সবিতা ছিল শ্বশুরবাড়িতে, আর অমিত ছিল দারুণ ব্যস্ত। সবিতার কথা মনেই ছিল না অমিতের। না, মনেই পড়ে নাই। ছয় মাসে সবিতার এমন কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু ঘটিয়াছে। ইহাই আশ্চর্য্য!....

'বিবাহের জল।' সত্য কথাই, বিবাহ; জীবনযাত্রায় স্থায়িত্ববোধ, হয়তো প্রেম বা অমনই কিছু একটার প্রথম অরুণাভাস, এই সকলে জড়াইয়াই মানুষের জীবনশ্রী হঠাৎ আপনার দলগুলি মেলিয়া ধরে।...

বিবাহ একটা আলোক-বন্যার মত, না? তাহাতেই মানুষ আপনার মুখশ্রী দেখিতে পায়; দেখিয়া একেবারে সবিতার মত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সবিতা এই পরিপূর্ণতার অপেক্ষায় ছিল···সকলেই প্রতীক্ষায় থাকে—যতদিন না পায় জীবন-ভরা কোনো প্রেম, কিংবা বিরোধ,—জীবনসংগ্রামের সঙ্গী বা শত্রু মানুষ, আজন্মের যমজ; সহজন্ম সেই দোসরকে প্রেমের মধ্য দিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত সে আধখানা হইয়া থাকে। আধখানা হইয়া থাকে বলিয়াই ঘুরিয়া মরে—দোসরহীন, দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া মরে, নানামুখীন কাজে জীবনের অপচয় করিয়া ফেলে!

এইবার মুখখানা অনেক তাজা হইয়া উঠিয়াছে। চোখেও পূর্ব্বেকার তীক্ষ্ণতা নাই, বরং একটি শান্ত ছায়া আসন পাতিয়াছে।····

অমিত খাবারের প্লেট তুলিয়া লইল। সবিতা ঘরে নাই। দক্ষিণের বারান্দায় সে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ঘরের দিকে তাহার পিছন—মাথার ঘোমটা ছাপাইয়া এলো চুল পড়িয়াছে পিঠে। অলস একখানি হাত রহিয়াছে রেলিঙের উপর; করতলে নিশ্চয় চিবুক; শীতের নিষ্প্রভ আলোকেও লালপেড়ে শাড়ির বাহিরে অনাবৃত বাহুর আশ্চর্য্য মসৃণতা ও লাবণ্য চোখে পড়িতেছে।···

তোমাকে যা বলছিলাম অমিত—

অমিতের চমক ভাঙিল। কি বলিতেছেন ব্রজেন্দ্রবাবু, আর তুমি কি করিতেছ অমিত? অমিত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল।

তোমাকে যা বলছিলাম অমিত। তোমাদের জেনারেশনের চিন্তাধারার কোনও স্পষ্ট রূপ কি তুমি দেখতে পাও? আমি তো পাই না। সেদিন ডীজেল নামীয় এক লেখকের জার্মানি ও জার্মান জাতির বিষয়ে একখানা বই পড়ছিলাম,—জার্মানির চিন্তাজগতেও এমনই একটা chaos এসেছে। হয়তো সমস্ত পশ্চিমের জীবনেই তা

দেখা দিয়েছে। তাই স্পেংলারের মত লেখকদের এত নৈরাশ্য। তার কারণ আমি বুঝতে পারি। কুরুক্ষেত্রের পরে আমাদের সভ্যতাও পাংশু বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, খানখান হ'য়ে পড়েছিল। পশ্চিমের অবস্থাটা অনেকটা তেমনিতর। কিন্তু আমাদের জীবনে তো যুদ্ধ নেই, যুদ্ধান্তের সমস্যাও নেই। তা হ'লে আমাদের জীবনে এমন রূপহীনতা, এমন বিবর্ণতা এল কেন?

অমিত সচেতন হইয়া উঠিল। অন্যান্য কথা ভুলিয়া গেল।

আমাদেরও জীবনে একটা বড় সমস্যা এসেছে। আর মুশকিল—শুধু একটা সমস্যা নয়, একটা বিষম গ্লানি এযুগে আমাদের ঘিরে ধরেছে। গ্লানিটা অবশ্য এই যুগেই প্রকট হয়েছে; নইলে তা বহুযুগেরই সঞ্চিত। পশ্চিমের ধনিকতন্ত্র বাণিজ্যলোভে এদেশে এল—সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিল। মুনাফাই তার প্রাণবায়ু। সে মুনাফা বজায় রাখবার জন্যে সে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের শিল্প বাড়াতে দিলে না, বাণিজ্য ধ্বংস ক'রে দিলে। তাতে পশ্চিমের সমৃদ্ধি বেড়ে গেল, মুনাফার সভ্যতা গড়া হ'ল। আবার মুনাফারই তাগিদে এদেশে গড়তে হ'ল তার শোষণ-পথ, এই রেল প্রভৃতি। পৃথিবীতে ধনিক-সভ্যতার গৌরব আমাদের রক্ত শুষেই। কিন্তু শেষপর্ব্ব তার যখন শেষ হচ্ছে সে সময়ে, আমাদের দেশেও যুদ্ধের পরে, সেই স্বদেশী ধনিকতন্ত্র সত্যই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ দেখল। এই তেরো-চোদ্দ বছরের মধ্যে কাপড়ের কল, লোহার কারখানা থেকে এমন কলকারখানা নেই, যা আমরা না গড়ছি, হয়তো বিদেশী অর্থও তাতে খাটছে। কিন্তু এই যন্ত্রযুগের মধ্যে গিয়ে পড়াতে আমাদের গ্রামপালিত সভ্যতা ভেঙে চৌচির হবে। হচ্ছেও তাই। এই হ'ল এক বিপ্লব—বলতে পারি এ আমাদের শিল্প-বিপ্লবের সূচনা। কিন্তু এদিকে পৃথিবীতে জোর কদমে আসছে Social Revolution—সমাজ-বিপ্লব। World Capitalism-এর যুগ নিয়ে এসেছে World

Slump—বিশ্বজোড়া 'মন্দা', আনছে তাই World Revolution—বিশ্ব-বিপ্লব। আমরা অবশ্য দু'এক স্তর নিচে অগ্রগামীদের তুলনায়। কিন্তু বিশ্ব-বিপ্লবের প্রভাবও পড়ছে আমাদের দেশে। ফলে একই কালে দু'টা যুগ আমরা পাড়ি দেবার প্রয়োজন দেখছি। আমাদের জীবনে কোথাও আর স্থিরতা নেই, থাকতে পারে না। আপনার এখানে আসছি এইমাত্র—

অমিত সংক্ষেপে পথের ঘটনাটা বলিল। তারপর আবার—তখন সে বেশ উত্তেজিত—

এই লাঞ্ছনা আমাদের 'জেনারেশন' মেদে-মজ্জায় নিয়ে বেড়ে উঠেছে। ওর তীব্রতা যে কত বেশি, তা বোঝা যায় না। এই জেনারেশনের জীবনে যা কিছু সত্য, যা কিছু নিত্য, তা তাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় ফুটছে। সে প্রয়াস ঠিকমত দেখবার পক্ষে যেটুকু কালের ও স্থানের দূরত্ব দরকার, আমরা তা এখনও পেতে পারি না। তাই আমরা দেখছি এসব প্রয়াসের অসঙ্গতি, তার অযৌক্তিকতা, তার প্রবঞ্চনা, তার হাস্যকরতা। চ্যাঙড়া ছেলের দল বাস ঠেকাচ্ছে, সার্জ্জেণ্ট আসছে শুনলেই আবার পালাচ্ছে; হয়তো গলির ভেতরে থেকে ছুঁড়ছে ঢিল। জিনিসটা শুধু অন্যায় নয়, একেবারে হাস্যকর। কিন্তু হয়তো উপস্থিত থাকলে ফরাসী বিপ্লবের দিনে যারা ভার্সাইতে অভিযান করেছিল বা রুশ-বিপ্লবে যারা সমাজ উল্টে দিলে, তাদেরও এমনই অনেক হাস্যকর কাণ্ড করতে দেখা যেত। সমসাময়িকের চোখে গাছই চোখে বেশি ঠেকে, বনানীর রূপ দেখা বড় সম্ভব হয় না। আমাদের চোখের বড় বেশি কাছে থাকাতে এগুলো আমাদের চোখে বড় ঠেকে—প্রয়াসের পেছনকার মরাল ইন্‌স্পিরেশন বা রিয়েল কন্‌ডিশন্‌স আমরা ভুলে যাই। ভুল যথেষ্ট ঘটছে—উন্মত্ততার অভাব নেই; কিন্তু মোটের ওপর তাতে একটা সত্য আছে, যা আমাদের জীবনে আর কোথাও নেই—কোথাও না, কোথাও না, কোথাও না।

ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রশান্ত মুখ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অমিতের মুখে যেমনই, তাহার বাক্যেও তেমনই, উত্তেজনা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে থামিল, কিন্তু চোখে তাহার আবার জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবিতা বাহিরের দিকে পিছন ফিরিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল; জানিলে অমিত আবার কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু তাহার মন হইতে সবিতার অস্তিত্ব তখন মুছিয়া গিয়াছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, কিন্তু ক'জন যাচ্ছে রাষ্ট্রপ্রয়াসে? অল্প—অতি অল্প, জনকয়েক মাত্র। যারা চিন্তা করে, যারা সৃষ্টি করে, যারা সমাজের অন্তরের বিশ্বাস গড়ে, তার আধ্যাত্মিক ধন অর্জ্জন করে, তারা তো এসবে যায় নি। তাদের কথাই আমি বলছিলাম তোমাকে। তাদের চিন্তার রূপ, কল্পনার গতি দেখছি না যে!

অমিত কহিল, চিন্তা, কল্পনা, সৃষ্টি এখন ওসব অসম্ভব, ওসব এখন বাজে কথা। যারা রাষ্ট্রপ্রয়াসে ভেসে পড়েনি, তারা নিজেদের ভয়কে নানারূপ পোশাক পরিয়ে নিজেদের আর অপর সকলকে ফাঁকি দেয়। কেউ করেন বীরবলের অনুকরণ—pun-এর সস্তা রসিকতায় শব্দ গাঁথেন; ভুলে যান, এই 'নওরতনের-দরবারে' আবুল ফজল, ফৈজীর আসন খালি প'ড়ে আছে। কেউ হন গল্পলেখক, হয় দরিদ্রের জন্যে চোখের জল ফেলেন, না হয় দেখান প্রেমের হিস্টিরিয়া, না হয় সস্তা সিনিসিজ্‌ম। ও সবই আসলে আত্ম-প্রবঞ্চনা। নিজেদের মন থেকে এই গ্লানিবোধ ওঁরা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না, তা'ই। যারা কর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট ধারার মধ্যে নিজেদের জীবনকে সঁপে দিতে পারছে, তারা তো বেঁচেছে। যারা তা পারে নি, তাদের মধ্যে অর্দ্ধেক নিজেদের মধ্যেই নিজেরা দগ্ধ হচ্ছে। তাদের জীবন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যেন একটা জতুগৃহ—তারা পুড়ে খাক হচ্ছে হ্যাম্‌লেটের মত, "Time is out of joint. O cursed time! that e'er I was born to set it right!" তাদের

জীবনের ট্র্যাজেডি "To be or not to be"। আর বাকি অর্দ্ধেক এই ট্র্যাজেডির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে at the cost of their soul—কাব্য লিখে, গল্প লিখে। কল্পনা প্রায়ই এক ধরনের পলায়নী-বৃত্তি। তারা সবাই এই কথাটাই প্রমাণ করছে যে, তারা spiritually bankrupt, emotionally defunct, morally banal....

অমিতের স্বরে একটা আত্মগ্লানির সুর বাজিতেছিল। সে থামিল। তারপর স্বর নামাইয়া কহিল—

এযুগে চিন্তার খোঁজ করবেন না। যুগটা আসলে কর্ম্মের। It is an age of action। আপনি কর্ম্মের মধ্য দিয়েই এই যুগের নৈতিক আধ্যাত্মিক রূপের সন্ধান করুন।

চা ঢালিতে সবিতা ঘরে প্রবেশ করিল। এতক্ষণে তাহার অস্তিত্বের সম্বন্ধে পুনশ্চেতন হইয়া অমিত চমকিত হইল।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, কর্ম্মই তো শেষ কথা নয়; কর্ম্ম সভ্যতার গঠনভঙ্গির একটা খণ্ডমাত্র। তার পেছনে থাকে চিন্তা, কল্পনা, সৃষ্টি; দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য। ওসবের মধ্য দিয়ে যাঁদের সত্তার ফোটবার অধিকার, তাঁদের তুমি কর্ম্মে লাগিয়ে দিলে হবে কি?

অমিত ধীরস্বরে কহিল, কি ক'রে বলব, এযুগে ওসব জিনিস সম্ভব? সৃষ্টি সম্ভব তখন যখন প্রাণে সেই সৃষ্টি-চেতনা সহজ। শিল্প-সাহিত্য মানব-সমাজের শিখরতল, কিন্তু যে কালে সভ্যতার বনিয়াদ ভেঙে পড়ছে, নতুন বনিয়াদ গ'ড়ে উঠতে পায়নি, তখন সেই সব সমাজ-শিখরের আর কি দশা হবে? এযুগে সৃষ্টি-প্রেরণা চিন্তায় রূপ পায় না, তা ফোটা সম্ভব নয়; সে প্রেরণা ফুটতে পায় কর্ম্মে। সৃষ্টি যা হবে, তাতে দেখবেন বার্দ্ধক্যের ছাপ, আত্মছলনার অধ্যাত্মবাদ, কিংবা নিতান্তই কাম, সেক্সপ্রমত্ত জল্পনা। চিন্তায় নয়—কর্ম্মেই এযুগের জীবন আপনাকে প্রকাশিত করছে।

অমিত একটু থামিয়া আবার বলিল, আপনি বুঝতে পারবেন—আমার কেবলই মনে হয়, বিশুদ্ধ চিন্তা বলে কিছু নেই। চিন্তা মূলতঃ প্রাণের ধর্ম্ম নয়, বরং প্রাণাবেগের বিরোধী। প্রাণ চায় স্ফূর্ত্ত হতে অর্থাৎ মূর্ত্ত হতে। প্রাণ মূর্ত্ত হয় একমাত্র কর্ম্মে। যখন কর্ম্মে তা ফুটতে পায় না, তখন কখনও কখনও সে নিজের পুঁজির খোঁজ নেয়, বুঝে দেখতে চায়, কেন ফুটতে পাচ্ছে না। তারই নাম চিন্তা—objective thought —a sort of spiritual weak tea; কর্মজীবনের second best substitute। আবার কখনও প্রাণ একেবারে পেছন ফিরে একটা কাল্পনিক রূপজগৎ সৃষ্টি করে, তাতে কাল্পনিক কর্ম্মে নিজেকে তৃপ্ত করে। এইটা হ'ল একালের তথাকথিত সৃষ্টি—সচরাচর যাকে বলে শিল্প ও সাহিত্যের জগৎ; a sort of spiritual narcotics। মূলতঃ, Thought is repressed action।

ব্রজেন্দ্রবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা নয় অমিত। বিশুদ্ধ চিন্তারও জগৎ আছে, তারও দাবি আছে, সে দাবি গৌণভাবে দেখলে হয়তো কর্ম্মেরই দাবি। কিন্তু তা আসলে হচ্ছে সত্তার দাবি। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-স্বরূপের ওই হ'ল রূপ; চিন্তাই তার ধর্ম্ম। আর স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

অমিতের অপূর্ব্বকে মনে পড়িল। অপূর্ব্বের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবুর কথার অনেকটা মিল আছে। কিন্তু অপূর্ব্ব ঠিক চিন্তার পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার মন একটা মূল্যজ্ঞানের মাপকাঠি পাইয়াছে,—পাইয়াছে কি না কে জানে,—অমিত ভাবিল,—তবে অপূর্ব্ব পাইয়াছে ভাবিয়াই সুখী ও তৃপ্ত। একদিন অমিতও এমনই একটা মানদণ্ডের সন্ধান করিতেছিল—কর্ম্মে, চিন্তায়, জ্ঞানে, শিল্পে, জীবনের সর্ব্বত্র, একটা মূল্য সে খুঁজিতেছিল—সত্যকারের মূল্যজ্ঞান আয়ত্ত করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না—শিল্প সাহিত্য পাণ্ডিত্য, এই

সবের নামে কিছুতেই তাহার সত্তা ঢাকা পড়িল না; নিজ সত্তার দাবি ও বিরাট বিশ্বের দাবিকে একটি সমন্বয়ে আনিয়া সে পৌছাইতে পারিল না। ...কেন তাহা পারিল না? অমিত অনেক করিয়া ইহার উত্তর খুঁজিয়াছে, অনেকরূপে নিজের মনে যুঝিয়াছে,—ভাল করিয়া বুঝিয়াছে—তাহার নিজের অপরাধ নয়। অপরাধ তাহার দেশের পারিপার্শ্বিকের, তাহার যুগের পরিমণ্ডলের। সে আত্মসর্ব্বস্ব নয়, তাহার সত্তা নিজেকে চিনিয়াছে, চিনিয়াছে বলিয়াই তো সে নিজেকে কালের সহিত, কাজের সহিত, মিলাইয়া লইতে চায়। এতটুকু জানিয়াছে বলিয়াই সে জানে, নির্ব্বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছুই নাই। ইতিহাসের ছাত্র সে; সে এই কথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে।...ব্যক্তিবাদ আসলে মানুষের 'ছোট আমি'র পূজা, যে 'আমি' সংসারের ভয়ে, জীবিকার ভয়ে, গুরুর ভয়ে ছোট হইয়া নিজের ছোটত্ব মানিয়া লয়, status quo মানিয়া চলে। এই ভয় দূরে ঠেলিয়া ফেলিলে দেখিবে, যেখানে সত্তার সত্যকার প্রকাশ সেখানে সত্তার অনন্ত বিরাট রূপ। শ্রেণীবৈষম্যপীড়িত এই ব্যবস্থা শেষ না হইতে মানবসত্তা সেই বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করিতেই পারে না—সমাজকে পঙ্গু করিয়া নিজেরও সেই সুস্থ সম্ভাবনাকেই সে অস্বীকার করে।...'একান্ত নিজস্বতার' অর্থ কি একেরই স্বার্থরক্ষা? বদ্ধ ঘরে বসিয়া অভিজাত-সাহিত্য লেখা বা নির্ব্বাণোন্মুখ উল্কার দিকে তাকাইয়া থাকা? না না, এই subnormal, arrested growth-কে সত্তার প্রকাশ বলা চলে না। সে প্রকাশে ঘরের দুয়ার-জানালা খুলিয়া যায়, হয়তো ছাদ ফাটিয়া পড়ে, তাহা ভেদ করিয়া আকাশ ছুঁইয়া খাড়া হয় বিরাট সত্তা—জগতের কোণে কোণে তাহার দৃষ্টি, উল্কার আলোতে তাহার মাথায় আশীর্ব্বাদ ঝরে—বিশ্বব্যাপী বেদনার পৌরুষময় অনুভূতিতে তাহার করুণা উছলিয়া উঠে—এ করুণা 'the deep overflowing Love that is in the breast of God'—জগৎ-

জোড়া সেই করুণার প্লাবন। তাহাই আছড়াইয়া পড়ে তাহার বুকে। যেখানে তাহার সত্তার পূর্ণতা সেখানে সে এমনই 'বড় আমি'—আত্মস্থ অর্থাৎ একাত্ম, আর তাই বিশ্বাত্ম।

ইহাই অমিতের জীবনবোধ। কিন্তু এই কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। তাই সকলে তাহাকে ভুল বুঝে। মনে করে, সে ক্ষণিক নেশায় নিজেকে ভাসাইয়া দিতেছে, নিজের সত্তাকে বিস্মৃত হইতেছে।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—অমিত মনে মনে কহিল,—তাহলে, তোমার ধর্ম্ম কি? অতএব জীবনের প্রধান কথা—'ধর্ম্ম কি?' "অথাতোধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"। ইচ্ছা করিলে তাহাতেই জীবন কাটাইয়া দিতে পার।

অমিত কহিল, মসিয়েঁ বাঁদার La Trahison de Clerke মহীধর আমাকে শোনালে—এমনই Intelecttual-এর স্বধর্ম্মের দাবি। সেদিন ধূর্জ্জটীপ্রসাদের লেখায়ও এমনই কথা পড়ছিলাম। কিন্তু তাঁর লেখা এখনও তত পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে নি; তাই তাঁর কথাও বুঝে ওঠা শক্ত। তাঁকেই এ বিষয়ের উদাহরণ ধরা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পদ্ধতির দাবি নিয়ে তিনি সকলকে আঁচড়ে ফেরেন। তাঁর মতে তাঁর সত্তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়েই রূপ-পরিগ্রহ করবে। সে সত্তা সত্য হ'লে আর ক্ষুদ্র থাকবে না; নিজের আত্মার ও পৃথিবীর সুখ-দুঃখের দাবিকে সমানভাবে মূল্য দেবে। কিন্তু তাঁর লেখায় দেখবেন, যে কোনও কর্ম্ম বা প্রচেষ্টার প্রতিই একটা অসহিষ্ণুতা। কেন? তিনি নিজেও বোধ হয় জানেন না, কেন। জানলে তাঁর ইন্‌টেলেকচুয়াল-সুলভ আয়েশী চিন্তা ছাড়তে হয়। তিনি দেখবেন, তাঁর নব্য-ব্রাহ্মণের দল বিদেশী রাজার অনুচর ও গুপ্তচর। এই কাজ দুটো গেলেই তাঁদের ব্রাহ্মণত্বও যাবে। তাই এই ব্রাহ্মণদের 'সত্তার পূর্ণতা'র মানে হচ্ছে,

কথার জাবর কেটে জীবনকে শেষ ক'রে দেওয়া। এই হ'ল তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পদ্ধতির পরম পরিণতি—আমাদের ইনটেলেকচুয়ালদের বিশুদ্ধ চিন্তার নমুনা। এই banality থেকে জীবনকে পরিত্রাণ পেতে হবে। জীবন তা পাবে একমাত্র কর্ম্মে—হয়ত ভুল কাজে, পাগলামো কাজে, হাস্যকর কাজে,—তবু কাজেই তার মুক্তি। আমাদের সত্তারও আজ ঠিক এই দাবি: আমাকে ছোট গণ্ডি থেকে ছাড়া দাও। আমার 'নিজ সত্তার' অর্থ আমার 'স্বার্থ' ব'লে মনে ক'রো না। যে নিজ সত্তার স্ফূর্তি নিজেকে পৃথিবীর সঙ্গে সমন্বয়ে সুস্থির করাতে, ভবিষ্যতের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়াতে;—তার পূর্ণতা আপনাকে প্রসারিত করায়,—আমি তা'ই চাই—আমার সত্তা তা'ই চায়। আজ তার ঋজুতা নষ্ট হয়ে যায়,—কাঁধের ওপর চেপে বসে old man of the sea,—তার মেরুদণ্ড বেঁকে যায় সেলাম ঠুকে ঠুকে, আর চেতনা মথিত হয়ে ওঠে করুণায়—সংরুদ্ধ, সংক্ষুব্ধ করুণায়; এবং প্রাণ বিক্ষুব্ধ হয় হিংসায়—উদ্বেল, উন্মত্ত হিংসায়——by soulful love and soulful hate।—হ্যাঁ, hate। স্বীকার করি, hate। যখন চোখে দেখি কাটা মাথা, ফাটা পিলে, তখন সত্তা পূর্ণ হতে পায় না। যখন মনে করি এই সভ্যতার ভারবাহী মরণযাত্রীদের—এই শোষণধর্ম্মী রাষ্ট্র, তখন একটা high velocity bullet-এর মত মন-প্রাণকে এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে নিষ্প্রাণ ফেলে রেখে যায়—Time is out of joint. Time is out of joint.

অমিতের স্বর ক্রমশ চড়িতেছিল; শেষদিকে তাহা হঠাৎ ক্রন্দনের মত ক্ষুব্ধ করুণ হইয়া উঠিল। থামিতেই হঠাৎ তাহার চৈতন্য হইল, সে একি একটা নাটুকে বক্তৃতা করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ সে বক্তৃতা করিতে পটু নয়। বজবজের মজুরদের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেদিন সে যেন কথাই খুঁজিয়া পায় নাই; এত তাহার বলিবার আছে, কিন্তু তাহা তো

উহাদের কাছে বলিবার মত নয়। তবে আজ মুখ খুলিয়া গেল কিরূপে? লজ্জাবোধই জাগিতেছিল, এমন সময়ে তাহাকে পরিত্রাণ দিলেন বঙ্কিম বাঁড়ুজ্জে ও অনুকূল দত্ত। ব্রজেনবাবুর অতিথিরা আসিতেছেন।

সবিতা, তোর কাকাবাবুদের জন্যেও একটা ব্যবস্থা করিস—বলিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু ইঙ্গিত করিলেন।

অমিতের দৃষ্টি পড়িল—ঘরের কোণে একটা কেদারায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সবিতা এতক্ষণ তাহার কথা শুনিয়াছে। না জানি, এই তরুণী বিদুষী মেয়ে তাহাকে কি পাগলই মনে করিয়াছে! নিশ্চয়ই তাহার কৌতূহল বাড়িয়া গিয়াছে, কোন্ জগতের জীব এই অমিত? না না, অমিতকে সবিতা বেশ চিনে, কত বার দেখিয়াছে, কতবার শুনিয়াছে—কত দিন, কত সন্ধ্যায় শুনিয়াছে তাহার অদ্ভুত মতবাদ। সবিতা নিশ্চয়ই অমিতকে জানে, আজও বিস্মিত হয় নাই। কিন্তু এমন করিয়া কথা অমিতই কি বরাবর বলে যে, সবিতা আজও বিস্মিত হইবে না? বিস্মিত না হউক, নিশ্চয়ই কৌতুক বোধ করিয়াছে, এ কি ক্ষ্যাপা মানুষ! ··অমিত, পৃথিবীতে সবাই ইন্দ্রাণী নয় যে, পলিটিক্যাল উন্মাদনায় উন্মাদ হইবে; আর তোমার কথাকে মনে করিবে wisdom—বুঝি যুগের বাণী। অমিতের নিজের সম্বন্ধে সঙ্কোচ বাড়িল। এদিকে সিঁড়ি বাহিয়া জুতার শব্দ ও কণ্ঠস্বর নিকটে আসিতে লাগিল। চমকিত হইয়া সবিতাও তাহাদের সম্বর্ধনায় অগ্রসর হইল।

অমিত কহিল, আমি কিন্তু খানিকক্ষণ পরে পালাব। আজ সকালে বাড়ি না ফিরলে চলবে না।

এত সকালেই? এখন তো সবে সাতটা।

না, আর একটু পরে হ'লেও চলবে। আজ খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কি না, আর ফিরতে পারি নি।

কেন? খাওয়া-দাওয়া হয়নি তা হ'লে?

ঘরে দুইজন অতিথি প্রবেশ করিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, এস, বড় দেরি করলে ভাই তোমরা। এর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধুপুত্র—

পরিচয় অগ্রসর হইতে লাগিল। অনুকূলবাবু কহিলেন ওঃ তাই! তা এখন কি করছ? জার্নালিজ্‌ম? কত দেয়? একশো?' শোন ব্রজেন্দ্র, শোন বঙ্কিম—একশো! এত লেখাপড়া শিখে শেষে কিনা একশো! আর কিছু কর না? টিউশনি?

না।

চলে কি ক'রে? তোমার বাবা তো এখন কাজ করেন না; তা হ'লে উপায়? ছেলেপুলে হয়েছে?

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, অমিত বিয়ে করেনি এখনও।

ওঃ! ভুলে গেছলাম। আর বিয়ে করবেই বা কি? একশো টাকায় কি এদিনে পরিবার প্রতিপালন চলে? আমার মৃত্যুঞ্জয়কে তো দেখছি, ছেলেপুলে বাড়ছে বছরে বছরে, এদিকে মুন্সেফির চেষ্টায় বুড়ো বাপের পর্য্যন্ত হাইকোর্টে ছুটোছুটি ক'রে পায়ের শির ছিঁড়ে গেল, কোথায় কি! ভাগ্যিস আইনের নোটগুলি ছিল, নইলে—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর না? কিছু পাঠ্য-বই লেখ না! স্কুলপাঠ্য বই। কথাটা আমি ভাবছিলাম। এখনও ওদিকে খুব সুবিধা আছে। দেখ, এক-একটা লোক—

অমিত নীরবে মাথা নোয়াইয়া শুনিতে লাগিল। ভাবিল, এই বারই শুনিতে হইবে, 'ইতিহাসের নোট লেখ', 'ইংরেজীর নোট লেখ'—By An Experienced Professor'—ক্ষুদে অক্ষরে যথাসম্ভব ঠাসা লেখা; ভারী মোটা বই। ছেলের দল কিনিবার জন্য ছুটিবে। 'ম্যান' অর্থ লিখিবে 'এ ম্যাস্কুলিন পার্সন, এ বাইপেড অব দি হিউম্যান স্পিসিস।' আর কি? পকেট ভারী হইবে, এই যুগের যুবকদলের কাছে তোমার ইন্‌টেলেকচুয়াল পরিচয়ও দেওয়া হইল, সত্তা পরিপূর্ণ হইল।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, ওকে দিয়ে সেসব হবে না। বড় জোর দুটো প্রবন্ধ লিখে ও বেরিয়ে যাবে দেখতে মোহেঞ্জোদড়ো বা নাগার্জ্জুনিকুণ্ডম্।

অনুকূলবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, সে আবার কি ?

দুটো হিষ্টরিক্যাল প্লেস—

বঙ্কিমবাবু বিজ্ঞভাবে কহিলেন, হরপ্পা অ্যাণ্ড মোহেঞ্জোদড়ো, সেই পুরনো শহর দুটো,—পড়নি তার কথা ? এবারকার স্টেট্‌স্‌ম্যানে কার বই রিভিউ করতে ওগুলোর উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধ আছে। শহর দুটো নাকি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

অনুকূলবাবু কহিলেন, না, স্টেট্‌স্‌ম্যান আমি পড়ি নি, বাড়িতে অমৃতবাজার আসে।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, ওই তোমার এক ভূত। কি হয় ও কাগজ দিয়ে ? একটা ভাল প্রবন্ধ নেই, কাল্‌চার্ড জগতের কোন খোঁজই নেই। ইংরেজীও কি কদর্য্য ! এড্‌ওয়ার্ড্‌স সাহেব আমাকে বলেন, ওদের নতুন বাড়ীতে গেলে—

অনুকূলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এড্‌ওয়ার্ড্‌স কে ?

ব্রজেন্দ্রবাবু বুঝাইয়া দিলেন, স্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক বিভাগের অন্যতম কর্ত্তা।

অনুকূলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে তাঁর চেনা কি ক'রে ?

বঙ্কিমবাবু উত্তর দিলেন, রাজশাহীতে। ওঁর ভাই যখন প্রিন্সিপ্যাল, আমি তখন—। মেজ ছেলেটা আবার পড়ত ইংরেজীতে অনার্স। সেই সূত্রে ইংরেজী সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা হ'ত। এখনও তা চলে। এড্‌ওয়ার্ড্‌স বলেন, 'তুমি তোমাদের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে লেখ না, মিঃ ব্যানার্জ্জি ? স্টেট্‌স্‌ম্যান তা সসম্মানে নেবে।'

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, লিখছ নাকি কিছু?

লিখব কি? আছে কি লেখবার? বাংলা সাহিত্যে আজকাল যা বেরোয়, যেমনই বিশ্রী তেমনই অশ্লীল। এড্‌ওয়ার্ড্‌স বলেন, 'বেশ, তাই লেখ।' কিন্তু তাতে যত সব ছিঁচকে ছোকরাদের আস্কারা দেওয়া হবে। আমি তাই লিখি না। এড্‌ওয়ার্ড্‌স হেসে বলেন, "Write of yourself, that is of your namesake। বাংলা সাহিত্য can be summed up in two words, Bankim and Bankim, isn't so?

এই বলিয়া বঙ্কিমবাবু স্মিতহাস্য করিলেন। পরে—আমি তো জানি, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আছেন, শরৎচন্দ্র আছেন;—তোমাদের ডাক্তার নরেশ সেনও আছে। আরও অনেক ছেলে-ছোকরা আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি বাংলা সাহিত্য বড় পুয়োর, তা এড্‌ওয়ার্ড্‌সকে বোঝালাম। তিনি বলেন, 'তা ঠিক, মিস্টার ব্যানার্জি। তা হ'লে এক কাজ কর—তোমরা অনুবাদ কর। ইংরেজী থেকে বাংলায় খুব অনুবাদ কর, তাতে হয়তো তোমাদের সাহিত্য একটু সজাগ হবে।' কথাটা মন্দ নয়—সত্য সত্যই যুবকরা যদি তা করত, তা হ'লে দেশের একটা বড় কাজ হ'ত। এই তো 'ইফ উইণ্টার কাম্‌স' রয়েছে। কিংবা ধর 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। কর না তোমরা অনুবাদ! তুমিই কর না অমিত! শুধু জার্নালিজ্‌মে সময় নষ্ট না করে একটু স্থায়ী কাজ কর। দেখ, এখনও কেউ হল্‌ কেনের বই অনুবাদ করে নি। রাইডার হ্যাগার্ডেরই কি বিশেষ কিছু অনুবাদ হয়েছে? তাও হয় নি, অথচ তোমরা গোর্কি, ক্নুট হ্যাম্‌সুন এদের বইও অনুবাদ করছ। ওসব বইয়ে কি মাথামুণ্ড আছে? অমিত, তুমি ভাল বই অনুবাদ কর।

অমিত কি উত্তর দিবে ভাবিতেছিল, উত্তর না দিলেও আর চলে না! ব্রজেন্দ্রবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন।

অমিতের সঙ্গে আমার খানিক আগে কথা হচ্ছিল, বঙ্কিম। ও বলে এযুগ লেখাপড়ার যুগ নয়—কাজের যুগ। তাই লেখাপড়া আপাতত বন্ধ না ক'রে লাভ নেই—লেখাপড়ার সত্য রূপ ফুটবে না।

বঙ্কিমবাবু বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, সে কি! লেখাপড়ার যুগ নয়, কাজের যুগ! তার মানে কি? কাজ আবার কি? কি কাজের কথা বলছ তুমি?

ব্রজেন্দ্রবাবুই উত্তর দিলেন, যে কাজের ডাক মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে মথিত করে, সেই কাজ—অনেকাংশে সেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় রূপ নিয়েছে।

পলিটিক্‌স!—বলিয়া বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হইলেন। অনুকূলবাবু একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন,—মৃত্যুঞ্জয়ের মুন্সেফির সম্ভাবনা এখনও যথেষ্ট আছে। খুব সতর্কতার সহিত বঙ্কিমবাবু কহিলেন, আমি ওসবের অর্থ বুঝি না, এই খদ্দর পরা, নিশান ওড়ানো, চরকা ঘোরানো। তোমরা রবীন্দ্রনাথের মতামত জান নিশ্চয়। এসব নিতান্তই বাজে জিনিস, আর তাতে চিন্তাশীল লোকেরা যাবে কেন? বরং এসব ফ্যাশান ও হুল্লোড় থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়াই হ'ল তাঁদের কর্ত্তব্য। দেশকে চিন্তা করতে শেখাতে হবে, তবে না দেশ বাঁচবে।

অমিতের মনে পড়িল, 'চিন্তার মুক্তি, চেতনার আত্মপরিচয়!' ইহাই না অপূর্ব্বেরও দাবি? তবু অপূর্ব্ব শুধু ফাঁকা কথা কহে না, তাহার মন এখনও ততটা শূন্য, দেউলিয়া হয় নাই। কোথাও তাহার একটা সত্য আছে; সে শুধু কাঁচা সোনা। কিন্তু ইঁহারা যেন সংসারের গিলটি-করা মানুষ।

অনুকূলবাবু কহিলেন, আজকালকার দিনকাল যেন কেমন। আমাদের যুগে আমরাও সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছি, আনন্দমোহনকে দেখেছি। তখনকার দিনে পলিটিক্‌স ছিল ভদ্র। কিন্তু স্বদেশী যুগের

পর থেকে সেসব এমন বিশ্রী হয়েছে! ছেলেরা কথাই শোনে না। আমার বীণার বড় ছেলে—সে নাকি জেলে চ'লে গেছে পিকেটিং ক'রে। লজ্জাও হয়, ভয়ও হয়। ছেলেদের বাপ-মা কারও প্রতি বিন্দুমাত্র রেস্‌পেক্‌ট নেই—কেবল কথায় কথায় স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। চারিদিকে ইন্‌ডিসিপ্লিন। মেয়েগুলো পর্য্যন্ত মিছিল করে বেলেল্লাপনায় ঝুঁকেছে—না আছে লজ্জা, না সরম।

ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, এ তোমাদের কি গঞ্জনা? ইহার পরে কি কালির সমুদ্র তোমাদের চারিদিকেও গর্জ্জন করিয়া উঠিবে?....অমিত যেন গ্লানিতে, বেদনায় মরিয়া যাইতেছে।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, সে ঠিক ব্রজেন্দ্র, আমাদের সেই যুগে আমরা অনেক বেশি খাঁটি পলিটিক্‌স করেছি; অথচ নিজেদের লেখাপড়া, কাজকর্ম্ম ভাসিয়ে দিই নি। নিজে মানুষ না হ'লে দেশের লোককে মানুষ করব কি ক'রে? আর তাই যদি না হয়, তবে স্বরাজটা যা হবে!—রক্ষা করুন্ সে 'স্বরাজ' থেকে আমাদের ভগবান্।

তাঁহার ভঙ্গিতে মনে হইল, তাঁহার কথানুযায়ী না হইলে স্বরাজ শুধু অসম্ভব নয়, সে স্বরাজ সম্ভব হইলেও তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য। অমিতের মন তখনও বলিতেছিল—ইন্দ্রাণী, বিষ-রসনা পেটি বুর্জোয়ার জগতে তোমাদের পথ কোথায়? এমন সময় তপ্ত লুচি ও খাদ্যাদির প্লেট পড়িল অমিতের সম্মুখে। অমিত বিস্মিত হইল। বুঝিল, সে সারাদিন খায় নাই—এই কথাটুকু বারান্দা হইতে সবিতার কানে গিয়াছে। তাহার মন একটি স্নিগ্ধতায় ভরিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্রবাবু ধীরভাবে কহিলেন, খাবারটা শেষ কর। সত্যি অমিত, আমাদের কালে একটা অবাধ অবকাশ ছিল—তখনও তোমাদের বর্ত্তমান

সভ্যতার উৎকট তাড়া আমাদের পেয়ে বসে নি। দিনগুলো আমরা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতাম, তার রূপ রস রঙ উপভোগ করতে পারতাম। এখন যেন সব ছুটেছে গতির উত্তেজনায়—সব তলিয়ে যাচ্ছে। সেই অবকাশের দিনে আমরা রবীন্দ্রনাথ পড়তাম, রাস্কিন পড়তাম; সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমরা সেসব চিন্তার শ্যামল ছায়ায় ব'সে কাটিয়ে দিতাম। অথচ আমরা হাক্স্‌লি, হার্বার্ট স্পেন্সার, কোঁৎ, মিল এসব নিয়েও তখন উৎসাহী ছিলাম। তোমাদের যুগটাকে যেন তাই আমরা ধরতে পারি না। একটা Civilisation of Repose-এর শেষ পাদে আমাদের আবির্ভাব; একটা Civilisation of Speed-এর প্রথম পাদে তোমরা এসেছ—বড় ব্যস্ত, বড় ত্রস্ত, বড় ক্ষুব্ধ।

অমিত চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

সত্যই যুগ শেষ হইয়াছে—সেই দিন ফিরিয়া আসিবে না।

এই তো তাহার সম্মুখে একটা বিগত যুগের বাহনদের সে দেখিতেছে—ব্রজেন্দ্রবাবু, বঙ্কিমবাবু, অনুকূল বাবু। ব্রজেন্দ্রবাবু সত্যই সেই পুরনো পৃথিবীর অধিবাসী, যে পৃথিবীতে মানুষের ধ্যানের আসন পাতা সম্ভব ছিল,—সকাল থেকে সূর্য্যাস্ত, যেখানে মর্ম্মরিত তরুচ্ছায়ায় বসিয়া জীবন সম্বন্ধে কল্পনা চলে, সুন্দর কথার মৃদুগুঞ্জনে দিন ভাসাইয়া দিলেও যেখানে অশোভন হয় না। কিন্তু সেদিন আর নাই। আজ সত্যই যৌবনের চোখে মধ্যাহ্নজ্বালা—out of time, out of time।···সুহৃদের ভাবনায় গভীরতা নাই, তাই সে সুখী; অপূর্ব্ব এক চোখ বুজিয়া পৃথিবী দেখে, তাই সে সুখী। কিন্তু, সে সুখ তো অমিতের নাই। অমিতের কেন, সত্যকার জীবনপিপাসু কাহারও নাই। তাহাদের কাছে One world is dead, the other powerless to be born—আর সেই নবজন্মই চাই। নবজন্ম চাই—মানবসভ্যতার নবজন্মের আয়োজন—

মানবসমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা—সমাজের সেই রূপান্তরের প্রয়াস—কর্ম্মের সেই আনন্দলোকে অমিতও পাইতে চায় নবজন্ম।

অমিত কহিল, কিন্তু এবার তো আমি যাব—মা ব'সে আছেন। বাড়িতে খাবার দরকার হবে না, তবু একবার যাওয়া উচিত।

বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এত শীঘ্র কেন? ব্রজেন্দ্রবাবু কারণটা বলিলেন। অনুকূলবাবু বলিলেন, এই দেখ, এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—দেবে একশোটি টাকা। আজকালকার ছেলেরা বাঁচবে কি ক'রে? তুমি বরং অন্য কিছু কাজ দেখ। টেক্স্ট-বই লেখ। শিক্ষার তো এই উদ্দেশ্য —শিক্ষা-বিস্তার করা।

টেক্স্ট-বইয়ের মারফৎ শিক্ষা-বিস্তারের কল্পনা অমিতের নিকট খুব কৌতুককর বোধ হইল। 'প্রিয় সুবোধ! আমাদের এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। ইহার বর্ত্তমান রাজা সম্রাট পঞ্চম জর্জ। তিনি ইংলণ্ডেরও রাজা। তাঁহার রাজত্বে সূর্য্যাস্ত হয় না—'। কিংবা, 'ম্যান—এ বাইপেড অব দি হিউম্যান স্পিসিস'।

অমিত একটু চুপ করিয়া পরে কহিল, উপায় নেই। একটা জেনারেশনকে আপনাদের বলি দিতেই হবে। মায়া ত্যাগ ক'রে আমাদের কাজের দুয়ারে বলি দিন—নইলে আমরা না পাচ্ছি শান্তি, না পাচ্ছি সুখ। আমাদের প্রাণই যাচ্ছে ছন্নছাড়া হয়ে। কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের জেনারেশন যদি তার মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিতে পারে, তা হ'লে এসব বিক্ষোভ কেটে যাবে, দেশের আকাশ মেঘমুক্ত হবে, পৃথিবীতে নূতন সূর্য্যোদয় সম্ভব হবে। তা হ'লেই এর পরের জেনারেশন আবার চিন্তায় ও সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এই জেনারেশনের ভাগ্যলিপি—কাজের মধ্যে পূর্ণ হওয়া। তা না করলে আমরাও নষ্ট হব, ভাবী জেনারেশনও এই

মরীচিকার পেছনে ছুটে মাথা খুঁড়ে মরবে। কাজেই দু-একটা জেনারেশনকে চিন্তার জগৎ থেকে ছুটি দিন, চিন্তার জগতে তাদের দান খুঁজবেন না।

এত বড় বক্তৃতা—কিন্তু গরম লুচিতে কি না সম্ভব! বিশেষত, শেষ দিকে রসগোল্লার সুস্বাদু রসে তাহার মন পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এবার অমিত বিদায় লইল।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, তোমাকে আর একটা কথা বলব, অমিত। আমার নতুন উপন্যাসখানা দেখেছ? তুমি না হয় তোমাদের কাগজে রিভিউ ক'রো—আমি একখণ্ড বই পাঠিয়ে দেব। অনেকের বইখানা খুব ভাল লেগেছে। 'দেবদূতে' একজন বলেছেন যে, সরোজ অফ্ স্যাটান-এর পরে এমন বই হয় নি। তুমি সে রিভিউটা দেখে নিও, লিখতে সুবিধা হবে।

অমিত বিনীতভাবে তাহা স্বীকার করিল। ব্রজেন্দ্রবাবু তাহাকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। কহিলেন, অমিত, তুমি রবিবার আসবে? রবিবার দুপুরে খাবে এখানে। তারপর আবার কথা হবে। কাজই বল আর যাই বল, আমার সঙ্গে তোমার কিন্তু কথা বলার কাজ। তা থেকে আমি তোমাকে ছুটি দেবো না—রবিবার ছুটির দিনটাতেও না। আর তা ছাড়া অমিত, চিন্তাও কাজ। হয়তো তা'ই তোমার কাজ।...

একটু থামিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, আমাদের জেনারেশন তো শ্মশানে এক পা দিয়েছে, আর পা তুলে নিলে ব'লে। তাদের কাজ কে তুলে নেবে হাতে? ভেবে দেখ, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-হীন বাংলা, বিপিন-চন্দ্র রামানন্দবাবু-ছাড়া বাংলা; অরবিন্দ-ব্রজেন্দ্র শীল প্রায় চোখ মুদেছেন, জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রও তো চলেছেন; পলিটিক্স যেন তোমাদের আবার সর্ব্বক্ষেত্রে দেউলে না করে। দেউলে হ'য়ো না, 'কাজ কাজ' ক'রে আত্মহারা হ'য়ো না। বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও তোমরা, অমিত।

কথার স্বর আগ্রহাতিশয্যে যেন একটু কাঁপিয়া গেল। অমিত এই প্রথম পাইল তাঁহার কণ্ঠে ভাবাবেগের আঁচ—এরূপ আঁচ অমিত পাইয়াছে তাহার পিতার নিকট, এমনই দুই-একটি নিমেষে। সেই পিতার ও পিতৃবন্ধুর কথা একযোগে তাহার মনে পড়িল। তাঁহারা সেই প্রাচীন পরিপূর্ণ অবকাশের স্নেহময় ছায়ায় লালিত জেনারেশন।

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, তা হ'লে রবিবার এসে দুপুরে খাবে।

সম্মতি জানাইয়া অমিত সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

একটা জেনারেশন চলিয়া যাইতে বসিয়াছে, নূতন জেনারেশন আসিয়া গিয়াছে—চোখের সম্মুখে যেন অমিত শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে সে দৃশ্য দেখিতে পাইতেছে। ওই পথ বাহিয়া অস্পষ্ট কুয়াশায় মিলাইয়া যাইতেছে তাহাদের পিতৃগণ—তাহার পিতা ও ব্রজেন্দ্রবাবু। গম্ভীর স্থিরপদের সেই স্থির শব্দ মিলাইয়া যাইতেছে; শান্ত কণ্ঠস্বর যেন একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে—'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও, নিউ জেনারেশন!' কি অপরিসীম উদ্বেগ আছে ঐ শান্ত মিনতির পিছনে! যুগে যুগে এমনই বুঝি পিতৃগণ জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার হাত হইতে নিজেদের উদ্ধার করিতে চান এই সান্ত্বনায়—পুত্রগণ তাঁহাদের অনায়ত্ত স্বপ্ন জিনিয়া লইবে, তাঁহাদের আত্মার তর্পণ করিবে। ঊর্দ্ধে পিতৃলোক হইতে নির্নিমেষ চোখে তাঁহারা চাহিয়া থাকেন, পৃথিবীর জীবন্ত বুকের রক্তের দোলায় কহিতে থাকেন, 'বুড়োদের কাজ হাতে নাও, নিউ জেনারেশন।' নব নব জেনারেশনের অঞ্জলি লইয়া সুবিস্তৃত প্রাণস্রোত ছোটে কালের পারাবারে আপনাকে ঢালিয়া দিতে। মহাকালের এই দীপালী-উৎসবে এক-একটা জেনারেশন যেন এক-একটি প্রদীপ।...

তোমাদের প্রদীপ কি নিবিয়া যাইবে, ধোঁয়াইতে থাকিবে?....

কে জানে, কোথায় কোন্ সমুদ্রাহত গিরি-কবাটের পিছনে নবযুগের জোয়ার প্লাবন তুলিয়া আসিতেছে, তিমিররাত্রির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িতেছে !

Say not, the struggle naught availeth.....

ওল্ড জেনারেশন, তোমাদের দান ফুরাইয়াছে। তোমাদের মধ্যেও বঙ্কিম বাড়ুজ্জে, অনুকূল দত্ত আছেন—সেই অভিশপ্ত বিষয়ী-মনের দূতেরা তেমনই মূর্ত্তিমান। না, তেমনিতর সাংসারিকতায় নিউ জেনারেশন না ডুবিলেই ভাল। ম্যাথু আর্নল্ড-কীর্ত্তিত অক্সফোর্ডের মতই ছিল তাঁহাদের ছায়াসুন্দর জীবন—ধনিক-সভ্যতার বিকাশের মাঝখানে একটি শান্ত পর্ব্ব। সাকসেস-দেবতার এই পূজারীদেরও গড়িয়াছে তবু সেই দিনগুলিই। উহার পিছনে ছিল অচেতন মানুষের অব্যাহত শোষণ—দুই-একজন ব্রজেন্দ্রবাবুকে পালন করিতে শত শত লোক চিরজন্মের ক্ষেতের মধ্যেই দাসত্ব করিয়া গেল, দুই-একটি আর্নল্ডকে পোষণ করিতে সহস্র সহস্র বালকের বুকের রক্ত ঢালা হইয়াছে কারখানার কলে। সেই 'সিভিলিজেশন অব রিপোজ'-এর অর্থ—জন দুই লোকের বিকাশ, বিরাম ও বিশ্রাম; আটানব্বই জনের দিনরাত্রির পরিশ্রম, ক্ষুধা, অশিক্ষা, গ্লানিময় পশুবৎ জীবনযাত্রা। এই তো সেদিনকার সভ্যতা—'সিভিলিজেশন অব রিপোজ'। তাহার অপেক্ষা এই 'সিভিলিজেশন অব স্পীড' ভাল—এই রক্তচক্ষু মোটর যাহা চোখ ধাঁধিয়া তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, নিশ্চয়ই উহাদের ওই ছ্যাকরা-গাড়ির জীবনের অপেক্ষা তাহা গরিমাময়।

পাশ ঘেঁষিয়া একটা মোটর তীব্র বেগে চলিয়া গেল। এ কি সার্কুলার রোড ? না, ধোঁয়ার মলাটে মোড়া একখানা কালো পাত ?

নিউ জেনারেশন: ত'াই বা কেন? ওই তো সবিতাকে দেখা যাইতেছিল, ওই রেলিঙের উপর শ্লথ বাহু রক্ষা করিয়া একটি সুপরিণত সুসীমতায় স্থির, ওই অতিথির জন্য বাক্‌হীন আতিশয্যহীন সুন্দর সেবা—কোথাও নিজেকে জাহির করা নাই।....সত্যই সবিতার জীবনে একটি কমনীয়তা ও মহনীয়তা আসিয়াছে। এই মহনীয়তা সে পাইল কোথায়? বিবাহের মধ্যে? এমনই করিয়া নিজেকে পূর্ণ করার জন্যই তো বিবাহ। আর, তাহার অভাবে সেই সহজন্ম দোসর হারাইয়া ছন্নছাড়া জীবন-যাপনের নাম ব্যাচেলরহুড, কৌমার্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্য—অর্থাৎ আধখানা জীবন!

শুধু এই? সঙ্গ এবং আসঙ্গ? ইহার বেশি কিছু নয়? ফুলকো লুচি ভাজিয়া তোমার সামনে ধরা, একটি তন্বী, গৃহলক্ষ্মী—অন্তত বা অধিকন্তু—অবসর-মাফিক যে জিজ্ঞাসা করিবে গোর্কির বইটার কথা? ইহাই কি আজিকার নারীর পক্ষে যথেষ্ট?—অমিত মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল।—এই মানব-মহাবিপ্লবে নারীর ভূমিকাটা শুধু এই?···

কিন্তু অমিতের চিন্তা বন্ধ করিয়া দিয়া বাস আসিল। কোথায় যাইবে? যুগলের বাড়িই এখন যাওয়া উচিত। দক্ষিণগামী বাসের জন্য অমিতের অপেক্ষা করিতে হইবে।

ব্যাচেলরহুড! অমিত ভাবিতে লাগিল, সেও তো অবিবাহিত। চিরকুমার থাকিবে ইহাই কি তাহার সঙ্কল্প? যাহারা অন্তরঙ্গ নহে, তাহারা ভাবিত, অমিত কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে—কিংবা কেহ অমিতের প্রেমে পড়িয়াছে। তাহাদের বিবেচনায়—যুবক, খানিকটা লেখক-শ্রেণীর ও অধ্যাপক-জাতের যে লোক, তাহার পক্ষে প্রেমে পড়াই উচিত। আর তাহার সঙ্গে প্রেমে না পড়িয়াই বা কোন্ মেয়ে

পারে—রূপ অমিতের যাহাই হউক, রোজগারও তাহার যতই হউক তুচ্ছ? ইহাদের রহস্যময় ইঙ্গিতে অমিতও রহস্যময় হাসি হাসিত—ইচ্ছা করিয়াই। তাই অপূর্ব্বকে অমিত বলে, 'ফুলে ফুলে ঘুরে মধু খাব।' সুহৃদকে বলে, 'তোমার মত বাড়ি আর গাড়ি নেই, ভাই। জান তো মোটরকার না থাকলে এদিনে পরিবার রক্ষা করা অসম্ভব।' মাকে বলিত, 'কদিন অপেক্ষা কর, পেনশন নিয়ে সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।' কিন্তু কেন অমিত বিবাহ করে নাই?…বিবাহ—না, বিবাহের কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। মহীধর বলিতেন, 'ওটা দেখবার চিজ নয়, ক'রে ফেলবার জিনিস। অতএব—' কথাটা ঠিক, কৌমার্য বা ব্রহ্মচর্যকে অমিত এমন-কিছু মহৎ জিনিস বলিয়া বিশ্বাস করে না। সে বরং বিবাহকেই মানব-জীবনের একটা অপরিহার্য্য অভিজ্ঞতা ও আশ্রম বলিয়া মনে মনে চিন্তা করে। তাহাতে জীবন-বোধ সুসীম ও সুষমাযুক্ত হয়।…কিন্তু তাহাই কি হয়—যে যুগে সমাজের সমস্ত পাঁজরে পাঁজরে আজ অসামঞ্জস্যের ঘুণ ধরিয়াছে? দেখিতেছে না সে ইন্দ্রাণীকে?

বাস আসিয়াছে। শীতের রাত, ভীড়ও কম, ভালই হইল। অমিত বাসে চাপিয়া জানালা দিয়া অস্পষ্ট কুয়াশার দিকে তাকাইয়া আপনার মনে ভাবিয়া চলিল। হয়তো সে সবিতাকে লাভ করতে পারিত—জীবনে পাইত কি তখন একটু সুসঙ্গতি?…

জীবন—কর্ম্মের মধ্য দিয়া আপনাকে চিনে, প্রেমের মধ্য দিয়াই আপনাকে পূর্ণ করিয়া লাভ করে। একা পাওয়া—আধখানা পাওয়া।…

এমনই সন্ধ্যায় যদি দুইজনে নীরবে পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে, যেমন একদা সে দাঁড়াইতে পারিত সবিতার সহিত—এমন শ্লথ মসৃণ

অনাবৃত বাহুখানি হয়তো তাহার বাহুতে ঠেকিবে, রেলিঙে দুইজনের বুক ন্যস্ত রহিবে।···কিংবা তাহার ছোট ছাদের দূর আঙিনার কোণটিতে সন্ধ্যাতারার নিচে দাঁড়াইয়া আছে সবিতা—যেন সত্যই আকাশের তারাই নিচে নামিয়া আসিয়াছে। তাহার মত তাহার চোখের আলো স্নেহে কোমলতায় উজ্জ্বল···অমিত হয়তো তাহার কাছে বলিতে থাকিত তারাদেরই কথা, জীন্‌সের 'মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' কত বেশি মিস্টিরিয়াস হইয়া উঠিত সবিতার চোখের দৃষ্টিতে, বিস্ময়ে-সুন্দর ওই চোখের রহস্য-ব্যাকুল দৃষ্টিতে! তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া চুলের সুগন্ধে আকুল চেতনা উপপ্লাবিত করিয়া, অমিত তখন কহিত,—সেই সুদীর্ঘ লীলামধুর, অতল-দৃষ্টি দুইটি চোখের উপর তাহার চোখ রাখিয়া—

'শিয়ালদা, শিয়ালদা, শিয়ালদা, শিয়ালদা।' অমিত চমকিত হইল, একি! তাহার নিমীলিত নয়নের সম্মুখে কাহার চোখ দুটি ফুটিয়া উঠিয়াছে? ইহা তো সবিতারও নয়। কাহার? এ যে ইন্দ্রাণীর—ইন্দ্রাণীর!

যেন কে তাহাকে কোন্‌ অসাবধান মুহূর্তে দেখিয়া ফেলিতেছে—অমিতের এইরূপ মনে হইল। কে সে? অমিত নিজে? না না, অমিত এ ভাবে নিজেকে দেখিতে দিবে না। কিছুতেই না।

পরক্ষণে অমিত জোর করিয়া হাসিল। কাহাকে ঘিরিয়া এই অদ্ভুত খেয়াল রচনা করিতেছিল অমিত? সবিতাকে? ইন্দ্রাণীকে? কি অদ্ভুত! সবিতার তো আজ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর ইন্দ্রাণী? সে তো পূর্ব্বাপর বিবাহ-সূত্রেই তোমার আত্মীয়া। সাধারণ একটি স্বামীবর্জ্জিতা নারী, বছর উনত্রিশ বয়স,—কিংবা একটি আই. এ. ক্লাসের ছাত্রী, বছর উনিশ যাহার বয়স—তাহাকে লইয়া জীন্‌স-এডিংটনের

স্বপ্ন দেখা কি হাস্যকর কামনা, রোমান্স-বিলাসিতা! ইহার পরেও তুমি ফ্রয়েডকে বলিবে 'ফ্রড'? মনের গোপনপুরে একবার ঢুকিয়া দেখ না!...বেশ, বিজ্ঞান আলোচনাই যদি করিতে হয়. তোমার বন্ধুরা তো রহিয়াছে, তোমার ছাত্ররাও তো ছিল অনেকে।...সেই নিষ্প্রভ-দৃষ্টি, ভাবলেশহীন-মুখ ক্লাসটা অমিতের মনে পড়িল। বিদ্যায়, মনের বুদ্ধিতে সবিতা তো তেমনই দুই শত ছাত্রের মধ্যে একজন মাত্র। ইন্দ্রাণীর বিদ্যা হয়তো আরও কম,—অমিত নিজে অবশ্য মানুষের বিদ্যা অপেক্ষাও বুদ্ধির উপর আস্থা রাখে বেশি। তথাপি উহাদের শিক্ষিতা বলিয়া বিবাহ করাও যা, ওই দুই শত ছাত্রের একটিকে বিবাহ করাও তো তাই। এক অসুবিধা, তাহারা পুরুষ; তেমনই আবার less expensive-ও।...

কিন্তু ইন্দ্রাণী? না, অবিচার করিও না, অমিত। ইন্দ্রাণী খরুচে বটে; তাহার কারণ, সে পরের জন্য মুক্তহস্ত হইতে না পারিলে মুক্তপ্রাণ হয় না। সবিতাও কি খরুচে? বোধ হয় না। সে তাহার পিতারই কন্যা। তাহার পিতা তো ফ্যাশানের পূজারী নন, 'স্নব' নন, অমিতব্যয়ীও নহেন। হয়তো সবিতাও খানিকটা তদ্রূপ হইয়াছে।...অমন একটি ছোট কথার ইঙ্গিত মনে রাখিয়া কেমন আশ্চর্য শোভনতার সহিত অমিতের আতিথেয়তা সে সম্পন্ন করিল। অথচ কোথাও নিজেকে জাহির করিল না—কিছুই প্রকাশ করিল না, কোন আগ্রহ, কোন ব্যগ্রতা, কোন বিশেষ নিদর্শন। অমিতকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে তাহার কোনই অসুবিধা হইল না। অথচ তাহাতে ঔদাসীন্যও নাই, বরং হৃদয়ের পরিচয় আছে। কিন্তু বাহুল্য নাই, আতিশয্য নাই। ইন্দ্রাণী হইলে তাহার সেবায় থাকিত একটা ঐশ্বর্য, একটা মধুর আতিশয্য। কিন্তু সবিতা, বালিকা সবিতা, মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দুইই সম্পূর্ণ রাখিয়াছে। এই সুনিপুণতা সত্যই

এক আশ্চর্য্য জিনিস। একেবারেই অসম্ভব কিন্তু নয়, তবু তাহা আশ্চর্য্যকর বই কি। অমিত ইন্দ্রাণীকেও দেখিয়াছে, অনবদ্য তাহার আতিথেয়তা। অমিত দেখিয়াছে ললিতাকেও—চঞ্চলা সে হরিণী; দেখিয়াছে স্বরোকে।...আশ্চর্য্য এই বাংলা দেশের মেয়েরা—এমনই তাহাদের সুন্দর সুশোভন স্নেহ। মায়েদের কথা ছাড়িয়া দিই। মা, মা, মা,...না, তাঁহাদের শ্রেণীই আলাদা। কিন্তু ইহারাই বা কি কম—এই সবিতা কিংবা স্বরো, সুধীরা বা ললিতা, অথবা ইন্দ্রাণী? ...বাংলা দেশেই বা কেন বলি, সর্বত্রই বোধ হয় ইহারা এইরূপ। অলক্ষিতে আপনাকে লোপ করিয়া শুধু কল্যাণহস্তের সেবাটুকু পুরুষের অভিমুখে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এ জাতের দেশ নাই, কাল নাই।...সেই পুরাতন মায়ের জেনারেশন চলিয়া যাইতেছে—নূতন জেনারেশন জন্ম লইতেছে। ধরণীর মাতৃহৃদয় যুগের পর যুগ এমনই নারীর মধ্য দিয়া আপনাকে মেলিয়া ধরিতেছে—অবিচ্ছিন্ন মাতৃত্বের ধারা জীবনকে আপনার স্নেহপীযুষ পিয়াইয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে।...বুড়ীদের কাজ হাত তুলে নাও, নিউ জেনারেশন।...

এমনই জীবন—এমনই মহাকালের বিরাট মিছিল।

বিবাহ তো সবাই করে—শুধু বিবাহের মধ্যে অমৃতত্ব নাই। বরং বিরহের, বিচ্ছেদের মধ্যেই প্রাণের দুর্বার গতি গজাইয়া উঠে —যেমন উঠিয়াছে ইন্দ্রাণীর। বিবাহের জলে মেদ বাড়াইয়া দেহমনে সে ঝরিয়া পড়ে নাই—যেমন ঝরিয়া পড়িবে হয়তো সবিতা, যেমন ঝরিয়া পড়িয়াছে সুনীলের বউদিরা, যেমন ঝরিয়া পড়িতেছে সুধীরা—যাহার কিছুরই অভাব নাই, প্রেমেরও অভাব নাই,— এমনই হয়তো ঝরিয়া পড়িতেছে, কে জানে, স্বরো—হয়ত ঝরিয়া পড়িতেছে শুকাইয়া। কে জানে বুঝি ইহাই জীবনের অলঙ্ঘ্য

বিধান। পরশপাথর লইয়া সে পরিচিত দিন-রজনীর শিকলকে ছুঁইয়া সোনা করিতে চাহে—সোনা করিয়াও রাখে। কিন্তু চক্ষুহীন ক্ষ্যাপারা অভ্যাসবশে জীবনের সেই দান ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যায়—ফিরিয়াও তাকায় না। উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া চলে—মুন্সেফি, ওকালতী, ছেলের জন্য নোট লেখা—নূতন উপন্যাস লিখিয়া যশোলাভ।....

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশপাথর···আর ফেলিয়া যায় সেই পরশপাথর। এমনই জীবন।

এস্‌প্ল্যানেড পার হইয়া গাড়ি চলিয়াছে—শীতের মাঠের হিমেল হাওয়া। কতদিন এই মাঠে অমিত বেড়ায় নাই। বুক ভরিয়া একবার হাওয়া টানিয়া লইয়া ভাবিল,—ময়দানটা সমস্ত শহরের যেন হৃদ্‌যন্ত্র। শহরটা তো কুৎসিত—কী শ্রীহীন হইতেছে! চোখ মেলিয়া শীতের রাত্রির বর্ণহীন রূপ অমিত পান করিতে লাগিল।

জগুবাবুর বাজার। যুগলের বাড়ি এখান হইতেই যাইতে হয়। অমিত নামিয়া চলিল। রাত্রিও হইতেছে—শীতের সাড়ে আটটায় এখনই মনে হয় অনেক রাত। তবু একটু গলি ঘুরিয়া যাওয়া উচিত।

যুগল অপেক্ষা করিতেছিল, কহিল, এসেছে?

না, রাত দশটার পরে নিজে আসবে। বাড়িটা দেখবে, তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তারপর কাল সকাল থেকে থাকবে—যদি কথায় গোলমাল না হয়।

গোলমালের কি?

কোন বাঁধাধরা নিয়ম, তোমাদের নিষেধ, তার ওপর খাটবে না; তাতে তুমি রাজি?

যুগল কহিল, তা না হ'লে তাকে আসতে বলব কেন?

তা হ'লে চল, তাকে নিয়ে আসছি।

কোথায় সে?

এখন বেরুলে খিদিরপুরে ট্রামের লাইনের মোড়ের কাছে দেখা হবে। চল।

যুগল ভিতর হইতে জামা কাপড় লইয়া আসিল। দুয়ারে দাঁড়াইয়া

একটি তরুণী প্রশ্ন করিল, তা হ'লে তুমিও তখনই খাবে? বাবা যদি দেরি করতে চান? তুমি না এলে খেতে চান না যে তিনি।

তুই সঙ্গে ব'সে কিছু ব'লে আজকের মত তাঁকে বুঝিয়ে রাখবি, বুলু।

অমিত যুগল চলিল! পুরাতন প্রশ্নে অমিতের মন মোচড়াইতে লাগিল—কোথায় লইয়া চলিলে এই উদার যুবককে পিতার স্নেহ হইত, ভগ্নীর ভালবাসা হইতে, আপনার উন্মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন হইতে?

রাস্তার মোড়। অমিত একবার পিছন ফিরিল—ঘরের দুয়ার তেমনই খোলা, সেই আলোকে তেমনই একটি ছায়া।···ছায়া, আরও ছায়া, আরও ছায়া হইয়া তুমি মিলাইয়া যাইবে বুলু, আজ হইতে তোমার দাদার জীবনে। উপায় নাই, উপায় নাই—Time is out of joint ....'দু-একটা জেনারেশনকে আপনারা বলি দিন, Time is out of joint'।

সুদীর্ঘ কাহিনী। সুনীল শেষ করিয়াছিল—'কাল থেকে আসতে পারি। কিন্তু কথাগুলো জেনে বুঝে আমাকে বলবেন যুগলবাবু। বঞ্চনা আমি করি না যে তা নয়। না ব'লে অনেক জায়গায় ঠাঁই নিই। আমার প্রয়োজন তাদের থেকে বড়, এই হ'ল আমার মটো। আপনার কাছে বঞ্চনায় চলত না। একে আপনি অমি'দার বন্ধু। তাতে আবার আপনার বুদ্ধিও আছে। ধরা প'ড়ে যেতাম। তার চেয়ে এইটা অনেক বেশি সুবিধার। তাই, জেনে রাখুন আমার লক্ষ্য, পথ, পাথেয়। এখন চলুন যদি শখ থাকে দেখি আপনার বাড়ি।'

গলিতে-গলিতে ঘুরিয়া চলা। রাত এগারোটা। বাড়ি পাতি-পাতি করিয়া সুনীল দেখিল। বুলু উঠিয়া আসিল। যুগল কহিল, আমার বোন বুলু, স্কুলে পড়ে।

সুনীল তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল, তথাপি আমাকে এখানে থাকতে বলছেন, যুগলবাবু?

কেন ?—যুগল জিজ্ঞাসা করিল, বুলু সবই জানে।

জানেন, আমার আঁচ লাগলে আপনাদের সব ছাই হয়ে যেতে পারে—এমন কি ওঁর মান-সম্ভ্রম পর্য্যন্ত ফুঁকে শেষ ক'রে দেবে—শুধু অপরে নয়, আপনার আত্মীয়রাও ?

মাথা নিচু করিয়া বুলু কহিল, আপনি আমাদের দাদা। বোন কি এসব ভয়ে ভাইকে ছেড়ে দেবে ?

কেমন পাকা কথা। এই রাত্রিতে কিন্তু কথাটা একটুও নাটুকে ধরনের শোনাইল না। আর কথা নাই।

বেশ, কাল সকালে আটটায় আমি আপনাদের এইখানে আসছি। আপনারা মনে রাখবেন, আমি দার্জিলিং মেলে নামব, জলপাইগুড়ি থেকে আসব ; নাম সুরেশ মৈত্র।

সকলে বিদায় লইল।

অমিত কহিল, আজ কোথায় কাটাবে সুনীল ?

খারাপ জায়গায়। হাজরা রোডে। আশ্রয়দাত্রীর নাম নাই বা শুনলে ? সে সতী মেয়ে নয়।—বলিয়া হাসিয়া গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অমিত রমেশ মিত্র রোডের দিকে চলিল। এবার অমিতের কাজ একটু হাল্কা হইল। অমিত অন্তত খানিকটা ভারমুক্ত বলিয়া নিজেকে বোধ করিল—আজিকার মত, এই রাত্রির মত, সে করিয়াছে তাহার কর্তব্য।...কিন্তু করিয়াছে কি সত্যই ? সুহৃদ কি তাহা বলিত ? এই যা, সুরোকে সেই চিঠি লেখা হয় নাই। আর ইন্দ্রাণী—কাল দেখা করা হয় নাই, আজ অফিসে সে কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল ? চিঠি রাখিয়া গিয়াছে—'বিকালের পূর্বে তোমার দেখা চাই।' অমিত পারিল না তাহার কথা রাখিতে, অমিত পারিল না তাহাদের শোভা-যাত্রাটা দেখিতে, পারিল না তাহার সেই অনুরোধটিও রাখিতে—

সেই সগৌরব স্পর্দ্ধিত গতি, সেই উজ্জ্বল জলন্ত দৃষ্টি---অমিত দেখে নাই। এখন গেলে দেখিবে অন্য রূপ—ইন্দ্রাণীর অভিমানিনী রূপ, ছল ক্রোধ, সুন্দর সহাস্য আনন্দ। নিশ্চয়ই সগর্বে বলিবে ইন্দ্রাণী আজিকার শোভাযাত্রার কথা—'জান অমিত, জান,—না, তোমাকে বলব না, কেন তুমি গেলে না? ভারী অন্যায় তোমার।' তারপর ইন্দ্রাণী করিবে উহার বর্ণনা। বলিতে বলিতে স্বর আনন্দে গর্বে গরিমায় উচ্ছলিত হইবে, চক্ষু আয়ত হইবে, মুখ উজ্জ্বল হইবে।...সেই সুশ্রী মুখ, বিস্তৃত চক্ষু, অমিত যেন চোখে দেখিতেছে।

কিন্তু এই তো ইন্দ্রাণীর বাড়ি, ঘর অন্ধকার যে! ইন্দ্রাণী কি তবে শুইয়া পড়িয়াছে? অমিত যেন হতাশ হইল, যেন কি তাহার ব্যর্থ হইতেছে! কড়া নাড়িতে দুয়ার খুলিয়া গেল। ঝি জানাইল, মাইজী একবার ফিরিয়াই আবার বাহির হইয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, ফিরিতে দেরি হইবে। অমিত অপেক্ষা করিবে নাকি?

রাত প্রায় বারোটা। শীতের রাত্রি। বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। অমিত হতাশ হইয়া একটু দাঁড়াইল। তারপর ফিরিয়া চলিল রসা রোডে।

বাস আসিতে একটু দেরি হইল। তবু অমিতের মনে একটু আরাম আসিয়াছে, দিনের মত কাজ চুকিয়াছে। এখন সমস্যা বাড়ি ফেরা। মা, বাবা, পিসীমা, কানাইয়ের মা—ইহাদের সম্মুখে কি করিয়া উপস্থিত হওয়া যায়? না, ইঁহারা এক বিষম দায়। অমিত ইঁহাদের যদি একটু তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিত, এমনই বুলুর মত! হয় না? মা কি বুলুর মত বলিতে পারেন না? না, তাহার মা নিতান্তই অবুঝ, সরল। তাঁহার চিন্তার ও কল্পনার গণ্ডি বড় ছোট। সেই ছোট্ট আকাশের তলায় তাঁহার স্নেহঘেরা কোলটিতে তিনি আপনার আঁচলখানি দিয়া ছেলেকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন। বিশাল দিগন্তপ্রসারিত দিক্‌চক্রবাল কেন তাঁহার সেই শিশুকে টানিয়া কাড়িয়া লয়? তাঁহার আঁচল শূন্য

করিয়া দেয়? সর্বনাশিনী সে দিগঙ্গনা কেন মাতাকে নিঃসন্তানা করিতেছে?

অমিতের মা বড়ই অবুঝ। অতি সামান্য, অতি সাধারণ বাঙালী মা, আর কিছুই নহেন। ইহার বেশি, কিছু হইলে অমিতের সুবিধা হইত, অমিত গৌরব বোধ করিত। কিন্তু না, কি জানি, আবার তাঁহাকে মানাইত কি না—কেমন দেখাইতেন মা!···

আবার অমিত ভাবিতে লাগিল, ইন্দ্রাণী গেল কোথায়? কোন্ নূতন ক্ষ্যাপামির সন্ধানে? কোন লক্ষ্মীছাড়া বৈপ্লবিক রোমাণ্টিক বীরের খপ্পরে পড়িল কি? না, ওই চৌধুরীর ফিরিয়া আসিবার কথা উঠিয়াছে, আর ইন্দ্রাণী খুঁজিতেছে জেলের পথ—সুড়ঙ্গের পথ। অমিত জানে, কত সহজ ইন্দ্রাণীকে ঠকানো। সংসারকে সে জয় করিতে চায়, সংসারের পরিচয় সে জানে না। আদর্শের উত্তেজনায়, প্রাণের আবেগে সে চায় উত্তেজনা, চায় উদ্দাম রোমাণ্টিক স্বপ্ন। তাই, অমিতের কথায় সে ধৈর্য হারায়। ইন্দ্রাণী মনে মনে জানে, অমিতের কথাই সত্য। কিন্তু জীবনে তাহার এত স্থিরতা সহ্য হয় না। সে চায় দ্রুত গতি, সে চায় অদ্ভুতের আদর্শ। আজগুবি প্ল্যান ও প্লট লইয়া, ইংরেজকে চমকাইবার কল্পনা লইয়া যে আসে, ইন্দ্রাণী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া বসে, মনে করে, সেই সত্যকার বিপ্লবধর্মী। দুই হাতে টাকা ছড়ায়, নিজের অলঙ্কারও সে রাখে না। সময়ে-অসময়ে তাহারই পিছনে ছোটে, কোন কথায় কান দেয় না—মানের কথা নয়, লজ্জার কথা নয়, ভয়ের তো লেশও তাহার নাই। আজ সে কি এমনই কোন কল্পনার খেয়ালে ছুটিয়াছে? তাহাকে কে রক্ষা করিবে? অমিত? এ কি অমিতেরই দায়?···

বাস অসিল, অমিত উঠিয়া বসিয়া পড়িল, জানালায় মাথা রাখিতে শীতের হাওয়া মাথায় লাগিল। আঃ! বাঁচা গেল। কনকনে

অগ্রহায়ণ-শেষের শীতল বাতাস। তবু যেন আরামে চোখ বুজিয়া আসে।

এক রকম করিয়া দিনটা কাটিয়াছে, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হইল না বটে, স্থনীলের একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার পরে তাহার যাহা ঘটিবে, সে অমিতের ঠেকানো অসম্ভব। সবই তো এইমাত্র শুনিল, নিজেই আগু-বাড়াইয়া বিপদ টানিয়া আনিয়াছে। অমিতের সাধ্য কি সে তাহাকে বাঁচায়! কিন্তু বাঁচাইতে সে চাহে কেন? স্থনীলের ভাগ্যলিপি স্থনীল পরিপূর্ণ করিবে। ইন্দ্রাণীর ভাগ্য সে নিজে করিবে জয়। দুই-একটা জেনারেশনকে তো আমাদের বলি দিতেই হইবে··· তাহাদের ধরিয়া রাখিয়া ভাবী জেনারেশনকেও ব্যর্থ হইতে দিলে তো চলিবে না। সেদিক হইতে কেইবা স্থনীল, কেইবা ইন্দ্রাণী, কেইবা অমিত? আপনাদের জীবনকে নিঃশেষে সঁপিয়া দেওয়ার মধ্যেই তাহাদের পরিপূর্ণতা, না হইলে তাহাদের কোন মানে নাই।···স্থনীল চলিয়া যাক। তাহার দিন সুদীর্ঘ হইবে না, না হউক। দিন-মাসের বালু কুড়াইয়া জড়ো করিলেই কি জীবন দীর্ঘ হইল? দিনের সংখ্যাতেই কি জীবনের পরিমাপ?···অমিত জানে, শুধু দিনের পর দিন গাঁথাতেই মানুষের মনের আশা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা—শুধু বাঁচিবার, মাত্র বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য আদিম দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের। শুধু আকাঙ্ক্ষা নয়, তাহাতেই মানুষের আনন্দ। তথাপি জীবনের মানে আরও বেশি—সে শুধু দিন গাঁথিয়াই শেষ হয় না—দীর্ঘতাই সফলতা নয়। সে চাহে বিকাশ—আপনাকে মেলিয়া দিতে, উদ্‌ঘাটিত করিতে। বিকাশ দিনরাত্রির সংখ্যায় নয়, বিকাশ আপনার পরিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায়, অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। There is only one Eternity—in intense living। সেই অসীমতা হয়তো একটি নিমেষের মধ্যে জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে—অপরিমেয় বিদ্যুদ্দীপ্তিময়

একটি নিমেষে,—এক নিমেষে মানব-সত্তার চরমশ্রী ফুটিয়া উঠিবে; পরমুহূর্তে আর তাহা নাই,—থাকিবার দরকারই বা কি?

সুনীল থাকিবে না—সুনীল থাকিবে না—হয়তো ইহাই তাহার পরিচয়ের পথ—তোমার দুঃখ করিয়া লাভ নাই অমিত।...

There is only one Eternity—in intense living.... INTENSE LIVING.... INTENSE LIVING... INTENSE LIVING....

অমিত একবার চোখ খুলিল,—আর্ট এক্জিবিশনের চিত্রিত প্রাচীর-পট বাহিরে ঝুলিতেছে, বাস তাহা পিছনে ফেলিয়া গেল। এমনই করিয়াই অমিতও ওই সুপ্ত প্রাসাদের শিল্প-নিদর্শনগুলিকে আজ পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। বিকাশের সঙ্গে আজ তাহার এখানে আসিবার কথা ছিল, তাহা সম্ভব হয় নাই। দিনটা ক্ষ্যাপার মত তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল, দাঁড়াইবারও সে অবসর পায় নাই। ততক্ষণ ওই সুসজ্জিত সৌধের চিত্রগুলির সম্মুখে কত লোক ঘুরিয়াছে—কেহ দাঁড়াইতেছে, কেহ পালাইতেছে। নন্দলাল বসুর 'মহাপ্রস্থান' এখানে রহিয়াছে—প্রাচীর-গাত্রের সেই চিত্রিত সৃষ্টিগুলি তেমনই নিশ্চয় মূক প্রতীক্ষায় আছে—ঘরের অন্ধকারে এখন কি করিতেছে? উহারা কি দিনের দর্শকদের অলস জড়দৃষ্টির কথাই স্মরণ করিয়া অন্ধকারের আসর জমাইয়াছে? ওই প্রাচীরের তীর হইতে তাহাদের নীরব ভর্ৎসনা কি অমিতের উপর বর্ষিত হয় নাই?...অমিত, সৌন্দর্য্যলোলুপ অমিত, শিল্পরসিক অমিত, কোথায় ছিলে সারাদিন—অর্থহীন অকাজের আরাধনায়, আয়ুহীন মিথ্যার মোহে? অথচ এখানে একবার দাঁড়াইলে তোমার মন ভরিয়া উঠিত। হয়তো সকলকে তুমি গ্রহণ করিতে না। কিন্তু, কে জানে, নন্দলাল বা অবনীন্দ্র বা কোন নূতন শিল্পী মুহূর্ত্তমধ্যে তোমাকে এই Eternityর প্রশান্ত

অন্তঃপুরে পৌছাইয়া দিত, তোমার ধ্যানলোকে তুমি উত্তীর্ণ হইতে ;—Eternity would descend around you। একবার দাঁড়াইলে তুমি Intense Living-র মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে ;....There is only one Eternity—in intense living। সারাদিনের ছুটাছুটিতে তুমি তাহাই উপেক্ষা করিয়া গেলে।...'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশপাথর।'...সমস্তটা দিন এই ছুটাছুটি—স্নান নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই—যেন উন্মত্ত কীটাণুদুষ্ট কোন কুকুর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিতেছে।...যাওয়া যায় না? এই সুপ্ত প্রাসাদের দ্বার খুলিয়া একবার চুপি-চুপি, অমিত, এখন সেখানে ঢুকিলে?—গৃহমধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে, প্রাচীরের যে কল্পনা-মূর্ত্তিরা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গোপন সভা ভাঙ্গিয়া যাইবে—তাহারা ছুটিয়া পালাইবে—গৃহান্তর্বর্ত্তী অন্ধকার তোমার অনধিকার-প্রবেশে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে।...

অমিত চোখ খুলিয়া আবার টান হইয়া বসিল। মাথায় কি সব অদ্ভুত খেয়াল যোগাইতেছে? আজ আর প্রদর্শনীতে যাওয়া হয় নাই। বাড়িতে ফাঁকিটা তবু বজায় রাখিতে হইবে, ধরা না পড়িলেই হয়। একদিন কিন্তু বিকাশের সঙ্গে প্রদর্শনীতে যাইতে হইবে। নন্দলালবাবুর কি ছবি আসিয়াছে, কে জানে! নূতন শিল্পীরাই বা কি করিতেছে? সেই ছলভারতীয় চিত্রকলা ও অনুভূতিহীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিক্রয় করিয়া ইঁহারা কতদিন মানুষকে ঠকাইবেন? অমিত জানে, এই ভারতীয়তার মূল নাই, তাই মূল্যও নাই। থাকিবে কি করিয়া? বাঙালীর এই সভ্যতারই মূলে শিকড় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাপে পড়িয়া দেশের ধনিকেরা শিল্পপতি হইতে পারিল না। শেঠ, বসাকেরা উল্টা হইলেন জমিদার ও কোম্পানির কাগজের মালিক। মধ্যযুগের

আধ-ভাঙা সামন্ততন্ত্রই বাঙালীসমাজে টিকিয়া রহিল—অস্বাভাবিক এই বিদেশীয় শাসনে। এদিকে আবার সে-শাসনের চাপেই দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইল। দেশের মধ্যবিত্তরা পড়িল—বিলাতী বুর্জোয়া সভ্যতার যাহা সৃষ্টি তাহা। ইহাতে তাহাদের মন রাঙা হইয়া উঠিল। তাহারাও একটা কিছু সৃষ্টি করিতে গেল। কিন্তু সৃষ্টি জিনিসটা এই অনাসৃষ্টির মধ্যে বেশিক্ষণ সম্ভব নয়। সৃষ্টির নামে এখন উহারা খোঁজে এই বিক্ষুব্ধ বাস্তব হইতে নিজেদের আত্মগোপনের উপায়—Thought is repressed action. Art is an escape from life···

জীবনকে বীরের মত না হউক, পুরুষের মত স্বীকার করাই বড় কাজ। পৃথিবীকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিবার মত বুদ্ধি ও সাহসই বড় কথা। বাস্তব পৃথিবীর এই বাস্তব রূপান্তরের দাবিকে নিজের জীবনে গ্রহণ করিতে পারাই বড় সার্থকতা। অমিত তাহাই করিতে চায়। থাক শিল্প-প্রদর্শনী, থাক চিন্তার মুক্তি, হল কেনের অনুবাদ কিংবা টেক্‌স্ট-বই।

অমিতের মনে পড়িয়া গেল—'হল কেনের অনুবাদ কিংবা টেক্‌স্ট-বই' অনুকূল দত্ত ও বঙ্কিম বাঁড়ুজ্জে, অতীত-প্রায় জেনারেশন।···পাকা বিষয় বুদ্ধি, ক্লীব এই জেনারেশন—কী শুষ্ক ইহারা! আত্মার এক অন্ধকার নিশা।—ইহার অপেক্ষা এই সুনীলদের উন্মত্ত আত্মবিলোপও অনেক বেশী হেল্‌থি, ইন্দ্রাণীর অশান্ত গতিবেগও পুষ্টিকর।

অমিতের একে একে মনে পড়িল—ইন্দ্রাণী, সুনীল, দীনু, মোতাহের—হাঁ, মোতাহেরও। না, নূতন জেনারেশন, নূতন ধারণা, নূতন কল্পনা ও নূতন পদ্ধতিতে ব্যাকুল হইয়াছে। বুড়ারা কহিতেছে—নূতনদের দান নাই। সত্যই তাহাদের দান সামান্য। তাহারা যে খুঁজিতেছে,—নানা পথে, নানা মতে, নানা প্রয়াসে পথ খুঁজিতেছে—ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসায় জ্বলিতেছে। তাহাদের দান? তাহাদের দান যে আত্মদান। তাহাদের

দান—স্বপ্ন। এখনও তাহারা স্বপ্ন দেখিতে জানে। জীবনরূপ মহাস্বপ্নে তাহারা বিভোর। And he whom a dream hath possessed knoweth no more of doubting। অনলশিখার মত তাহারা। তাহারা সবাই জ্বলিতেছে—জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে চলিয়াছে।…না, খাক হয় নাই, হইবে না। তাহারা জ্বলিবে—জীবন ব্যাপিয়া জ্বলিবে—দিনের পর দিন জ্বলিবে—The burning bush burned with fire, and the bush was not consumed।…'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এই তাহাদের প্রার্থনা।—ছোঁয়াইলে এ যুগে কবিতা বাহির হয় না—অপূর্ব্ব বিকাশ যাহাই বলুক—মানুষ ক্ষেপিয়া যায়।…

অমিত একবার চোখ মেলিয়া দেখিল—একটা বায়োস্কোপের বাড়ি। বাড়িটার আলো নিবানো। তবে কি রাত্রির অভিনয়ও শেষ হইয়াছে? আজ যে সুহৃদের সঙ্গে ফিল্মে যাইবার কথাও ছিল। সুহৃদ আবার অমিতের খোঁজে তাহার বাড়ি না গিয়া থাকিলেই এখন রক্ষা। তাহা হইলে বাবা-মা আবার বুঝিবেন, অমিত ফাঁকি দিতেছে। আজ পূর্ব্বেই নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে, কেহ তাহার খোঁজে আসিয়াছিল কি না। সুহৃদ খুব রাগ করিয়াছে। করুক, অমিতের উপায় নাই। তাহার কি সাধ যায় না গান শুনিতে, বায়োস্কোপ দেখিতে, আড্ডা জমাইতে? কিন্তু মন যে সরে না। তাহার সমস্ত মন যে অস্বীকার করে। সুহৃদ বুঝিবে না। সুধীরা কিন্তু বোঝে। সুধীরার প্রাণে কোথায় গভীরতা আছে। সেখানে বেদনার তার গোপনে বাজিতেছে। কি অনির্দ্দেশ্য এই বেদনা? অমিত ভাবিয়াই পায় না।…সুহৃদের সঙ্গীতগ্রাহী কানে তো সুধীরার সেই সুর ধরাই পড়ে না। সুহৃদ ভাগ্যবান। এই শতাব্দীতে জন্মিয়া, হৃদয়হীন না হইয়াও এমন নিশ্চিন্ত আনন্দে ভাসিয়া বেড়ানো সহজ কথা নয়। সত্যই আজও যে এমন

বুর্জোয়া-রচিত দুর্গে নিষ্কণ্টকে ও নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে, যে ঈর্ষ্যার বস্তু। অথচ সুহৃদের হৃদয় আছে, চেতনাও আছে,—কেবল তাহা সবই সুকোমল আলোকে রঙিন, আগুনের আঁচে জ্বলিয়া যায় নাই। সত্যই সুহৃদ ভাগ্যবান। সাতকড়িও হঠাৎ উন্মনা হইয়া পড়ে—নিতান্ত শৌখিনভাবে হইলেও উন্মনা হয়—খণ্ড-বিখণ্ডিত সমাজের গ্লানির জন্য একটিবার দীর্ঘশ্বাস সাতকড়িও ফেলে। সে অবশ্য জ্বলিয়া মরিবার মত লোক নয়। এতক্ষণে হয়তো সে বরানগরের বাড়িতে অনারেব্‌ল অতিথিদের জন্য পেয় ও আহার্য্য বিলাইতেছে। চাই কি রাত্রির মত তাহাদের শয্যাসঙ্গিনীদের বিলিবন্দোবস্ত করিতেছে—সাতকড়ি জ্বলিয়া মরিবে না। বিষয়ের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সে বেশ আরামে কাটাইয়া দিবে। অনুকূল দত্ত দেখিয়া খুশি হইতেন—সাতকড়ি একশত টাকা মাহিয়ানার সাব-এডিটর নয়। না, বঙ্কিম বাড়ুজ্জে-অনুকূল দত্তের বংশ লোপ পাইবে না। বুড়াদের কাজ হাতে তুলিয়া লইবে—নিউ জেনারেশনের সাতকড়িরা আর অপূর্ব্বেরা, এবং শৈলেনেরা—আত্মার অমাবস্যা-রাত্রিতে ইহারা ছোট ছোট জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইবে।···

দুই-একটা জেনারেশন বলি দিতে হইবে। তারপর ভাবী জেনারেশনের অপূর্ব্ব বিকাশ যখন আসিবে তখন এখানকার নীল আকাশের তলে নিশ্বাস লইতে তাহাদের আর গ্লানি বোধ হইবে না। তবু এই গ্লানিই আজ ললাট-লিপি এ যুগের কবির, বঞ্চিত কালের দার্শনিকের, লাঞ্ছিত জাতির বৈজ্ঞানিকের। ওল্ড জেনারেশন, ভাবী জেনারেশন সমর্পণ করিবে পরিপূর্ণ অর্ঘ্য—তোমাদের বিস্মৃত অলক্ষিত যজ্ঞবেদিকার উপরে ····

অমিত চমক ভাঙিয়া উঠিল।···বাস বাড়ির পথ যে ফেলিয়া যাইতেছে! অমিত গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল।

১২

কড়া নাড়িতেও ভয় হয়, অথচ নিজেরই বাড়ি। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও বাবা-মা জাগিয়া বসিয়া না থাকিলেই মঙ্গল।

গলিটায় আজ এত লোক এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি করিতেছে? তাহাকেই দেখিতেছে নাকি? একটা লোক আবার সরিয়া বাড়িটার ছায়ায় অন্ধকারে দাঁড়াইল যে! ···বাজে লোক, বৃথা সন্দেহ।

যতটুকু অল্প শব্দ করিয়া সম্ভব, ধীরে ধীরে অমিত কড়া নাড়িল। নিবারণ দুয়ার খুলিয়া দিল, দুয়ারের পার্শ্বেই সে শুইয়া ছিল। অমিত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা খেয়েছ নিবারণ?

হাঁ বাবু।

সুহৃদবাবু আমাকে আজ খুঁজতে এসেছিলেন নাকি?

না।

যাও, দোর বন্ধ ক'রে ঘুমোও।

জুতার শব্দটা রাত্রিতে এমনই বড় হইয়া উঠে—বিশ্রী! অথচ এই সময়টাতেই শব্দ হওয়া উচিত মৃদু। সাবধানে পা ফেলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া অমিত উঠিতে লাগিল। বাতির সুইচ টিপিল না। কিন্তু একটু পরেই উপরকার বাতি জ্বলিয়া উঠিল, সিঁড়ির অন্ধকার ঘুচিয়া গেল। অমিত যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই হইয়াছে—মা জাগিয়া আছেন।

সিঁড়ির উপরে মা দাঁড়াইয়া। খুব সহজ স্বরে অমিত কহিল, এখনও ঘুমোও নি যে?

মা তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ঘুম পায় নাকি? সারাদিন খোঁজ নেই তোমার—

কেন? ব'লে গেছলাম তো স্থহৃদের ওখানে খেতে হ'তে পারে? বিকাশ যে পাগল, ছাড়লে না। তোমাকে বলে নি নাকি কেউ?

মা কহিলেন, বললে কি হতো? ব'সে থাকতে হয় না? আর তারপরে এতটা রাত হয়েছে—দেড়টা-ছুটো।

দেড়টা-ছুটো! তোমার যেমন কথা! বারোটা বাজবে।

অমিত জামা-কাপড় ছাড়িতে লাগিল। মেঝেয় খাবার ঢাকা রহিয়াছে—গরম জলের বড় বাটির মধ্যে একটি বাটিতে রুটি তরকারি। শীতে যেন ঠাণ্ডা না হইয়া যায়, তাই এই আয়োজন।

অমিত কহিল, খাবার তো ইচ্ছে নেই। স্থহৃদের পাল্লা, যেতে হ'ল ওর ওখানে। তারপর এই রাত্রি সাড়ে ন'টার বায়োস্কোপ। যাক, ফিল্মটা ছিল ভাল—চমৎকার!

সহজ স্থরেই অমিত কথা বলিতেছে; কিন্তু কথাটা জমিল না। মায়ের মুখ হইতে কিছুতেই চিন্তার মেঘ কাটিয়া যায় না। হাত-মুখ ধুইতে অমিত পাশের ঘরে গেল। ভাল করিয়া একবার মাথাটা ধুইল, শীতের রাত্রি, তবু মাথায় জল দিলে ঘুমটা ভাল হইবে।

খাব নাকি?

মা দাঁড়াইয়া আছেন, কহিলেন, খাও; যতই খাও না, খানিকটা ক্ষিদে আছে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন অমিত খাইতে বসিল—ক্ষুধা নাই। তরকারি, মাছ একটু ছুঁইয়া যাইতে লাগিল—এই তো আটটার সময় স্থহৃদ খাওয়াইয়াছে। এখন কি আর খাওয়া চলে?

খাওয়া শেষ হইল। তৈয়ারি বিছানায় অমিত গা ঢাকিয়া দিল। হাতের কাছে রহিয়াছে টয়েনবির ইণ্টার-ন্যাশানাল অ্যাফেয়ার্স। মা টেবিলের উপরের চিঠি দেখাইয়া দিলেন, কহিলেন—আর একটা পত্রিকাও এসেছিল।

কই? কি পত্রিকা? বাংলা?

না, ইংরেজী।

দেখছি না যে?

ওঘর হইতে পিতা কহিলেন, এখানে আমার টেবিলে আছে। নিয়ে যাও।

সর্ব্বনাশ, বাবাও জাগিয়া গেলেন যে!

না, আপনি প'ড়ে নিন, পরে দেখব।

রাত্রিতে একবার দেখ, তবে প'ড়ো না—রাত প্রায় একটা হতে চলেছে।

একটা! না বোধ হয়।

পিতা কহিলেন, হ্যাঁ, বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

তাহা হইলে তিনি সমস্তক্ষণই জাগিয়া ছিলেন। অমিতের মন নিজের কাছে নিজে অপরাধী হইয়া উঠিল। মা কাগজটা আনিয়া দিলেন, নাইন্‌টীন্‌থ সেঞ্চুরী এ্যাণ্ড আফ্‌টার। দুখানা চিঠি দিতে দিতে বলিলেন, ইন্দ্রাণী এসেছিল—এই রাতে, খানিকক্ষণ আগে; কি দরকার নাকি। রেখে গেছে একখানা চিঠি।

চিঠির লেখার দিকে হঠাৎ অমিতের দৃষ্টি পড়িল। পরিচিত লেখাই—ইন্দ্রাণীর সেই বাঁকা লেখা—দ্রুত, অস্থির হাতের লেখা। আর স্থরোর চিঠি। আগেও স্থরো দুইখানা চিঠি লিখিয়াছে; আজ কাল করিয়া অমিতের উত্তর দেওয়া হইয়া উঠে নাই। অমিত কি করিবে? পারিয়া উঠে না।

অমিত চিঠি পড়িতে গেল। ইন্দ্রাণীর চিঠিই পড়িতে হয় প্রথম, কেন সে এত ছুটিতেছে? মা ও তাহার এত রাত্রিতে ছুটাছুটি পছন্দ করেন নাই। অবশ্য ইন্দ্রাণীর তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। সে আসিয়াছে অমিতের সন্ধানে, আর অমিত তখন গিয়াছে হয়তো তাহারই সন্ধানে।

অমিত পড়িল—"কোথায় তুমি ঘুরছ? আমি যে তোমার জন্যে সারাদিন শহরের সর্ব্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছিলাম। বড় জরুরী কথা, বড় চিন্তার কথা। তোমার সম্বন্ধে দু-একটা খবর শুনলাম, আমার মন দুশ্চিন্তায় নুয়ে পড়েছে। তোমাকে চাই আমি। শোভাযাত্রার খবরটা কাগজে পর্যন্ত দিতে যাই নি।—তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তুমি এস, আজ রাত্রিতেই এস—যত রাত্রিই হোক আসবে, কিছু ভেবো না; মনে ক'রো না, ঘুমিয়ে পড়ব—ঘুম আজ আমার অসম্ভব।"

অমিত হাসিল, 'যত রাত্রিই হোক আসবে।' ক্ষ্যাপা ইন্দ্রাণী! যেন সম্ভব হইলে অমিত যাইত না। তথাপি দুই একবার অমিতের মন বলিল, 'চল, চল।' তারপর 'না, এত রাত্রে আর না।'

অমিত স্বরোর চিঠি খুলিল।—"দুই-দুইখানা চিঠি লিখে আশায় আশায় পথ চেয়ে রইলুম। বৃথা আশা। তোমার একছত্রের একটি উত্তরও নেই। নিজের কুশলটুকুও জানাতে চাও না। জানলেই বা কি বেশি হ'ত? তুমি যে এমন মানুষ তা তো ভাবি নি; এমন যে তুমি হতে পার, তাও কোন দিন কল্পনা করিনি। বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদটা থেকেও এবার আমাদের বঞ্চিত করেছ; (অমিত মনে মনে সকৌতুকে বলিল, 'ইচ্ছা করে নয়।') প্রণামটুকু গ্রহণ করলে কি না, তাই বা জানব কি ক'রে? ('তা সর্বদাই গ্রহণ করি।')

কিন্তু যাক, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমি ফিরছি, ('কেন?') অনেকদিন ফেরবার দরকার ছিল। কাল খোকা এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। ('খোকা মানে, স্বরোর ভাই? কবে সে এখান থেকে গেল জানতাম না তো!') তার মুখে তোমার কিছু কিছু সংবাদ শুনলাম, ('কি সংবাদ আবার!') সংবাদ কিছুই নয়, আবছায়া, ঝাপসা—কিন্তু আমাদের ভাবনার অন্ত নেই আর। তোমার কি হয়েছে?

শুনলাম, শরীরেরও যত্ন নাও না। কোন দিনই তো খুব ভাল স্বাস্থ্য

ছিল না। তার ওপর যদি এরূপ অমনোযোগী হও, তা হ'লে কি যে দাঁড়িয়েছে, তা বুঝতে পারি না। আমি আসছি, কিন্তু তার পূর্ব্বেই তোমাকে সাবধান করছি, শরীর যদি খারাপ দেখি, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আর দেখা করব না। ঠাট্টা নয়।

দিন তিন আগে ওঁর সঙ্গে এখানকার একজন প্রফেসার এলেন আমাদের বাড়িতে। তোমারই সঙ্গে নাকি পড়তেন, একসঙ্গে পাস করেছিলেন। উনি বললেন, তোমার অনেক নিচে পাস করেছিলেন। এ ভদ্রলোকটি এবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। (ও! বিনয় রায় বুঝি!') তোমার কথা মনে পড়ল। তুমি কি করছ? তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে তুমি নাকি অনেক আগেই তা পেতে পারতে। কিন্তু খোকা বললে, তুমি ওসব কাজ এখন আর করো না, খেয়াল খুশিমত ঘুরে বেড়াও। শুনে আমার মন আবার নিরাশ হয়ে গেল। তুমি কেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ হচ্ছ না? ('পাচ্ছি না তাই।') ইচ্ছা করলে তুমি কি না করতে পার? ('হায় অবোধ মেয়ে! অনেক কিছুই করতে পারি না।') আমি এসে দেখছি, তুমি কি কর। আসছে বুধবার কলকাতা পৌঁছব, দুপুরেই আসা চাই। নইলে আমাকেই তাড়া করতে হবে তোমার বাড়ি; আর জানই তো তার অর্থ—তোমার বইয়ের আলমারির চাবি চুরি যাবে। এক সপ্তাহ আমার কাছে কাছে খোশামুদি করে ঘুরতে হবে। বুঝলে?

আমাদের প্রণাম জানবে।"

আলমারির বই—অমিত একবার দেখিল, ধূলিমলিন গ্রন্থগুলি নীরব ভর্ৎসনায় তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাদের এখন আর পূর্ব্ব আদর নাই। মনে পড়িল—সাতকড়ির বুক-কেস। এই আলমারিগুলি যেন তাহার তুলনায় রক্তহীন—দরিদ্র ভিখারী।

আবার চোখে পড়িল সুরোর চিঠি—বইয়ের আলমারির চাবি চুরি করিয়া সে শাস্তি দিবে ভয় দেখায়। না, সুরো তেমনই রহিয়াছে—ঠিক তেমনই। তবু একটু বদলাইয়াছে—প্রথম দিকটার লাইন কয়টা অমিত আবার পড়িল। আগেকার সুরো এতটা ব্যাকুল হইত না—অভিমান ও রাগই ছিল তাহার নিয়ম। এখনও সুরো তাহা হারায় নাই। চিঠির মাঝখান হইতেই অমিত যেন পুরানো সেই বালিকাকে দেখিতেছে। ···কিন্তু সে বালিকাত্ব ছাড়াইয়া উঠিতেছে, তাহাতেও ভুল নাই। উঠিবে বই কি। বয়সও তো কম নয়—বোধ হয় এখন তেইশ-চব্বিশ হইবে। মানুষ দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া যায়—সুরোও কত বড় হইয়াছে। কিন্তু কেমন মানাইবে তাহাকে আজ? ইন্দ্রাণীর মত? না, সে ইন্দ্রাণীর অপেক্ষা ছোট—সেও কি এখন সবিতার মত তেমনই সুশোভনা, মহিমময়ী হইয়া উঠিয়াছে?···আবার ইন্দ্রাণীর চিঠিটা হাতে লইয়া অমিত ভাবিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী কেন এমন উতলা হইল? যাইবে কি অমিত? এ রাত্রিতে?—পাগল?···

মা ডাকিয়া কহিলেন, এবার ঘুমোও, আলো নেবাও।

একটু নাইন্‌টীন্‌থ সেঞ্চুরিটা উল্টে নিই।

বাবা কহিলেন, তা হ'লে সারারাতেও ওল্টানো শেষ হবে না। অনেক ভাল প্রবন্ধ আছে।

তিনি পড়িতেছিলেন নাকি?—পত্রিকার মধ্য হইতে একখানা পুরাতন পোস্টকার্ড বুকমার্করূপে উঁকি দিতেছে। অমিত পাতাটা খুলিল। অধ্যাপক ম্যারিয়টের লেখা ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে—ব্রিটিশ কন্‌স্টিটিউশনে ইহার কি অর্থ দাঁড়ায়, তাহারই ব্যাখ্যা।

পিতা পড়িতেছিলেন····চোখে তিনি এখন অল্প দেখিতে পান; তাঁহার রক্তের চাপও অধিক। তথাপি তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে চুপ

করিয়া থাকিতে দেয় না। এই নূতন কাগজখণ্ড তিনি কালই শেষ করিবেন। সার্ভে অব ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স তাঁহার চার দিনে শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ অমিতের কতদিন লাগিবে কে জানে! অমিত হয়তো শেষ করিতেই পারিবে না। তাহার মন যে এখন পড়ায় নিবদ্ধ হয় না। সত্যই তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত—যেন কেন্দ্রহারা, অস্থির,—এই যেমন ইন্দ্রাণী।…ইন্দ্রাণীর চিঠি অমিত আবার পড়িল। কেন এত ব্যাকুলতা তাহার?

অমিত আলো নিবাইয়া দিল। শেষবারের মত বইয়ের আলমারিগুলি করুণ দৃষ্টিতে তাহাকে আহত করিল। তারপর—অন্ধকার।

এবার পিতাও ঘুমাইবেন। কিন্তু, কি তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা! ব্রজেন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়িল—কি সুতীব্র জ্ঞাননিষ্ঠা, শান্ত মনীষা। সত্যই এই যুগে অমিতেরা এই মননশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিউ জেনারেশন, বুড়োদের কাজ তোমরা তুলে নিতে পারবে না—অসম্ভব, অসম্ভব।…

Time is out of joint. Time is out of joint.….

চোখ বুজিয়া আসিল।….কাল—কাল পড়িবে বইটা, আজ হইল না। …অনেক কাজ কাল। ইন্দ্রাণীর চিঠি হাতে ঠেকিল, সকালেই যাইতে হইবে। সুহৃদ ও সুধীরাকেও দেখিতে কাল যাইবে। সুধীরা নিশ্চয়ই আহত হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা—দীনুদের টাকা দিতে হইবে। কালও কি তাহা হইলে এ লেখাটা পড়া হইবে? আজিকার মতই কালও তাহাকে ফাঁকি দিয়া যাইবে। তবু কাল….কাল…। আজ তো আর পারে নাই—যে ছুটাছুটি; কালও কি এমনটি হইবে?…দিনগুলা তো এইরূপেই শেষ হইয়া যায়—কিছুই করা হইয়া উঠে না; ভরসা থাকে—কাল।…

দিনগুলি হাতধরাধরি করিয়া যেন ছুটিয়া পলাইয়া যায়—চোখের পলক সহে না—হঠাৎ দিনের মালাগাঁথা শেষ হয়—চোখ হয় পলকহীন।

দিনের পর দিন, দিনের পর দিন—জীবনের মালা পূর্ণ হইয়া আসে। জীবনের পর জীবন—কালের হাতের অক্ষমালা সরিয়া সরিয়া পর্ব্বান্তে ঘুরিয়া আসে। বিপ্লবের পরে আবার বোধন, আবার নূতন কালের নূতন বিরোধ, নূতন সমন্বয়।....দিনের পর দিন—যুগের পর যুগ।

এইরূপে মহাকালের ধ্বনি প্রতিদিনের ক্ষুদ্র বাঁশীর মধ্য দিয়া উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে। আজও তেমনই উঠিয়াছে—কালও তেমনই উঠিবে। আজও যাহা, কালও তাহাই—একই। কালও আজও,...আজও কালও।...

পিতা ঘুমাইলেন বোধ হয়। নাসিকাধ্বনি শোনা যায়। ওই নিশ্বাসে নিশ্বাসে ক্ষীয়মান অতীতপ্রায় জেনারেশন চলিয়াছে—রাত্রির এই নিশীথ-অন্ধকারে ওই দূরের তারাদের মত তাঁহাদের চোখ তাকাইয়া আছে অগ্রবর্তী সন্তানদের দিকে—'আমাদের কাজ তুলিয়া লও—তুলিয়া লও—তুলিয়া লও—তুলিয়া লও।' মহাকালের বিলীয়মান তরঙ্গ ডাকিতেছে পিছনের তরঙ্গকে—'মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াও—আকাশ ছুঁইয়া দাঁড়াও—মহাসূর্য্যের পদ চুম্বন করিয়া দাঁড়াও।'

ইহারাও আবার এমনই ডাকিবে—আবার এমনই নিশ্বাসে নিশ্বাসে ক্ষীয়মান নূতন যুগ ডাকিবে নূতনতর যুগকে।

অনন্তকাল এমনই ডাক চলিতেছে। যুগান্তের অস্তরশ্মি মাথায় লইয়া আমরা আসিয়াছি—নিজেদের ডালি দিয়া না গেলে আমাদের মুক্তি নাই—নিমেষের বিদ্যুদালোকে আমরা জ্বলিয়া উঠিব—অনন্তকালের জন্য জ্বলিতে থাকিব—Burning Bush।...

আমাদের দান—আত্মদান—Intense Living।

চোখ অমিতের বুজিয়া আসিয়াছে, মনে মনে সে কহিতেছে, Burning Bush, Burning Bush...

সুনীল। সুনীল—দীনু—যুগল—মোতাহের—
These laid the world away ; poured out the red
Sweet wine of youth ; gave up the years to be
Of work and joy and that unhoped for serene
That men call age ; and those who would have been
Their sons, they gave their immortality.

অমিত জিহ্বাতে স্বাদ লইতে লইতে নীরবে আওড়াইল—'The red sweet wine of youth'…মণীশ—সুনীল—যুগল—দীনু—মোতাহের….

তারপর—

ইন্দ্রাণী—বুলু—সুধীরা—সবিতা—সুরো—

Sufference is the badge of their tribe—
চিরদিন মায়ের জাতের ওই পরিচয়—
For you, you too, to battle go,
Not with marching drums and cheers,
But in the watch of solitude,
And through the boundless night of fears…
Your infinite passion is outpoured.

আহত প্রাণের সহস্র ফাটল দিয়া ঝরিয়া পড়ে সেই বেদনা….আহত মৌন সেই প্রাণগুলি।….মা আজও মুখ বুজিয়া মৌন রহিয়াছেন—মুখ বুজিয়াই তিনি আঘাত সহেন।

"না, মা বড় জঞ্জাল! মরেও না।"

সুনীল আসিতেছে বুঝি?….না, রক্তমুখো সার্জেণ্টের দল ছুটিয়া চলিয়াছে অসহায় পথিকদের মারিবার জন্য…দেখিয়াছ ইন্দ্রাণী? দেখিয়াছ

সেই জিঘাংসু মুখ? ঐ যে উহাদের দ্রুত পদশব্দ···ইন্দ্রাণী, এত রাত্রিতে তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? আমি আসিব, সকালেই আসিব; রাগ করিও না, ইন্দ্রাণী।

নিচের তলায় ভারী বুটের সদর্প দ্রুত শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে কে উঠিতেছে না?

অমিতের চোখে পড়িল, ভোরের আলো আসিতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নূতন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে।

ততক্ষণে সবুট পদধ্বনি দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া গেল।